Dhaka University Institutional Repository

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ

নজরুল ইসলাম

পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ

নজরুল ইসলাম
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৮৪ (পুনঃ)
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-১৭

পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জুন ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের প্রয়োজনে উপস্থাপিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের (গিয়াস শামীম) তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত। এটি আমার মৌলিক গবেষণা-কর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনোপ্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষও উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরও অঙ্গীকার করছি যে, এই অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism বা কুম্ভীলকবৃত্তি নেই।

(নজরুল ইসলাম)
পিএইচ. ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৮৪ (পুনঃ)
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা–১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬০০০; ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৭২২২
ই-মেইল : bengali@du.ac.bd

Department of Bengali
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Call : 9661900-73/6000; Fax : 880-2-9667222
E-mail : bengali@du.ac.bd

১৭ জুন ২০২১ বৃহস্পতিবার

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের গবেষক নজরুল ইসলাম কর্তৃক পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রণীত। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ-অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনোপ্রকার ডিগ্রি অর্জনের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ-অভিসন্দর্ভ আদ্যন্ত পড়েছি, এবং এটি পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

আরও প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এই অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism বা কুম্ভীলকবৃত্তি নেই।

(ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিনের তত্ত্বাবধানে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ' শীর্ষক পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন হয়েছে। তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমার এই গবেষণাপ্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে সার্বক্ষণিক প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, তাগিদ ও সহযোগিতার কারণেই আমি শেষাবধি এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমি এজন্য তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণার কাজে যাঁরা আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন এ-উপলক্ষ্যে তাঁদের আমি শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশেষ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র কলকাতার সল্ট লেকের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা ও সাহিত্য-গবেষক সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি স্মরণ করছি। তিনি *খুনি* উপন্যাসের কপিসহ মানিকবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও উপকরণ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সান্নিধ্য অর্জনে আমাকে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন কলকাতার বিশিষ্ট লোকসাহিত্য গবেষক ডক্টর বাসন্তী মজুমদার। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট মানিক-গবেষক ডক্টর সৈয়দ আজিজুল হকের প্রতি। তাঁর মানিক-বিষয়ক গবেষণা আমাকে বেশ সমৃদ্ধ করেছে। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর মীর হুমায়ূন কবীর গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর উদার ও প্রীতিময় সহযোগিতার কথা আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি। এছাড়া গবেষণার কাজে যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন – আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গবেষক ও কবি অধ্যাপক ডক্টর মাহবুব সাদিক; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর অনুপম হীরা মণ্ডল; সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক স্নেহাস্পদ ডক্টর শামস্ আল্‌দীন এবং কথাসাহিত্যিক ও গবেষক মিলন রায়। তাঁদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

আমি গভীরচিত্তে স্মরণ করছি আমার মা রাবেয়া বেগম, সহধর্মিণী ওয়াহিদা পারভীন, কন্যা নাফিজা মাহমুদা ও পুত্র ওয়ালিদ সাদাতকে। তাদের ভালোবাসা আমাকে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব হলেও বিশ শতকে তা ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি অর্জন করে। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের শিল্পিত পরিচর্যায় বাংলা উপন্যাসের যে ঈর্ষণীয় বিকাশ সাধিত হয়, তা ত্রিশোত্তর ঔপন্যাসিকদের মাধ্যমে সমৃদ্ধি লাভ করে। ত্রিশোত্তর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র একদল লেখক 'রবীন্দ্রবলয়' থেকে বেরিয়ে এসে ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে একটি ভিন্নতর সাহিত্যধারা সৃষ্টি করতে আগ্রহী হন এবং যথারীতি তাঁরা সার্থকতার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারার সৃষ্টি করেন। এ ধারার উল্লেখযোগ্য এবং 'কল্লোলের কুলবর্ধন' হিসেবে খ্যাত ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। তিনি বাংলা কথাশিল্পে বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উপন্যাস-সাহিত্যের বিকাশে এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরোপীয় ভাবধারা গভীরভাবে আত্মস্থ করে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব ও কার্ল মার্কসের সমাজবীক্ষা কিংবা ধনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার নিপুণ উপস্থাপনার মাধ্যমে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়াও আল্‌বেয়ার ক্যামু, জেমস জয়েস, জ্যঁ পল সাঁর্ত্রে, ভার্জিনিয়া উলফ্, উইলিয়াম ফকনার প্রমুখ সাহিত্যিকের প্রভাবে তিনি উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রাঙ্কনে নিয়ে আসেন অভিনবত্ব। তিনি বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিকতাকে পরিহার করে নতুন এক পথ নির্মাণ করেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি স্বতন্ত্র প্রতিভায় নিজ দেশকালের প্রেক্ষাপটে বিরাজিত সমস্যা ও সংকটকে তার রচনায় সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায়ে সামাজিক বিষয়াবলি নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। বস্তুত, সমকালীন মানুষের জীবন তাঁর উপন্যাসের মূল উপজীব্য। তিনি প্রধানত মানুষের অন্তর্জগৎকে অবলম্বন করে সমকালীন জীবন, জগৎ, চিন্তা-চৈতন্য তাঁর উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে শ্রেণিবিভাজিত সমাজের বাস্তবধর্মী চিত্র উপস্থাপন করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর এক বিপন্ন–বিপর্যস্ত ও তরঙ্গসঙ্কুল সমাজবাস্তবতায় তিনি বাংলা সাহিত্যে পদার্পণ করেন। ঔপনিবেশিক শোষণ ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন–নিষ্পেষণের যাঁতাকলে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল সে সময়ের মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

জীবন। এই শাসন–শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার প্রত্যাশায় ছটফট করছিল মানুষ। সুদীর্ঘকালের মূল্যবোধ তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল অর্থহীন। অথচ নতুন কোন মূল্যবোধকে গ্রহণ করার মানসিকতা তাদের তখনও তৈনি হয়নি। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই তারা হয়ে পড়েছিল বিভ্রান্ত, আশাহীন–ভরসাহীন। অনিশ্চিত, অসহনীয় ভবিষ্যৎকে চোখের সামনে দেখে তারা সন্ধান করছিল আত্মমুক্তির পথ। তাদের কাছে জীবন–প্রেম-ভালোবাসা সবই হয়ে পড়ে অর্থহীন। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে মানুষের মনের গঠন কোথায় দাঁড়িয়েছিল তার স্পষ্ট স্বরূপ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসসমূহে বিধৃত হয়েছে।

আজীবন 'কেনধর্মী' বৈজ্ঞানিক জীবনজিজ্ঞাসা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগ্রহী করে তোলে বৈচিত্র্যময় মানবসম্পর্কের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে। ফলত তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয় জীবনের বাস্তবতা ও সাহিত্যের বাস্তবতার দ্বন্দ্ব, ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব ও টানাপড়েনই তাঁকে মানুষের মনোরহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত করে। অবশ্য মানবমনের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মনোজাগতিক সমস্যা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। ব্যক্তি যেহেতু সমাজবিচ্ছিন্ন নয়, সেহেতু ব্যক্তিমনের উপর সমষ্টিমনের বা অর্থনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়ার অনিবার্য প্রভাব রয়েছে। মনের স্বাভাবিক ভারসাম্য বা শান্তি বিনষ্টির কারণ শুধু ফ্রয়েডীয় লিবিডোজাত সমস্যা নয়; এর সঙ্গে সমাজ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বংশগতিধারা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনীতি অনেক কিছুরই নিবিড় যোগ রয়েছে। আর এই সত্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁর দৃষ্টি ব্যক্তিমন থেকে সমষ্টিমনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ফলে, তাঁর সাহিত্য বৃহত্তর জীবনদর্শনে রূপলাভ করে। কথাসাহিত্যপাঠ যে মূলত লেখকের মানসিক অভিজ্ঞতা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পালাবদলের বিচিত্র চালচিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিব্যক্তি এবং সর্বোপরি রহস্যময় আধুনিক জীবনালেখ্যের জটিল হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক সূত্রগুলির শিল্পিত প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসপাঠে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের মনে হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিবেচনায় এ বিষয়টি অদ্যাবধি অনুপস্থিত থেকে গেছে। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ' শিরোনামের গবেষণা প্রকল্পে এ-বিষয়গুলোই অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে 'ত্রিশোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বিশেষভাবে ত্রিশোত্তর কালের আর্থ-সামজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ত্রিশোত্তর বাংলা উপন্যাসের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান'। সমসাময়িককালে যে সকল ঔপন্যাসিক বাংলা কথাসাহিত্যকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের উপন্যাসসমূহ আলোচনার পর বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে এ-অধ্যায়ে। এদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৮৮), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) প্রমুখ ঔপন্যাসিকের সাহিত্যিক-প্রবণতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমকালীন উপন্যাসসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত' আলোচনা করতে গিয়ে মানিকের *জননী* (১৯৩৫), *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫), *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬), *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬), *অমৃতস্য পুত্রাঃ* (১৯৩৮), অহিংসা (১৯৪১), *ধরাবাঁধা জীবন* (১৯৪১), *চতুষ্কোণ* (১৯৪২), *শহরবাসের ইতিকথা* (১৯৪৬), *খুনি* (১৯৪৩), *আদায়ের ইতিহাস* (১৯৪৭), *ছন্দপতন* (১৯৫১), *পাশাপাশি* (১৯৫২), *নাগপাশ* (১৯৫৩) *চালচলন* (১৯৫৩), *তেইশ বছর আগে পরে* (১৯৫৩), *শুভাশুভ* (১৯৫৪), *পরাধীন প্রেম* (১৯৫৫), *মাশুল* (১৯৫৬), *প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান* (১৯৫৬), *মাটি ঘেঁষা মানুষ* (১৯৫৭), *শান্তিলতা* (১৯৬০) প্রভৃতি উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে কোথায় কীভাবে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে– তা নির্দেশ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত সমকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত' আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মানিকের *শহরতলি* (প্রথম খণ্ড ১৯৪০), *শহরতলি* (দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪১), *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩), *দর্পণ* (১৯৪৫), *চিহ্ন* (১৯৪৭), *জীয়ন্ত* (১৯৫০), *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১), *সার্বজনীন* (১৯৫২), *চিন্তামনি* (১৯৪৫), *পেশা* (১৯৫১), *সোনার চেয়ে দামি* (প্রথম খণ্ড ১৯৫১), *সোনার চেয়ে দামি* (দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫২), *ইতিকথার পরের কথা* (১৯৫২), *আরোগ্য* (১৯৫৩), *হরফ* (১৯৪৫), *হলুদ নদী সবুজ বন*, (১৯৫৬) প্রভৃতি উপন্যাস আলোচনা করে মানিকের উপন্যাসে লব্ধ রাজনৈতিক বাস্তবতা নিরূপণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য এই যে, এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত সকল উপন্যাসের নামের বানানের ক্ষেত্রে সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র* (প্রথম খণ্ড থেকে ষষ্ঠ খণ্ডে)-এ উল্লেখিত বানান অনুসরণ করা হয়েছে।

সর্বশেষে সংযোজিত হয়েছে গবেষণা-অভিসন্দর্ভের উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায়
ত্রিশোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি ৬-২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
ত্রিশোত্তর বাংলা উপন্যাসের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান ২৪-৪৪

তৃতীয় অধ্যায়
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ৪৫-১৯৩

চতুর্থ অধ্যায়
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত সমকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ১৯৪-২৭১

উপসংহার ২৭২-২৭৩

গ্রন্থপঞ্জি ২৭৪-২৮৪

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থাবলি ২৮৫-২৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ত্রিশোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

উপন্যাস মানব জীবনের যে অন্তর্নিহিত অর্থকে আবিষ্কার করতে চায়, তার পরিধি এতই বিস্তৃত যে তা পরিমাপ বা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। উপন্যাস মানবজীবনের নানা বিভাজন, বিচিত্র বিরোধ ও গোপন ঐক্যসূত্রকে সবসময় উদ্‌ঘাটন করতে প্রয়াসী। আর একটি বাস্তব কাহিনি অবলম্বন করে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনানুভূতি ও জীবনদর্শন যখন বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয় তখন তা হয়ে ওঠে উপন্যাস। 'উপন্যাস হচ্ছে আধুনিকতম এবং সমগ্রতাস্পর্শী সেই শিল্প প্রতিমা, যেখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় জীবনের আদি-অন্ত; শিল্পিত স্বরগ্রামে উদ্ভাসিত হয় লেখকের জীবনার্থ আর তাঁর স্বদেশ-সমাজ-সমকাল। বুর্জোয়া সমাজের শক্তি এবং স্বাতন্ত্র্যে আত্মস্থ হয়ে, মধ্যযুগীয় জীর্ণ সামন্ত সমাজ কাঠামো ভেঙে দেওয়ার অভীপ্সা নিয়ে উপন্যাসের জন্ম। নবোত্থিত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণি এবং বুর্জোয়াসেবিত সমাজই উপন্যাসের আদি জয়িতা। আধুনিক যুগে সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের যে সংগ্রাম– তারই মহাকাব্যিক রূপ উপন্যাস।'[১]

উনিশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত রেনেসাঁসের প্রভাবে বিকশিত হয় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি। নবজাগ্রত এই মধ্যবিত্তশ্রেণির হাতেই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সূচিত হয় বাংলা উপন্যাসের ধারা। তবে, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ হয়েছে প্রায় একশ বছর পরে। '১৮৭২-৭৩ সালে এদেশের সিরাজগঞ্জে কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছিল। এদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ বিদ্রোহের পিছনে ছিল ইংরেজ-সৃষ্ট বিভিন্ন শোষকশ্রেণির, বিশেষত জমিদারগোষ্ঠীর উন্মত্ত শোষণ-উৎপীড়ন। সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ কেবল জমিদার-গোষ্ঠীর কৃষক-শোষণের চক্রান্ত ব্যর্থ করেই ক্ষান্ত হয়নি, এটা কৃষিভূমির দখল থেকে প্রজা উচ্ছেদের নিরঙ্কুশ অধিকার-দানকারী বিভিন্ন আইন রদ করে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-আইন বিধিবদ্ধ করতে ইংরেজ শাসকগণকে বাধ্য করেছিল।[২]

---

১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল : বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১০১

২. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩৪৫

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল আন্দোলন ও বিদ্রোহের কারণে ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ-শাসনের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এ বিদ্রোহ কেবল কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তশ্রেণিকে প্রভাবিত ও জাগ্রত করে। এর প্রভাবে তারা জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে, যার নেতৃত্বদান করেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি। 'উনবিংশ শতাব্দীর ষাট-সত্তর-এর দশকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা সামাজিক অসমবিকাশ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ইংরেজের কূটনীতিকে যথাযথ অনুধাবন না করে এবং মুসলিম সমাজের অসহযোগিতার কারণ বিশ্লেষণ না করেই বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অতীতমুখী করে ফেললেন। বাঙালীর জাগরণ বলতে 'হিন্দুর পুনর্জাগরণ' বুঝলেন। কাজেই বাঙালী জাতীয়তাবাদ অচিরেই হিন্দু জাতীয়তাবাদে পরিণত হল; এর অঙ্গ হিসেবে যুক্ত হল শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন, ভবানী পূজা ইত্যাদি। প্রতিক্রিয়ায় ও হীনমন্যতায় বাঙালী মুসলমান সমাজ হলেন 'আরব্য-পারস্যমুখী'। এই দ্বিধাবিভক্ত বাঙালী জাতিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ব্যবহার করেছে ভারত ভাগ করার প্রাক্কাল পর্যন্ত।'[১]

ফলে, এই হিন্দুচেতনাই মধ্যবিত্ত বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করে, যা পরবর্তীকালে বাংলার শিক্ষিত সমাজ জাতীয় জাগরণের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে। অতিদ্রুত এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে 'ইন্ডিয়া লীগ' (১৮৭৫), 'ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের 'জাতীয় কংগ্রেস' (১৮৮৫) ও 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' (১৮৬৬)। 'খান বাহাদুর আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ছিলেন এই 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা। মুসলমান সমাজের কল্যাণার্থে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন এই প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য ছিল আলোচনা ও বিভিন্ন রচনা পাঠের মাধ্যমে বাংলার মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারার আনয়ন এবং নিজেদের চিন্তাধারার উন্নতি ও বিকাশ সাধন। এর পাশাপাশি ইংরেজ শাসনের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের সহৃদয় সম্পর্ক সৃষ্টি। এভাবে শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। ইংরেজ-সরকার এদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পথ খোঁজে। এই মনোভাব নিয়ে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করা হয় এবং ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।'[২]

---

১. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশ', মনসুর মুসা (সম্পা.), *বাঙলাদেশ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ. ৩৬

২. গৌতম কুমার দাস, *বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস : গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ জনপদের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৯, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে 'বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল। দেশের আহত আত্মা এই মুহূর্তেই মরণপণ করে জেগে উঠল; শিল্পী, কবি, নাট্যকার– সকলেই এই আন্দোলনে যোগ দিলেন, রবীন্দ্রনাথ পুরোধা হয়ে এগিয়ে এলেন। ইংরেজের চণ্ডনীতি এবং সেই নীতির প্রতিবাদে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে বাঙালির প্রস্তুতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আলোড়ন তুলল। ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত এই বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন চলল, মহারাষ্ট্র ও বাংলায় সরকারি চণ্ডশাসনের প্রতিক্রিয়ার ফলে গুহাচারী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গোপনে গোপনে শুরু হয়ে গেল।'[১]

বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার কৃষিক্ষেত্রে অবনতির বেশ কিছু কারণ ছিল। মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হওয়ায় জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে, জমিদারগণ কেবল খাজনাভোগীতেই পরিণত হয়। এ কারণে এমন একশ্রেণির প্রান্তিক চাষির হাতে জমি চাষের দায়িত্ব চলে যায়, যাদের পক্ষে কৃষি উপকরণের ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব ছিল। যার প্রেক্ষিতে কৃষির অবনতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। উপরন্তু, এ-জমিদারশ্রেণি রায়তদের কারণে-অকারণে মামলায় হয়রানি, উৎখাত, আগুন লাগানো, হাতি দিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়া প্রভৃতি অত্যাচারে জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ফলে সামগ্রিকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় রূপ ধারণ করল।

বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে কয়েকটি ঘটনা বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গতিসঞ্চার করে। এসময় 'বঙ্গভঙ্গকেন্দ্রিক স্বদেশী আন্দোলন' (১৯০৫-১৯১১), 'বঙ্গভঙ্গ', (১৯০৫), 'বঙ্গভঙ্গরদ' (১৯১১) 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ' (১৯১৪-১৯১৮), 'আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন' (১৯১৯-১৯২২), 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা', (১৯২১) 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন', 'মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহযোগ আন্দোলন' (১৯২০-১৯২২), 'রুশবিপ্লবে'র (১৯১৭) অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যুত্থান' (১৯২২), 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬), 'শিখা পত্রিকা' ১৯২৭), 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৩৬), 'ঋণ শালিশী বোর্ড' (১৯৩৮), 'প্রজাস্বত্ব আইন' (১৯৩৮), 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ' (১৯৩৯), 'মহাজনি আইন' (১৯৪০), 'আগস্ট আন্দোলন' (১৯৪২), 'মন্বন্তর' (১৯৪৩), 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' (১৯৪৬), 'ভারত বিভাগ' (১৯৪৭) প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহ বাঙালির পালাবদলে এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহন করে।

---

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, পৃ. ৫৯১

Dhaka University Institutional Repository

একপর্যায়ে শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব। তবে বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে চরম আপত্তি ছিল শিক্ষিত হিন্দু সমাজের। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ সামান্য প্রতিবাদ জানালেও তাদের মধ্যে অধিকাংশই এ-বিভাজন মেনে নেন। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণায় উদারনৈতিক কংগ্রেস নেতারা বিমূঢ় হয়ে যান এবং এতে তাদের নেতৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ে। এই সুযোগটি চরমপন্থী নেতারা গ্রহণ করে এবং তারা কংগ্রেসের পুরোভাগে অবস্থান নেয়। এ কারণে ১৯০৫-এর পরে কংগ্রেস এই চরমপন্থীদের প্রাধান্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতির প্রয়াস থেকে নিজেদের দূরে রাখে।

এ-সময়ে ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেতৃত্ব উদারপন্থী ও চরমপন্থী – দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত-শ্রেণির সঙ্গে নবজাগ্রত বাঙালি মুসলমান-মধ্যবিত্তের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, তা আরও ব্যাপক রূপ লাভ করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই আন্দোলনে হিন্দু সম্প্রদায় ধর্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী ও কালীমূর্তিকে প্রেরণা-উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর পক্ষে আন্দোলনে সংযুক্ত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে।'[১] হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এ সমন্বয়হীনতার কারণে যে বিরোধের বীজ অঙ্কুরিত হয় ব্রিটিশ শাসকগণ তার সুফল ভোগ করে। লর্ড কার্জনের ঘোষণার কারণে বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশে ও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী বিভক্তি সূচিত হয়।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে হিন্দু সমাজে ব্যাপক বিরোধিতার সূত্রপাত ঘটে। এদিকে মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলেও পূর্ববাংলার অধিকাংশ মুসলমান এ বিভক্তি মেনে নেয়। এ সময়ে ব্যারিস্টার আবদুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭) বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। অপরদিকে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৬৬-১৯১৫) ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯২৯) নেতৃত্বে জনমত গঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেন :

> হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হয়ে ওঠে অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ ও সক্রিয়। তারা বাঙালির জাতিসত্তা, বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আবেদন জানায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালির প্রতি। এই আবেদনের প্রভাব কেবল হিন্দু

১. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা : ১৯৪৭-১৯৭১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৮, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

> জনগোষ্ঠীকেই অভিভূত করলো না, মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভেও সমর্থ হলো। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির (১৮৪৮-১৯২৫) নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধিতার সূত্র ধরেই ব্যাপকতা লাভ করে।[১]

বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন তীব্রতর হয়। তবে চরমপন্থী দেশকর্মীগণ শুধু তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা জেনে গিয়েছিলেন যে 'অহিংসা'র কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কখনো নতি স্বীকার করবে না। এজন্য তাঁরা সশস্ত্র আঘাত হানতে শুরু করলেন। এ সময় তিলক রাজ আনন্দ, অরবিন্দ ঘোষ, লাজপাত রায়, বিপিন পাল প্রমুখ চরমপন্থী এ-আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন। বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবীদের নেতৃত্বদান করেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) ও বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)। এরা দুজনেই হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এ-সময় বিপ্লবীরা ভারতীয় মুসলমানদেরকে বিপ্লবের পথে বাধা হিসেবে বিবেচনা করতেন। ফলে, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আদর্শ এবং এই আদর্শ বাস্তবায়নে পরিচালিত আন্দোলনের ধারা মুসলিম সম্প্রদায়কেও সচেতন করে তোলে। স্যার সৈয়দ আমীর আলী বহুধর্মভিত্তিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হয়ে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। এ-সময়কার সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা বদরুদ্দীন তায়েবজী (১৮৪৪-১৯০৬) ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। বড়লাট লর্ড ডাফরিন বহু চেষ্টা করেও তাঁকে কংগ্রেস থেকে সরিয়ে নিতে পারেননি।

বিশ শতকের শুরুতে খ্যাতিমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ সময়ে তিনি বিপ্লবী নেতা অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং একটি গোপন বিপ্লবী দলে যোগ দেন। একদিকে ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা এবং অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের অনগ্রসরতা উপলব্ধি করে তা অবসানের লক্ষ্যে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতেই 'মুসলিম লীগ' নবাব-জমিদার-জোতদারের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। সেখানে মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্তশ্রেণি অনেকটাই উপেক্ষিত ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে এদের স্বার্থের কথাও চিন্তা করে 'মুসলিম লীগ'। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। তবে ততদিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'স্বদেশী আন্দোলন' চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ইতিহাস-গবেষক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

---

১. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭. পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

> বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধকল্পে দীর্ঘ ছ'বছর ধরে বিপুল বাঙালি গড়ে তুলেছিল স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হল বটে, তবে বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক করে এবং দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত করে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী মধ্যবিত্ত বাঙালিদের শাস্তি দিয়ে গেল। এর ফলে যে ঐক্যবদ্ধ বাংলা গড়ে উঠল সেখানে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হল।[১]

মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই পুঁজিবাদী সভ্যতার ধারক ইংরেজ জাতি সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাদের আগ্রাসী তৎপরতায় মধ্যবিত্তশ্রেণি দিশেহারা হয়ে পড়ে। নব্য ধনিকশ্রেণির শোষণের ফলে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সংবেদনশীল মানুষ। তবে, কোনো সময়েই নব্যধনী, মহাজন বা পত্তনিদার শ্রেণির নেতৃত্ব কৃষকের কল্যাণ ও কৃষিভূমির উন্নতির কোনো চেষ্টা করেনি। বরং অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের ফলে চরম অবনতি ঘটে এদেশের কৃষক ও কৃষি খাতের। এর ফলে ভেঙে যায় প্রাচীন গ্রামীণ সমাজের আত্মনির্ভরশীলতা, ধ্বংস হয়ে যায় গ্রামের কুটির শিল্প। মহাসংকটে পতিত হয় এদেশের ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন ও সংস্কৃতি, সর্বোপরি এদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হয় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতি। কলোনি-শাসিত হয়ে ওঠে শহর-নগর, প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন শহর। সমালোচক বিনয় ঘোষ বলেন :

> উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে কলকাতা শহর। মার্কস-এঙ্গেলস্ কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে উল্লেখ করেন যে, 'বুর্জোয়াশ্রেণি সমস্ত দেশকে নতুন শহরের অধীন করেছে। তারা বড় বড় মহানগর গড়েছে, গ্রামের তুলনায় নগরের লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়েছে।[২]

এদিকে শহরে মধ্যবিত্তশ্রেণির পাশাপাশি উদ্ভব হয় নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণির। তারাও শাহরিক জীবন-যাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। দলে দলে শহরমুখী হতে থাকে সকল শ্রেণির মানুষ। শহরে এসে তারা ছোটোখাটো কর্মের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। জীবিকার্জনের জন্য তারা শ্রেণি-বিভাজিত হয়ে বেছে নেয় খুচরা ব্যবসা, ছোট ছোট দোকানদারী, ছোট ছোট কুটির শিল্প, মুদ্রণযন্ত্রের শ্রমিক প্রভৃতি পেশা। এ জনগোষ্ঠীর নিম্নস্তরে আরও একটি শ্রমিকশ্রেণির পত্তন হয়, যারা পারিবারিক ভৃত্য, কুলি, মজুর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে জীবিকার্জনের জন্য নিয়োজিত হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

---

১. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, কে.পি. বাগচী এন্ড কোং, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯১, পৃ. ১

২. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

> মধ্যবিত্তশ্রেণির আনুকূল্যে নগরে একটি নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব হইল। খুচরা ব্যবসায়ী, ছোট ছোট দোকানদার নানারকম ছোটখাট শিল্পের সাহায্যে জীবিকা অর্জনকারী ছোটখাট মুদ্রণযন্ত্রের চালক ও মালিক, ধনীর অধীনস্থ কর্মচারী প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ইহাদের নীচে ছিল পারিবারিক ভৃত্য, কুলি, মজুর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণী। কারখানা শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক মজুর প্রভৃতি সংখ্যাবহুল এক শ্রেণী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইল। গ্রামে কৃষি বা কুটির শিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা না হওয়াতে দলে দলে লোক ক্রমশ এই সব কার্যের লোভে শহরে আসিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের তুলনায় শহরের জীবনযাত্রার মান সহজলব্ধ হওয়ায় গ্রামবাসীর সংখ্যা কমিল এবং নগর ও নগরবাসীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। বাঙালির আর্থিক অবস্থার উপর ইহার যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল তাহার পূর্ণ বিকাশ হইল বিংশ শতাব্দীতে।[১]

এ সময়ে নব্যধনিকশ্রেণি ও শিক্ষিত চাকরিজীবীদের পাশাপাশি ভূমিহীন কৃষকদের অনেকেই শহরমুখী হয়। তবে শিক্ষিত চাকরিজীবীদের শহরের দিকেই আকর্ষণ ছিল বেশি। প্রথমে কিছুদিন তারা স্ত্রী-পরিবার গ্রামে রেখেই শহরের কর্মস্থলে বাস করতেন, বিভিন্ন পূজা-পার্বণ বা অন্য কোনো ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে গ্রামে এসে সবার সঙ্গে মিলিত হতেন। এরপর তারা পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সস্ত্রীক শহরে বসবাস করতে শুরু করেন। এর ফলে ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে পড়ে দীর্ঘকালের বহমান গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন। গ্রাম থেকে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের অধিকাংশই শহরমুখী হওয়ায় স্থবির হয়ে পরে গ্রামের উন্নয়ন।

কলকাতার বনেদী পরিবারের পূর্ব-পুরুষেরা এক সময় কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করেন এবং ইংরেজদের অধীনে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থ-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পত্তির মালিক হন। এঁদের মাধ্যমেই কলকাতায় গড়ে উঠেছিল দেশীয় নব্য-ধনিকসমাজ। নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে পৃথিবীর সবদেশে যেভাবে আধুনিক শহরের বিকাশ হয়েছে, অবিভক্ত বাংলায়ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে একই প্রক্রিয়ায় নগর সভ্যতার অভ্যুদয় ও প্রসার ঘটেছে।

'স্বদেশী আন্দোলনে'র সময়ে সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের কালে গ্রামের দরিদ্রশ্রেণির সঙ্গে শিক্ষিত শহরবাসীর যোগাযোগ শুরু হয়। এ সময়ে প্রকাশিত 'দৈনিক সন্ধ্যা', 'হিতবাদী', 'যুগান্তর' এবং সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী', 'বসুমতী', 'বঙ্গবাসী' – প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত স্বাদেশিকতার অগ্নিমন্ত্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে বিভিন্ন

---

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, সরকার পাবলিশিং এন্ড কোং, কলকাতা, প্রকাশকাল : জুন ২০০৬, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন – রাখীবন্ধন, স্বদেশী মেলা, বিজয়া সম্মিলনী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সকলস্তরের মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি আসে।

অসহযোগ আন্দোলন ও রুশবিপ্লবের চিন্তাধারার প্রভাব গণচেতনাকে আরও স্পষ্ট ও গতিশীল করে তোলে। মানুষের মূল্যবোধেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজ বিবর্তনের ধারায় এই মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারণের প্রকৃতি বদলে যায়। এই পরিবর্তন মানুষের চিন্তনক্রিয়াকেও প্রভাবিত করে। ফলে ব্যক্তির জীবনদর্শন যেমন বদলে যায়, তেমনি বদলায় সমাজ-চৈতন্য। 'রেনেসাঁসের পর ফরাসি বিপ্লব, শিল্পবিপ্লব, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতন এবং মানুষের সাংস্কৃতিক নান্দনিক রুচি পরিবর্তনের পটভূমিকায় মানুষের জীবনবিন্যাস ও পরস্পর সম্পর্কও জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের দ্বান্দ্বিক অভিঘাতে মানব জীবন অবলোকন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও উদ্ভাবিত হয়েছে নব নব দৃষ্টিভঙ্গি ।'[১] বলা যায়–

> ইউরোপীয় রেনেসাঁসের জীবনাবেগ ও ভাবতরঙ্গ উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, সমাজধর্ম সময় স্বভাব ও জীবনপ্যাটার্নের স্বাতন্ত্র্যে তার চারিত্র্য স্বতন্ত্র। ব্রিটিশ কলোনিগহ্বরে উদ্ভিন্নমান মধ্যবিত্তের মানস সংগঠনে সুদীর্ঘকাল ধরে লালিত-বর্ধিত সামন্ত মূল্যবোধের প্রত্নস্মৃতি দ্বন্দ্বময় স্বভাবের জন্ম দিয়েছিল।[২]

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মৌ প্যাক্ট স্বাক্ষরের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানদের মিলন হয়। সেই সঙ্গে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা ও আইন সভার আসন সংরক্ষণের বিষয়টি প্রধান্য পায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা ইংরেজবিরোধী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। প্রথম মহাযুদ্ধ বিশ্বের রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে ভাঙন ও বিপর্যয়। যুদ্ধে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের চেহারা নগ্নরূপে উন্মোচিত হয়। '১৯১৭ সালে বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা। রুশ বিপ্লব প্রতিটি সচেতন ভারতীয়ের দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়াশীল বিরাট এক বিশ্বশক্তির পতন হিসেবে চিহ্নিত হলো।'[৩] দেশের মধ্যে ক্রমশ সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বীজ রোপিত হয়। রাশিয়ার প্রাক-বিপ্লবের সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ও নৈতিক দুরবস্থার সঙ্গে

---

১. রফিকউল্লাহ খান, *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব*, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১১

২. রফিকউল্লাহ খান, *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১

৩. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি জাতির সাদৃশ্য খুঁজে পায় এদেশীয় শিক্ষিত যুবসমাজ। বিশেষত লেনিন যখন মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করলেন তাতে উদ্বুদ্ধ হলো বাঙালি শিক্ষিত যুবসমাজ। আর তারই ধারাবাহিকতায় জন্ম হলো 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'র। কমিউনিস্ট পার্টি বাঙালির আর্থ-সামজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

এই সময়েই ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর খেলাফত আন্দোলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধীও ভারতীয় জাতিকে নেতৃত্ব দিলেন। অপমানিত জাতিকে নিয়ে তিনি 'খেলাফত আন্দোলনে'র সঙ্গে তাঁর 'অসহযোগ আন্দোলন' শুরু করলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আরও তীব্রতর আকার ধারণ করে। জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ সকলেই দীর্ঘদিনের জড়ত্ব মোচন করে প্রচণ্ড বৈপ্লবিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল। গান্ধীজির অনুপ্রেরণায় শহরবাসী যুবসমাজ গ্রামে গ্রামে দুঃখী-দরিদ্র জনসাধারণের সম্পর্কে বাস্তব ধারণা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তবে, অসহযোগ আন্দোলন দেশবাসীর মনে যে গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছিল তা নানা কারণে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এই আন্দোলন দমন করার জন্য বড়লাট ডারউইন কংগ্রেস দল ও তার যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। বন্ধ করে দেন কংগ্রেসের সমর্থক যাবতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। গুলি চালনা, দৈহিক নির্যাতন, এমনকি নির্বিচারে গ্রেফতার শুরু হয়। এদিকে চৌরিচৌরায় 'অহিংস আন্দোলন' হিংসাত্মক রূপ গ্রহণ করায় গান্ধীজি এ-আন্দোলন বন্ধ করে দেন। প্রকৃতপক্ষে 'অসহযোগ আন্দোলন' – 'আইন অমান্য আন্দোলন'-এর সর্বজনীন আবেদন এবং এর সর্বভারতীয় প্রভাব উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের এক গৌরবজনক অধ্যায়। এই দুই আন্দোলনের সময়পরিধিতে অহিংস অসহযোগ এবং সর্বাত্মক আইন-অমান্য কর্মসূচির পাশাপাশি রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের অভ্যুদয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।[১]

এ-ভাবে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে রাউলাট বিলের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলাকালে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশব্যাপী গণআন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (১৮৮৭-১৯৫৪) নেতৃত্বে সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটতে থাকে। ফলে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রযাত্রা শুরু হয়। কমরেড মুজফফর আহমদও মানবেন্দ্র রায়ের মতোই বিপ্লবী সাম্যবাদে

১. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

আস্থাশীল হয়ে রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বাংলার প্রজা আন্দোলনকে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে তুলনা করে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে তাঁর অবদান অগ্রগণ্য। এ শতাব্দীর বিশের দশক থেকেই মূলত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়। এ-প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেন :

> প্রথম মহাযুদ্ধ বিশ্বের রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনিবার্য করে তোলে ভাঙন ও বিপর্যয়। যুদ্ধে পুঁজিবাদী বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী মুখচ্ছদ নগ্নরূপে হয় উন্মোচিত। ফলস্বরূপ বিশ্ব মানবসমাজের রাষ্ট্রিক, আর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এক অনিশ্চিত অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে এই তমসাঘন পরিবেশে ঊষা-সূর্যের আলোক-আভা ছড়িয়ে সংঘটিত হলো রুশবিপ্লব; বিরূপ বিশ্বে নৈরাজ্য-নৈরাশ্য, নাস্তি ও নঞর্থকতার বিপ্রতীপে শুভেচ্ছা ও শুভবুদ্ধি, প্রত্যাশা ও প্রত্যয়, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার নবমহামন্ত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো, দেশে–দেশে সাহিত্য সমাজ–রাজনীতিতেও ঘটলো তার অনিবার্য প্রভাব-প্রতিফলন।[১]

এদিকে কংগ্রেসের দোদুল্যমান মানসিকতার কারণে ভারতীয় রাজনীতিতে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রে সুভাষচন্দ্র বসুর আত্মপ্রকাশ ঘটে। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১) ঘোষণা কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদিত হয়। অন্যদিকে কংগ্রেসী রাজনীতির 'স্বরাজপন্থী' অংশ বাঙালি রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) নেতৃত্বে গান্ধীজির অহিংস কর্মসূচির সমান্তরাল 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা করেন।

একটি অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পটভূমিতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশে ঐতিহাসিক অবদান রাখে। এ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ববাংলার শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি এ-দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সুদূরসঞ্চারী ভূমিকা রাখে। সেই সঙ্গে এদেশীয় তরুণ-মানস সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ পায়, তেমনি সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি হয়। বস্তুত, 'বিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রারম্ভ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ-স্কুল উত্তীর্ণ নব্য শিক্ষিতের সমবায়ে ক্রমবিকশিত হচ্ছিল ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সামন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এই মধ্যবিত্তশ্রেণী, ইয়োরোপীয় বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদ-মানবতাবাদকে

---

১. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারকল্পে ১৯২৬-এ প্রতিষ্ঠা করে – 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এবং প্রকাশ করে মুখপত্র 'শিখা'। এ সাহিত্যসমাজের আদর্শ ছিল – 'চিন্তাচর্চা, জ্ঞানের সমন্বয়সাধন ও সংযোগসাধন'। পত্রিকায় ছাপানো হত, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন সৈয়দ আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল ফজল, কবি আবদুল কাদির, শামসুল হুদা, মোখতার আহমদ সিদ্দিকী, কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ।'[১]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র আন্দোলন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে গণজাগরণের সৃষ্টি করে। রেনেসাঁসের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত এ সংগঠনের মূল মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। এ গণজাগরণ ভারতের জাগরণের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত হওয়ায় বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' যুগসঞ্চারী ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। ত্রিশোত্তর কালের 'কল্লোলী'য় সাহিত্য ধারার বীজ এখানেও ছড়িয়ে পড়ে। 'কল্লোলের বীজ বপন হইয়াছিল ঢাকায় – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা 'বাসন্তিকা'য় (১৯২২)।...কল্লোলের প্রবাহ কিছুদূর গড়াইলে পর ইহার একটি কচি শাখা বাহির হইয়াছিল ঢাকায় – 'প্রগতি' ১৯২৭)।[২]

এদিকে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় পূর্ববাংলার মুসলমানদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তি সম্পর্কে এক ভিন্নতর ধারণার সৃষ্টি হয়। মুসলমান নেতৃত্ব অর্থনৈতিক কর্মসূচি ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে মিলেমিশে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 'এই নব উদ্যোগের নেতৃত্বে ছিলেন স্যার আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২), খান বাহাদুর আবদুল মোমেন, মৌলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), এ. কে. ফজলুল হকের মতো ব্যক্তিবর্গ। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলন'।[৩]

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা যুবসমাজকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে চাকরি দুষ্প্রাপ্য হওয়ার কারণে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্য প্রদেশের তুলনায় বাঙালির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে। এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতি 'কল্লোলগোষ্ঠী'র তরুণ

১. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা', *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগষ্ট ২০১০, পৃ. ৯৭

২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, ইস্টার্ন পাবলিশিং, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৬, পৃ. ২৭০

৩. রফিকউল্লাহ খান, *কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব*, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

লেখকদের চিন্তা জগৎকে আন্দোলিত ও আলোড়িত করে। বিশ শতকের শুরুতেই বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রভাব পড়তে শুরু করে। যুগের প্রয়োজনেই তাই বাধা-বন্ধনহীন মনের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করে। আর এটি পূর্ণতা লাভ করে 'কল্লোলগোষ্ঠী'র হাতে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'কমিউনিস্ট বিরোধী মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার' ফলে এই গোষ্ঠীর প্রভাব আরও বিস্তৃতি লাভ করে। বিশেষত এই মতবাদের প্রভাবে কৃষক-শ্রমিক-মজুরের জীবনসমস্যা অবলম্বন করে 'কল্লোলে'র সমকালেই 'সংহতি', 'লাঙল', 'গণবাণী' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জালালাবাদ যুদ্ধ, বিপ্লবী সূর্যসেনের (১৮৯৩-১৯৩৪) নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও তার পরিণামে তরুণ সমাজকে মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। তারা 'আইন অমান্য আন্দোলনে' সক্রিয় হয় এবং তাদের উজ্জীবিত যৌবনাবেগ প্রকাশ করতে থাকে। 'আর ঠিক সেই সময়েই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকে উপলক্ষ করে বাঙালি যুবসমাজ সন্ত্রাসবাদের আবর্তে আরেকবার ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মত। অসমাপ্ত 'স্বদেশী আন্দোলন' এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে রুদ্ধগতি 'অসহযোগ আন্দোলনে'র ফলে দেশের যুবসমাজে যে প্রাণবহ্নি সঞ্চিত হয়েছিল, সেই অবরুদ্ধ বহ্নিজ্বালা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত বিদীর্ণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করল জাতীয় জীবনে। কঠিন দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত যুবসমাজ এক ভাঙনের ভয়ঙ্কর নেশায় মত্ত হয়ে উঠল। বাঙালির যুবমানসে তা রেখে গেল এক গভীর নেতিবাচক সুর। মধ্যবিত্ত জীবন-পরিবেশে লালিত যুবসমাজের চোখে এই মৃত্যুভয়হীন তরুণদের বিস্ময়কর কার্যাবলী এক রোমান্টিক বিস্ময় জাগিয়ে তুলল। প্রচলিত মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবোধ তাদের চোখে ম্লান বিবর্ণ মনে হতে লাগল। চারপাশের কোন কিছুর উপরেই গভীর আস্থা বা শ্রদ্ধার মনোভাব রক্ষা করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল।'[১]

ত্রিশের দশকের শেষ দিকে মার্কসীয় তত্ত্ব ও সাহিত্য অধ্যয়ন, ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয়তা বাঙালি শিক্ষিত তরুণ সমাজকে প্রগতিশীল জীবনসত্যে আকৃষ্ট করেছিল। ইতঃপূর্বে অসহযোগ আন্দোলন সাময়িক বন্ধ থাকার পর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তা পুনরায় শুরু হয় এবং বিদেশী পণ্য বর্জনসহ নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই আন্দোলন দমন করার জন্য বড়লাট ডারউইন এ বছরই কংগ্রেসের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেন। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'আইন অমান্য আন্দোলনে' অংশগ্রহণের অভিযোগে তিনিও কারারুদ্ধ হন।

---

১. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র শাখা গঠিত হয়। এ-সংগঠন বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাঁরা মধ্যবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করে তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা অন্বেষণে নিমগ্ন হন।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে মুসলিম নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোর সাফল্য নিরূপণের প্রশ্নে 'উদীয়মান মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি ও হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যেকার তীব্র প্রতিযোগিতা'কে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সময়ে 'মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্তভাবে হলেও এ. কে. ফজলুল হক 'ঋণ সালিশী বোর্ড' (১৯৩৮), 'প্রজাস্বত্ব আইন' (১৯৩৯) এবং 'মহাজনী আইনে'র (১৯৪০) মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান ও চাষি সম্প্রদায়ের জন্য প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন।'[১] তবে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বা 'জমিদারি প্রথা' বিলোপে তিনি সক্ষম হননি। কারণ মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন জমিদারশ্রেণির প্রতিনিধি এবং মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ। এভাবেই ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার শাসনকালেই (১৯৩০-১৯৪১) মুসলিম লীগ প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

এ-সময় 'লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রথমদিকে রবিবাসরীয় সাহিত্য বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রেখেছিল। তখন 'প্রগতি সাহিত্যের মর্মকথা' নামক বিশ্লেষণধর্মী পুস্তিকা ও 'ক্রান্তি' নামক সাহিত্য সংকলনের মাধ্যমে এই সংঘের সাহিত্যাদর্শ প্রচার করা হতো। কিছুকাল পরে তারা 'প্রতিরোধ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এ পত্রিকায় তারা সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানাবিধ বিষয় অত্যন্ত শিল্পসফলভাবে তুলে ধরতেন। এর প্রভাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকেও প্রভাবিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে গবেষক রফিকুল ইসলামের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> প্রথম দু'বছর কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অচ্যুত গোস্বামী এবং পরবর্তী সময়ে রণেশ দাশগুপ্ত ও অজিত কুমার গুহের সম্পাদনায় 'প্রতিরোধ' ছিল পূর্ববাংলার যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ, দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা, দুর্ভিক্ষ ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে একক কণ্ঠস্বর। তৎকালীন সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার দিনে 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'প্রতিরোধ' পত্রিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে নিরপেক্ষ ও সুস্থ রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, অজিত কুমার গুহ, সানাউল হক, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, কবীর চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দীন, শহীদুল্লাহ কায়সার এবং আরও অনেকে।[২]

---

১. কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্টস্ পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৯
২. রফিকুল ইসলাম, 'ঢাকা' (সাংস্কৃতিক আন্দোলন), একুশের বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৭৯, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন অর্থাৎ পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনাসৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে মীমাংসাকারীর ভূমিকা পালন করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'আর এ ভূমিকার বীজ পাকিস্তান সৃষ্টির পরে অঙ্কুরিত হয়নি, এ বীজ রোপিত হয়েছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে – ১৯৪০-৪২, ৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের একাংশের মধ্যে। এ বীজের বৃদ্ধি ঘটেছিল ১৯৪৩-এর যুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ, মহামারিতে জনতার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে, রক্তক্ষয়ী আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিরুদ্ধে তাদের শান্তির মোর্চা সংগঠনে। কলকাতার রশীদ আলী দিবসের সংগ্রামী আওয়াজকে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তারিত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের জঙ্গী ভূমিকা পালনে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তর্ক, বিতর্ক, বক্তৃতা অর্থাৎ তার সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিবেশে তাদের দ্বারা মানব-কল্যাণ, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিকতার বোধ সৃষ্টির মধ্যে। এই মুসলিম তরুণদের আদর্শগত ভাবনাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই পূর্ববাংলার মানুষের মোহমুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগামীর দায়িত্ব পালন করে।'[১]

এ সময়ে অর্থনৈতিক কারণে একান্নবর্তী পরিবার ভাঙতে থাকে। ফলে পিতার শাসন থেকে উপার্জনক্ষম পুত্র মুক্ত হয়। নারীরা অনেকক্ষেত্রেই বন্ধনমুক্তি লাভ করে। দেশে অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির কারণে শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত উভয় শ্রেণির মানুষের জীবনে খাদ্য ও বস্ত্রসংকট দেখা দেয়। এ কারণে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। 'যুদ্ধোত্তর এই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক হতাশার পটভূমিতে আরো একটি আঘাত এসে পড়ল; নিষ্ঠুর দমননীতিমূলক রাওলাট আইন। একের পর এক হতাশা ও আঘাতের পেষণে জনজীবন প্রচণ্ড বিক্ষোভে যেন ফুঁসছিল। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগের বিশাল জনসমাবেশ সেই দেশব্যাপী বিক্ষোভেরই এক সংহত রূপ। সেই সভায় নৃশংসভাবে গুলি চালানোর ফলে অগণিত নিরীহ মানুষ নিহত হ'ল। এর ফলে জাতির দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়ল। সমগ্র জাতি যেন অকস্মাৎ জেগে উঠল এক চরম বোঝাপড়ার প্রত্যাশায়।[২]

চল্লিশের দশকে এদেশের শিক্ষিত তরুণ-মানসে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' ব্যাপক চেতনার সৃষ্টি করেছিল। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ – প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবে তিন দশকব্যাপী বাংলাদেশে যে নব্যশিক্ষিত, প্রগতিশীল ও বুর্জোয়া মানবতাবাদী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়, তা একটি সংঘবদ্ধ শ্রেণিচরিত্রের রূপ নেবার পূর্বেই কার্যকর হয় ভারতবিভাগ। এ বিভাগের নেপথ্যে যে

---

১. সরদার ফজলুল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ : অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৯৩, পৃ. ১৩৩ [দ্রষ্টব্য : রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয়ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭. পৃ. ১০]

২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

নব্য উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের আদর্শবাহী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র সক্রিয় ছিলো, এখন তা স্বীকৃত সত্যে পর্যবসিত।'[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) বাঙালির সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক রূপান্তর ঘটায়। এই যুদ্ধ যেমন বাঙালির মানব-অস্তিত্বের সংকটকে ঘনীভূত করে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরিণামে তাদের ক্ষমতা সংকোচনেরও কারণ হয়ে ওঠে। 'উপমহাদেশের রাজনীতির পটভূমিতে এ সময় অভূতপূর্ব ও নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ঘটনার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে। মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ২২ ডিসেম্বরকে মুক্তির প্রতীক ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত পরিস্থিতি, ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে ভারত সরকারের যুদ্ধে যোগদান, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণের লক্ষ্যে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ লাহোরে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগে'র এক সাধারণ অধিবেশন আহবান করেন (২২ মার্চ ১৯৪০)।'[২]

এই অধিবেশনে এ. কে. ফজলুল হক বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের চার শ' জন প্রতিনিধি নিয়ে যোগ দেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিপুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে এ প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানায়। অধিবেশনে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতিতত্ত্বের মতবাদ ও মুসলমান সমাজের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি তোলেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের প্রেরণা ও মুসলিম সমাজের নবজাগরণ এই দাবির অর্ন্তনিহিত কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। তবে, 'ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলমান-অধ্যুষিত প্রদেশ সমূহে মুসলমানদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বিধান করাই ছিলো তাদের লক্ষ্য। বাংলার দুই মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল হক ও শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন না। ইংরেজের সমর্থন থেকেও তাঁরা ছিলেন বঞ্চিত। মুসলিম সমাজের নবজাগরণের আন্দোলন, তাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের নিরাপত্তা বিষয়ে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন না। কারণ, বাংলাদেশের সমস্যা ছিল এ থেকে ভিন্ন। বাংলার নেতৃত্বের সামনে প্রধান সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি– স্বায়ত্তশাসন ছাড়া যার বাস্তবায়ন ছিল অসম্ভব।...১৯৪০ সালের ২৩ মার্চের সাধারণ অধিবেশনে এ. কে.

---

১. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২. মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৭৬, পৃ. ২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

ফজলুল হক ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। 'পাকিস্তান' শব্দের উল্লেখ না থাকলেও পরে একে আখ্যায়িত করা হয় 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে। এ প্রস্তাবের সারমর্ম হলো ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাংশে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ স্থাপিত হবে।'[১]

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর বাঙালি জাতীয় জীবনে চরম দুর্দশার কারণ হয়ে দেখা দেয়। এ দুর্ভিক্ষ বাংলার গ্রামীণ সমাজ জীবন ও শাহরিক জীবনকে অসহনীয় করে তোলে। 'দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসাবে ১৫ লক্ষ ছিল। কিন্তু বেসরকারি সূত্রের হিসাবে ৩৫ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যায় এবং ১২ থেকে ১৫ লক্ষ মানুষ পথের ভিখারীতে পরিণত হয়। অন্নের জন্য লোকে স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করে এবং নর্দমার ভিতর কুকুরের সঙ্গে উচ্ছিষ্টের ভাগ বসায়। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির বিবরণ অনুসারে বাংলাদেশের ছয় কোটি মানুষের জীবন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২] মন্বন্তরের ব্যাপক ছোবল গিয়ে পড়ে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। ফলে 'ভারত-ছাড় আন্দোলন' গ্রামীণ সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণ সমাজ রাজনীতি-সচেতন হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে সরদার ফজলুল করিমের বক্তব্য স্মরণীয় :

> নব্যশিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ও ধর্মকেন্দ্রিক সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ সৃষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর হয়ে পড়ে বীতশ্রদ্ধ। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সচেতন শিক্ষিত মানসে আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'শিল্পী সংঘে'র মাধ্যমে বুর্জোয়া মানবতাবাদী ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মার্কসবাদী জীবনদর্শন ও সাহিত্য-শিল্পভাবনার অনুশীলনচক্র গড়ে ওঠে।[৩]

১৯৪৫-৪৬ খ্রিষ্টাব্দে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'-এর বন্দিমুক্তির দাবি জোরালো হতে থাকে। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগসহ বামপন্থী, ডানপন্থী দলসমূহ ঐকমত্য প্রকাশ করে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র সদস্যদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় উত্তাল গণ-আন্দোলন শুরু হয়। 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদ আলির সাত বছরের কারাদণ্ডাদেশের প্রতিবাদে ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বিদ্রোহ-প্রতিরোধ দানা বেঁধে ওঠে। ১১ ফেব্রুয়ারি বিদ্রোহী জনতার ডালহৌসী স্কোয়ার অভিমুখে মিছিল

---

১. কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২. ভবানী সেন, *ভাঙ্গনের মুখে বাংলা*, ২য় সংস্করণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৪৫, পৃ. ১

৩. সরদার ফজলুল করিম, *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পুলিশ-কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ বাধে। লুটতরাজ ও সামরিক বাহিনীর গাড়িতে অগ্নিসংযোগ মোকাবেলায় পুলিশ গুলি চালায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টি কলকাতায় সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। ১২ ফেব্রুয়ারি ডালহৌসী স্কোয়ারে ঘটে লক্ষ জনতার সমাবেশ। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্মিলিত জঙ্গি শোভাযাত্রায়'[১] একই সঙ্গে তিন দলের পতাকা উড্ডীন হয়।

এ-পর্যায়ে বিশ্বমানবভূমি ছিন্নভিন্ন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। যুদ্ধে মিত্রবাহিনীর বিজয়ে বিশ্বরাজনীতিতে ভারতের মুক্তির বিষয়টি সামনে এসে পড়ে। এ-সময়ে সর্বভারতীয় পরিস্থিতি ক্রমশ একটি জটিল ও নাটকীয় রূপ লাভ করে। ফলে, 'সুদীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনা বাঙালি মুসলিম মানসে যে সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যচেতনার জন্ম দিয়েছিলো, তাকে সুকৌশলে ব্যবহার করে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ১৯৪৫-এর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ নির্বাচন এবং ১৯৪৬-এর 'প্রাদেশিক আইনসভা'র নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ-সময়কালে বাংলাদেশের মুসলিম লীগের ব্যাপক জনসমর্থন, ১৯৪১-১৯৪৬ কাল পরিসরে সংঘটিত অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 'লাহোর প্রস্তাবে'র অপব্যাখা, ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে আবুল হাসিম (১৯০৫-১৯৭৪) ও শরৎচন্দ্র বসুর (১৮৮৯-১৯৫০) সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা, বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে মাউন্টব্যাটেনের গোপন বিধান, মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দ্বিধাবিভক্তি প্রভৃতি ভারত-বিভাগকে এক জটিল অবস্থায় নিক্ষেপ করে।'[২]

এভাবে দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে সৃষ্টি হয় পৃথক দুটি রাষ্ট্র – ভারত ও পাকিস্তান। এ সময়ে ভারতীয় হিন্দু পুঁজিপতিশ্রেণি ও মুসলিম পুঁজিপতিশ্রেণির উদ্ভব হয়। তবে, মুসলিম পুঁজিপতিদের সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রাধান্য না থাকায় ভারতীয় হিন্দু পুঁজিপতিশ্রেণি ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এসময়ে– 'ভারতীয় হিন্দু-পুঁজিপতিশ্রেণি ও মুসলিম পুঁজিপতিশ্রেণি – উভয়ই তাদের শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করতে চাইলো। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করার আগে– দুই পুঁজিপতিদের হাতে ভারতকে ভাগ করে দিল– মুসলিম পুঁজিপতিদের অংশ পাক-ভারত, আর হিন্দু পুঁজিপতিদের হাতে হিন্দু-ভারত।'[৩]

---

১. ভীষ্মদেব চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২. কামরুদ্দীন আহমদ, পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৩. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশ', মনসুর মুসা (সম্পা.) *বাঙলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত সময়পরিসরে বৃহৎ-বঙ্গে এক নতুন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মেরুকরণ ঘটে। আর এমন এক রক্তাক্ত, দ্বন্দ্বময়, জটিল ও দ্বিধাবিভক্ত পটভূমিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। বাংলাদেশে নব্যশিক্ষিত, প্রগতিশীল ও বুর্জোয়াশ্রেণির উদ্ভব হয়। ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্তির সর্বভারতীয় আয়োজন এক জটিল ও নাটকীয় রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে সুদীর্ঘকালের ব্রিটিশ শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নবতর জটিল ও দ্বন্দ্বময় কালের সূচনা হয়। বলাবাহুল্য, এই ধ্বংস-সৃষ্টি-উত্তেজনামুখর সময়ে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেন বাংলা উপন্যাস-শিল্পের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিশোত্তর বাংলা উপন্যাসের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান

ত্রিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অস্বীকার করেন একদল তরুণ লেখক। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের স্থির আত্মপ্রত্যয়ের বিপরীত চেতনা নিয়ে নবতর সাহিত্যধারা সৃষ্টিতে প্রয়াসী হন। তাদের আবির্ভাব হয় বিশ শতকের তৃতীয় দশকে। 'রবীন্দ্র বলয়'-এর গতানুগতিক সাহিত্যধারা থেকে সরে এসে তাঁরা 'কল্লোল' 'প্রগতি', 'কালিকলম', 'উত্তরা', 'আত্মশক্তি', 'ধূপছায়া', 'সংহতি' প্রভৃতি সমভাবাপন্ন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একীভূত হন এবং যথারীতি সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। তাঁদের সৃজনপ্রক্রিয়ায় বাংলা সাহিত্য এক নতুন যুগে প্রবেশ করে; যাকে সাধারণভাবে অভিহিত করা হয় 'কল্লোল যুগ' বলে।

বস্তুত, সমগ্র ভারত যখন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় দিকভ্রান্ত, ঠিক এমনই এক প্রতিকূল পরিবেশে 'কল্লোলে'র (১৯২৩-১৯৩৫) আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'কল্লোলে'র অনুসারী লেখকগোষ্ঠী পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও প্রত্যয়গুলি বাংলা সাহিত্যে সন্নিবেশন করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, 'পুরোনো ধারার' মহত্তম শিল্পী রবীন্দ্রনাথ; তাঁকে অতিক্রম করতে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে নতুন ধারার সাহিত্য। এ-প্রসঙ্গে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র অন্যতম লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন :

> রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।[১]

সাহিত্যের বিষয় ও রীতিতে অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে আগ্রহী ছিলেন 'কল্লোল' পর্যায়ের লেখকরা। এই গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য ছিল প্রচলিত রোমান্টিক রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। যদিও এই উত্তরণের স্বরূপ তাঁদের নিজেদের কাছেই স্পষ্ট ছিল না। মূলত জীবনের সকল ক্ষেত্রে বন্ধনমুক্তিই ছিল তাঁদের কাম্য। "কল্লোল'কে নিয়ে যে প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস এসেছিল তা শুধু ভাবের দেউলে নয়, ভাষারও নাটমন্দিরে। অর্থাৎ 'কল্লোলে'র বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রেও। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায় রীতি ও পদ্ধতির

---

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, নবম প্রকাশ : মাঘ ১৪০৯, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতিতে। ভাষাকে গতি ও দ্যুতি দেবার জন্যে ছিল শব্দসৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনাশৈলীর বিচিত্রতা। এমনকি বানানের সংস্করণ। যারা ক্ষুদ্রপ্রাণ, মূঢ়মতি, তারাই শুধু মামুলি হবার পথ দেখে – আরাম রমণীয় পথ – যে পথে সহজ খ্যাতি বা কোমল সমর্থন মেলে, যেখানে সমালোচনার কাঁটা-খোঁচা নেই, নেই নিন্দার অভিনন্দন। কিন্তু 'কল্লোলে'র পথ সহজের পথ নয়, স্বকীয়তার পথ।'[১]

বাংলা কথাসাহিত্যের বিবর্তনে এই সময়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়া 'কল্লোলে'র তরুণ লেখকদের চেতনায়ও সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁদের চিত্তে সংশয় জাগে। 'এ সময় দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে য়ূরোপের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সাহিত্য জগতেও নতুন আন্দোলনের প্রেরণা নিয়ে আসে। 'কল্লোলে'র তরুণ লেখকেরা স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হলেন বিদেশী সাহিত্যের প্রতি।[২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে রচিত পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিশেষত ইংরেজি, রুশ ও স্ক্যান্ডেনেভিয়ান সাহিত্য ব্যাপকভাবে তরুণ সাহিত্যিকদের আলোড়িত করে। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বমানসলোকে যে ক্ষয়, নৈরাজ্য, ধ্বংস ও বিপর্যয় নেমে এসেছিল, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করে এদেশের তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠী হলো আলোড়িত। কার্ল মার্কসের অর্থতত্ত্ব এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বও তাদের আন্দোলিত করে। রুশ সাহিত্যের পঠন-পাঠনের মাধ্যমে তাদের মনোলোকে সঞ্চারিত হয় দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা। 'কল্লোল পর্বে'র তরুণ লেখকরা এসময় দরিদ্র মানুষের জীবনের অসহায়তার বাস্তবরূপ উপলব্ধি করেন। সেই সঙ্গে তাদের জীবনভিত্তিক উপন্যাস রচনার মাধ্যমে কথাসাহিত্যের সীমানা প্রসারিত করেন। বস্তুত, ইতঃপূর্বে রচিত বাংলা উপন্যাসে যে সব চরিত্রের জীবনাচার প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তাদের একটি বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে জমিদার, ধনী ও উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণি। ত্রিশোত্তরকালের লেখকদের রচনায় প্রথম দেখা যায় বস্তিবাসী, সাধারণ জেলে, চটকলের কুলি ও কয়লাখনির শ্রমিকশ্রেণির চরিত্র।

ত্রিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে যাঁরা রবীন্দ্রবলয় থেকে সরে এসে স্বতন্ত্রধারার সাহিত্য রচনা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

---

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭

২. শাহিদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯২, পৃ. ৪১

(১৯০১-১৯৭৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৮৮), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রমুখ। জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) উপন্যাসে গ্রামীণ হতশ্রী জীবনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। তিনি সমাজের নিম্নস্তরের মানুষগুলোকে দেখেছেন অন্তরের গভীর সহানুভূতি দিয়ে। ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রাচীন বিশ্বাসকে অস্বীকার করে তিনি মানুষকে একটি বিশেষ স্থানে দাঁড় করিয়েছেন। জগদীশ গুপ্তর লেখায় যৌনতা, প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজের অশুভ চেতনা ও দুঃখ-দারিদ্র্যের ক্লেদমলিন রূপ তাঁর লেখায় অপূর্ব ভাষানৈপুণ্যে ফুটে উঠেছে। জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন :

> জগদীশ গুপ্ত কোনোদিন 'কল্লোল' আপিসে আসেননি। মফস্বল শহরে থাকতেন, সেখানেই থেকেছেন স্বনিষ্ঠায়। লোককোলাহলের মধ্যে এসে সাফল্যের সার্টিফিকেট খোঁজেননি। সাহিত্যকে ভালোবেসেছেন প্রাণ দিয়ে। প্রাণ দিয়ে সাহিত্যরচনা করেছেন স্বস্থানসংস্থিত একনিষ্ঠ শিল্পকার।[১]

জগদীশ গুপ্ত যৌন-জীবনকে মানবজীবনের মৌল প্রবণতারূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসে যৌনচেতনার প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁর চরিত্রগুলোর অধিকাংশই মার্জিত রুচির নর-নারী নয়, তাদের যৌনতৃষ্ণাও প্রবল। 'যৌনক্ষুধা মানুষ মাত্রেরই জীবনে অন্ধ দুর্বার রহস্যময় শক্তি। সেই যৌনচেতনার অসংযত আতিশয্যকেও তিনি অস্বাভাবিক বলেননি। নীতিবাদীর মতো তার নিন্দাও করেননি। কেবল সেই যৌন অসংযম ব্যক্তিজীবনে কী নিগূঢ় জটিল যন্ত্রণাবিদ্ধ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার ছবিই তিনি বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন।'[২]

জগদীশ গুপ্তের প্রথম উপন্যাস *লঘুগুরু* (১৯২৮)। এই উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পরিচয়' পত্রিকায় 'জগদীশের রচনায় নৈপুণ্য আছে' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এক গণিকাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ, ও চরিত্র নির্বাচন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় উত্তমের গণিকাজীবন। কোনো বিশেষ কারণে নয়, নিতান্তই পেশাগত কারণে সে গণিকা। মানুষকে হাতে পেয়ে বশীভূত করার কৌশলটা তার জানা। অন্তর্গত সুপ্ত বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে এই শিক্ষা তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

---

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৮

২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ*, অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭, পৃ. ২৪৬

জগদীশ গুপ্তের *রোমন্থন* (১৯৩০) উপন্যাসে পল্লিসমাজের কুৎসিত রূপ, ও পল্লিবাসীর সংস্কারপুষ্ট জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। *যথাক্রমে* (১৯৩৫) উপন্যাসের কাহিনিতে গ্রামীণ পরিবেশ উপস্থাপনই লেখকের অন্বিষ্ট। পল্লিজীবনের নানা বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদি, সর্বোপরি দারিদ্র্য ও জটিলতার ছবি নিয়ে তৈরি হয়েছে এ উপন্যাসের কাহিনি।

জগদীশ গুপ্তের *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যে ভিন্নধর্মী এক নতুন যুগের সূচনা হয়। 'উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্রের ছদ্মনাম সিদ্ধার্থ, আসল নাম নটবর। সে বৈষ্ণবীর গর্ভে এক ব্রাহ্মণের জারজ সন্তান, দোকানের বিনি পয়সার চাকর, সখের থিয়েটারের ছোকরা অভিনেতা, টাকার বিনিময়ে এক বৃদ্ধা পতিতার শয্যাসহচর। এ-হেন নটবর সিদ্ধার্থ নামের এক শুদ্ধ চরিত্র ব্যক্তির ছদ্মনাম ধারণ করে, আর এর সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় তার দৈহিক অবয়ব। সে দেখতে সুপুরুষ, আকর্ষণীয় তার চেহারা। উপন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে এই আকর্ষণীয় চেহারা ঘটনাসৃষ্টিতে ও জটিলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। সিদ্ধার্থের এই যে বাইরের রূপ – আত্মশক্তিতে দৃঢ় সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল, এটাই তার একমাত্র রূপ নয়, ভিতরে সে দুর্বল, পরমুখাপেক্ষী। উপন্যাসের প্রথমে লেখক সিদ্ধার্থের এই দ্বৈত স্বরূপকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।'[১]

জগদীশ গুপ্ত এ উপন্যাসে আরো একটি বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন, আর সেটি হলো- প্রেমের অনুভূতি ও আবেদন স্বার্থনিরপেক্ষ নয়। বলা যায়, বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সিদ্ধার্থই প্রথম এ্যান্টি-হিরো। *মহিষী* (১৯২৯) উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত পুরুষের ইতরতাকে নির্মমভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'জগদীশ গুপ্ত তাঁর কালের যে সমাজ দেখেছিলেন তার একটা আপেক্ষিক সত্য চিত্রই আমাদের দিয়েছেন। তাঁর রচনা সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য এবং সেটা করলে বলতেই হবে জগদীশ গুপ্তের সততা তুলনারহিত। তাঁর রচনা আপসহীন সত্যসন্ধানী এবং তিনি আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের একজন পথিকৃৎ। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে প্রথাবিরোধী জীবনতৃষ্ণার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।'[২] আর এখানেই তাঁর সার্থকতা।

ত্রিশোত্তর বাংলা উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) স্বতন্ত্র ও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। বিংশ শতাব্দীতে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়প্রবাহে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর সদর্প আত্মপ্রকাশ। 'সমকালীন

---

১. সরকার আবদুল মান্নান, *উপন্যাসে তমস্যাবৃত জীবন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

২. হাসান আজিজুল হক, *বাংলা কথাশিল্পে কয়েকজন : মগ্ন অবলোকন ও সামান্য বিচার*, চারুলিপি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯১

সাহিত্যধারায় তিনি ছিলেন দলছুট ও ব্যতিক্রমধর্মী। কল্লোলীয় লেখকদের নগর-তৃষিত, বিকৃত ও পঙ্কমথিত জীবনদৃষ্টিকে তিনি গ্রাহ্য করেননি। জীবনের অব্যবহিত প্রয়োজন, প্রতিক্রিয়া, নৈরাশ্য-নৈরাজ্য ও জটিলতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি মানবজীবনকে সমগ্র ও অখণ্ডভাবে বিবেচনা করেছেন; এবং জীবনবিষয়ক এই উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিপুল সৃষ্টিকর্মে।[১] তাঁর উপন্যাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের জনজীবনের হতাশা, বিকৃতি-অবসাদ-আশ্রিত জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শের পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে। বিভূতিভূষণের উপন্যাসসমূহে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। যদিও তাঁর উপন্যাসের মূল সুর এটি নয়। তিনি সমাজ সচেতন লেখক হিসেবে উপন্যাসে সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর উপন্যাসে দুঃসময় ও দুঃস্বপ্নতাড়িত মধ্যবিত্তের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ-গবেষক সৌরেন বিশ্বাস বলেন :

> দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। জীবনের অজস্র জটিল সংশয় ও জিজ্ঞাসার মধ্যে নিভৃতপল্লীর শান্ত সুরের এক স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি নিয়ে এলেন বিভূতিভূষণ। জগৎ সংসার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ও আপনভোলা মানুষ – যান্ত্রিক জটিলতায় যে আবিষ্ট নয়, অন্তরের তাগিদ যার কাছে বড় – উপন্যাসে এমন সব চরিত্র আমদানী করলেন বিভূতিভূষণ।[২]

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে 'দক্ষিণ বাংলার গ্রামাঞ্চলের নিসর্গ ... অপরূপ রূপে দেখা দিয়েছে। এ নিসর্গ সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। যে ব্যক্তি এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় না, তাকে তিনি হতভাগ্য বলেছেন। দারিদ্র্যপীড়িতকে হতভাগ্য বলেন নি। চরম দুর্গতি, চিরন্তন অর্ধাহার বা অনাহার বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলিকে নীতিভ্রষ্ট বা শোষকের বিরুদ্ধে জিঘাংসাপরায়ণ করে তোলে নি, আর্থনীতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্ররোচনা দেয় নি। এ কথা বিভূতিভূষণের সব উপন্যাস সম্পর্কেই প্রযোজ্য। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', 'দৃষ্টিপ্রদীপ'... সম্পর্কে একথা সত্য।'[৩]

বিভূতিভূষণ *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে (১৯২৯) বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের এক বিস্তৃত সময়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। 'বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের সমাজগঠন, আর্থ-উৎপাদন কাঠামো রাষ্ট্রীয় জীবনের দ্রুত

---

১. গিয়াস শামীম, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ.৫

২. সৌরেন বিশ্বাস, *বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শতবর্ষের বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পৃ. ৩

৩. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ৪০

পরিবর্তনশীল রূপ ও স্বরূপ বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানে সমগ্র অবয়বে ধরা পড়েছিলো। তিনি প্রকৃতিকে সময় ও জীবনের চলমান প্রবাহের সঙ্গে সমন্বিত করে তাকে সমগ্ররূপে অঙ্কন করেছেন। *পথের পাঁচালী*...এর অপুর চরিত্র কল্পনায় ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি অভিজ্ঞতা নির্বিশেষ চারিত্র্যধর্ম অর্জন করেছে। সময়প্রবাহ, জীবনপ্রবাহ ও নিসর্গলোকের প্রাণময়তায় সমন্বিত বিন্যাসে এ-উপন্যাস বাঙালি সংবেদনশীল মনকে আলোড়িত করেছিলো গভীরভাবে।'[১] নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের দরিদ্র হরিহর রায়ের পরিবারের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার করুণ চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এ উপন্যাসে। হরিহরের পারিবারিক জীবনচিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি সমকালীন গ্রামীণ সমাজের বাস্তবধর্মী নানা চিত্র উপস্থাপন করেছেন তিনি। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান, কৌলীন্য প্রথা ও বর্ণবাদসহ নানা বিষয় তিনি তাঁর এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> যখন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিষণ্ন, উদ্‌ভ্রান্ত, সমস্যাতাড়িত, উৎক্রান্তির জন্য উন্মুখ যুবককুলের নানা মুখের রেখা নানা পটে ফুটে উঠেছিল তখন বিভূতিভূষণের উপন্যাসে আমরা অপু ও দুর্গাকে পেলাম। যারা তাদের শিশুত্বের জন্য বালক-বালিকার বয়ঃক্রমের জন্য প্রত্যক্ষত সেই সময়ের উল্লিখিত সমস্ত তরঙ্গাভিঘাতের দ্বারা অস্পৃষ্ট। এখানেই বিভূতিভূষণের শক্তি। যে মহাজাগতিক চেতনায় এই লেখক সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁর কল্পনাকে, যে-কল্পনার স্পেস এবং টাইম একই সঙ্গে সংগ্রথিত ছিল এক অভিজ্ঞতাসূত্রে।[২]

বিভূতিভূষণের *অপরাজিত* (১৯৩২) উপন্যাসে *পথের পাঁচালী*'র অপুর কৈশোর ও যৌবনকালের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের এ উপন্যাসের চরিত্রগুলো গ্রামের সহজ-সরল ও দারিদ্র্যপীড়িত। হরিহরের মতো অপুও দারিদ্র্যকে জয় করতে বা দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হতে পারেনি। *অপরাজিত*তে অপুর জীবনযুদ্ধের চিত্র যতটা না রয়েছে তার চেয়ে বেশি রয়েছে দারিদ্র্যের পীড়ন। আর সেই দারিদ্র্যের পীড়নই অপুর স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দৃষ্টিপ্রদীপ* (১৯৩৫) উপন্যাস সম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবন-নির্ভর না হলেও এ উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের কুসংস্কারের চিত্র ও গ্রামীণ জমিদারের নিষ্ঠুর চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাঁর *আরণ্যক* (১৯৩৯) উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে পূর্ণিয়া-ভাগলপুর অঞ্চলের এক বিশাল ও গভীর অরণ্য-

---

১. রফিকউল্লাহ খান, *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*, *মাওলা ব্রাদার্স*, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ২৩

২. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ২৬১

প্রকৃতি ও সে-ই অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে। 'এ-উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে বিভূতিভূষণ অঙ্কন করেছেন বাংলার বাইরের এক আরণ্যজনপদের ছবি। বাংলা সাহিত্যে অরণ্যজীবন নিয়ে এর পূর্বে আর কেউ লেখেননি। ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাপক অংশ জুড়েআছে অরণ্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্য প্রথম থেকেই সমাজভিত্তিক। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের আরণ্য-অভিজ্ঞতা ছিল না। বিভূতিভূষণই প্রথম অরণ্য ও অরণ্যনির্ভর মানুষের ব্যাপক ও বিশ্বস্ত জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর উপন্যাসে, বিশেষত আরণ্যকে।[১] *আরণ্যকে*'র অধিকাংশ চরিত্রই দরিদ্র। ভাতের পরিবর্তে তারা আহার করে চীনাঘাসের দানা, মকাই খেড়ির দানা, বাথুয়া শাক সিদ্ধ এবং কলাইয়ের ছাতু। ভাত তাদের কাছে অমৃত সমান। কখনো কখনো বিনা নিমন্ত্রণে একটু ভাতের জন্য তারা ছুটে যায় কাছারিতে। এ উপন্যাসে লেখকের অসাধারণ বর্ণনার স্বাতন্ত্র্যে অরণ্য-প্রকৃতি ও মানুষের বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছে। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেন :

> আরণ্যকে'র পটভূমি-এর বিচিত্র নর-নারী সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল বলা যেতে পারে। সেই অচেনা একান্ত জগতের কাহিনিকে বিভূতিভূষণ যেদিন আশ্চর্য শিল্পরূপ দান করলেন, সেদিন বাঙালী পাঠক বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন।...এ উপন্যাসে বাংলাদেশ নেই তার সামাজিক-পারিবারিক কোন পরিচিত পরিবেশের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না। দিগ-দিগন্তব্যাপী নির্জন অরণ্য সমাবৃত এ এক সম্পূর্ণ যাযাবর জীবন পরিবেশ।[২]

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ত্রিশোত্তর বাংলা প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কার থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। বাংলার মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর অবদান অশেষ। তাঁর উপন্যাস ও গল্প সমকালীন সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে ও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কাজী আবদুল ওদুদের *নদীবক্ষে* (১৯১৮) ত্রিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের উপন্যাসের ধারায় এক অভিনব সংযোজন। এ উপন্যাসে পূর্ব বাংলার চর অঞ্চলের মুসলমান কৃষক পরিবারের কাহিনি প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত, উদার মানবতাবাদী চেতনাপ্রবাহের শিল্পরূপ এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। নদীমাতৃক ও কৃষি-নির্ভর জীবনস্রোত থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সমাজ-অন্তর্গত মানুষের বাস্তবতালালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা প্রভৃতিকে এ উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক। কাজী আবদুল ওদুদের মননশীল যুক্তি ও বুদ্ধিনির্ভর চৈতন্যের গভীরে যে সংবেদনশীল শিল্প-অস্তিত্ব বিরাজিত ছিল *নদীবক্ষে* উপন্যাসে তারই

---

১. গিয়াস শামীম, বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩

২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ*, অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, কলিকাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

বাস্তব অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও এ উপন্যাসের 'স্বাভাবিকতা, সরলতা ও নতুনত্বে' আনন্দ লাভ করেছিলেন। এ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেনের বক্তব্য স্মরণীয় :

> ব্যক্তির অর্ন্তগত জীবন ও বর্হিবাস্তবতাকে সমন্বিত করার চেষ্টায় কাজী আবদুল ওদুদের *নদীবক্ষে* বিশিষ্ট। চরিত্রায়ন, চরিত্র-অন্তর্মুখ গ্রামবাংলার বহির্বাস্তবতার বিন্যাস, রবীন্দ্র-প্রভাবিত সংবেদনময় সৃষ্টিশীল গদ্যরীতির ব্যবহার ঔপন্যাসিক-ফর্ম নিরীক্ষায় *নদীবক্ষের* বিশিষ্টতাকে করেছে সুচিহ্নিত।[১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) কল্লোল যুগের অন্যতম প্রধান লেখক। তিনি 'সমসাময়িক বাংলা উপন্যাসের পটভূমিকায় এক বিরল ব্যতিক্রম। তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য হলো মানুষ ও সমাজ; সামাজিক সংঘাত ও দৈশিক রাজনীতি। বিশেষত, সমাজভিত্তির রূপ ও রূপান্তরের গতি ও চারিত্র্য স্বোপার্জিত জীবনবীক্ষায় বিধৃত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে।'[২] প্রান্তিক জনমানুষের জীবনভাষ্য তিনি তুলে এনেছেন অকপটে। রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং তারই মাঝে গোটা মানুষের অভ্যুদয়ই তাঁর উপন্যাসের অন্বিষ্ট। মূলত, জীবনের প্রতি এক গভীর আসক্তি ও আগ্রহ থেকেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। ফলে, তাঁর সাহিত্য নির্দিষ্টকালে ও নির্দিষ্ট অঞ্চলের নিবন্ধ জীবনই মহাজীবনের অনিঃশেষ কাহিনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। 'কল্লোল-গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের অবক্ষয়ধর্মী দ্বিধাগ্রস্থ জীবন-চেতনার পটভূমিতে তারাশঙ্কর নিয়ে এলেন এক সুস্থ সবল ও ঋজু জীবনবোধ, জীবনের রস ও রহস্যের এক আদিম প্রাণবন্ত চেতনা। এই 'জীবন' তাঁর আলোচ্য পর্বের সাহিত্যে বহু বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কখনও ক্ষয়িষ্ণু সামন্তজীবনের করুণ অতীত চারণায়, কখনও বা লোকজীবনের রোমান্টিক রূপচিত্রে সহজিয়া বৈষ্ণব, বেদে-সাপুড়ে, ডোম বাউড়ীর জীবনকথায়। আবার কখনও বা দারিদ্যপীড়িত কৃষকের করুণজীবনচিত্রে অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপে নিরুপায় কৃষক কর্তৃক শ্রমিক-বৃত্তি গ্রহণের অসহায়তার বর্ণনায় কিংবা আদর্শদীপ্ত অহিংস জাতীয়তাবাদে তাঁর ব্যাপক ও গভীর সুস্থ জীবনাগ্রহ মূর্ত হয়ে উঠেছে।[৩]

---

১. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, *বাংলাদেশের উপন্যাস : আঙ্গিক বিবেচনা*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১০, পৃ. ১১২

২. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৭৫

৩. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০-২৭১

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শৈশবকাল থেকেই জীবন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রচিত সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। ভারতবর্ষের উপনিবেশিক বাস্তবতা তারাশঙ্করের উপন্যাসে কখনো প্রতীকী মহিমায়, কখনো প্রতিরোধ-প্রতিবাদে, দ্রোহে-আপসে, আবার কখনো রাজনীতি কিংবা অর্থনীতিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। *চৈতালী ঘূর্ণি* (১৯৩১), *ধাত্রীদেবতা* (১৯৩৯), *কালিন্দী* (১৯৪০), *গণদেবতা* (১৮৪২), *পঞ্চগ্রাম* (১৯৪৩), *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭) প্রভৃতি তারাশঙ্করের প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাস। এ-উপন্যাসসমূহে সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তারাশঙ্করের *চৈতালী ঘূর্ণি* উপন্যাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যাঁতাকলে পিষ্ট রাঢ়বঙ্গের গ্রাম-সমাজের ভেঙে পড়া রুগ্‌ণরূপ, মানুষের শহরমুখি হওয়া, চতুর্দিক থেকে জীবনকে আঁকড়ে ধরার চিত্র ফুটে উঠেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গড়ে ওঠা শতাব্দীর গ্রামসমাজ যেন প্রলয় ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। এক যুগান্তকারী ঝড়, যার মাঝখানে প্রচণ্ড এক ঘূর্ণি, সেই ঘূর্ণির মধ্যে দেখা যায় লণ্ডভণ্ড ঘুরপাক খাচ্ছে জনপদসমূহের বড় বড় টুকরো – জনজীবনের এমন সর্বব্যাপক বাস্তবতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় কোনো উপন্যাস বিরল। 'কৃষিসভ্যতা-নির্ভর গ্রামীণ-সমাজের অবক্ষয়ের বিপরীতে শাহরিক শিল্পাঞ্চল-সংস্কৃতির উত্থান ও আধিপত্য বিস্তার, বিশেষ ক'রে উন্মুলিত কৃষিজীবীর শিল্প-শ্রমিকে গোত্রান্তরিত হওয়ার ঐতিহাসিক অথচ বেদনাবাহিত বাস্তবতা *চৈতালী ঘুর্ণি* উপন্যাসের মুখ্য কথাবস্তু। শ্রমঘণ্টা ও শ্রমমূল্যের বিস্তৃত ব্যবধান সূত্রে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রমিকপক্ষের উন্মেষিত অসন্তোষ, সাংগঠনিক সামর্থ অর্জনের প্রয়াস এবং আহূত ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের রক্ষক্ষয়ী পরিণতি উপন্যাসটির রাজনৈতিক আবহকে নির্মাণ করেছে।'[১]

তারাশঙ্করের শিল্পীমানসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হলো ঐতিহ্যপ্রীতি। তাঁর রচিত উপন্যাসে তাঁর মানসিকতার এক বিশিষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয়। প্রথম পর্বের রচনায় তাঁর নিজস্ব প্রকাশ যেমন অনায়াসে স্থান লাভ করেছে, তেমনি তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রের প্রতিরূপ অকপটে প্রকাশ পেয়েছে। *ধাত্রীদেবতার* ঘটনা বিন্যাসের মধ্যে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তারাশঙ্কর। এ উপন্যাসের শিবনাথ তারাশঙ্করের তারুণ্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

১. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

তারাশঙ্করের *কালিন্দী* উপন্যাসে দুটি জমিদার পরিবারের নানাবিধ সমস্যা জটিল কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। এ উপন্যাসের সীমিত পরিসরে কালিন্দী-তীরবর্তী জনজীবনের, বিশেষত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বঞ্চনাময় জীবনস্বরূপ চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক।...আজন্ম-পরিচিত মাতৃভূমি বীরভূমের তথা রাঢ় অঞ্চলের পট-পরিবেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁর প্রীতিসিক্ত অঙ্গীকার এ-উপন্যাসেও পেয়েছে শিল্পিত অবয়ব।[১] এ-উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে গ্রামের মাটি ও মানুষের কথা, জমিদার, চাষি, ব্যবসায়ী ও আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি। এর একদিকে গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু জমিদারশ্রেণি, অন্যদিকে নব্যধনিকশ্রেণি ও ব্যবসায়ী। এছাড়া রয়েছে গ্রামের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র। 'তারাশঙ্কর এই আখ্যান বিন্যাসে কৌমসমাজের প্রতিভূ ভূমিপুত্র সাঁওতালদের উন্মূলিত হওয়ার ঘটনায়, ভূমিলোলুপ সামন্ত ভূস্বামীর নায়েব-গোমস্তা-মুহুরির দোলাচলে, আধুনিক প্রাক-বুর্জোয়া ভূমিরাক্ষস কলমালিকের কৌশলী-ষড়যন্ত্রে চরের মালিকানা-স্বত্ব অধিকারের মহাযজ্ঞে এবং সর্বোপরি ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম প্রতীকী-নেতা সোমেশ্বর চক্রবর্তী ওরফে রাঙাঠাকুরের পৌত্র অহীন্দ্রের মার্কসবাদে আস্থা-স্থাপন এবং নবগঠিত গোপন মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে করারুদ্ধ হওয়ার তথ্য সংকেতে বিশ্ব সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাক্রমকে কালিন্দীর চরের দর্পণে প্রতিভাসিত করতে চেয়েছেন। সমাজ-সভ্যতার বিবর্তনে মার্কসীয়-সমাজতত্ত্বের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পিত গ্রন্থ বা অধ্যায় হয়ে উঠেছে এই উপন্যাস– *কালিন্দী*।'[২]

তারাশঙ্করের *গণদেবতা* সমকালের বাঙালির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ভাষ্য। উপন্যাসের প্রথম অংশ 'গণদেবতা'য় পল্লিজীবনের নানাবিধ সমস্যার কথা ফুটে উঠেছে। আধুনিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রভাবে গ্রামীণ সমাজের প্রাচীন রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ উপন্যাসে গ্রাম-পঞ্চায়েতের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা, বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে সমাজশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়াস কীভাবে প্রতিহত হয়েছে তা লেখক সুচারুরূপে চিত্রিত করেছেন।

গণদেবতা উপন্যাসটি তৎকালীন ভারতবর্ষে গ্রামবাংলার নিপীড়িত মানুষের দর্পণ হিসেবে সমাদৃত। সেই সঙ্গে শাসন এবং শোষণের সহস্র বছরের চলমান দলিল হিসেবে চিহ্নিত। *গণদেবতায়* জমিদার ভূমি জরিপের পর পরই খাজনা বৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত নেয় তা কৃষকেরা মানতে রাজি হয় না। মূলত ফসলের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে

---

১. গিয়াস শামীম, বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৫, পৃ. ১৫৯

২. ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'কালিন্দী : সামাজিক বিবর্তনের অনু ইতিহাস', *কথাশিল্পের কথামালা শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৪২

জমিদার খাজনা বৃদ্ধি করতে চায়। অন্যদিকে চাষি-প্রজারা জমিদারের খাজনা বৃদ্ধি মেনে নিতে পারে না। *গণদেবতা* অংশের প্রাক্ সমাপ্তি পর্যায়ে সেটেলমেন্ট দপ্তরের ভূমি জরিপকে কেন্দ্র করে জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির বিষয়টি সামনে আসায় দেবুকে আত্ম-জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় এবং এর মাধ্যমে তার নবজন্ম ঘটে।

পঞ্চগ্রামে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও উত্তাল রাজনীতির পটভূমিকায় দেবু ঘোষের নব জীবনবোধ চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসে দেবু যখন পঞ্চগ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইরসাদকে সঙ্গে নিয়ে জমিদারদের অত্যাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, ঠিক তখনই জমিদারেরা সুকৌশলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গাসৃষ্টির উত্তেজনা তৈরি করেছে। এ বিষয়টি উপস্থাপনের মাধ্যম লেখক বিপরীত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দুটি প্রতিবাদী চরিত্রের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রূপায়ণে সচেষ্ট হয়েছেন। এ উপন্যাসের দেবুর ভাবনায় লেখকের স্বপ্নমণ্ডিত স্বদেশভাবনা ব্যক্ত হয়েছে।

তারাশঙ্করের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* শুধু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা নয়, বরং বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বাংলাভাষার একটা বিস্ময়। 'কোপাই নদীর প্রায় বৃত্তাকার বাঁক, মেয়েদের গলার হাঁসুলীর মতো সেই বাঁকে নিবিড়-নিশ্ছিদ্র বাঁশবন, বেতবন। সূর্যের আলো সেখানে ঢোকার পথ পায় না। এইখানে বাঁশবাঁদির কাহারদের বসবাস। লৌকিক দেবতা-অপদেবতার নির্দেশে চলে কাহারদের সমাজ। নির্দেশ আসে কাহার-সমাজের প্রধানের কাছে, অতীতের ছায়ালোক থেকে, মৃতদের জগৎ থেকে। প্রকৃতির শব্দ গন্ধ স্পর্শ রঙ রেখা থেকে কেবলই চিহ্ন আসে, সংকেত আসে। এসবের ব্যাখ্যা করে লোমচর্ম গ্রাম্যবৃদ্ধা। কুসংস্কার, লোকবিশ্বাস, প্রথা, রীতি, করণ-কারণ, বজ্রের মতো কঠিন অনুশাসন মানুষের সমস্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজবিজ্ঞানীর নিষ্ঠায় রাঢ়ের এই প্রান্তবাসী, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য সমাজের ছবি এঁকেছেন তারাশঙ্কর।[১]

তারাশঙ্করের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসের কাহিনি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি-বাঁশবাদি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত কোপাই নদীর বিখ্যাত হাঁসুলী বাঁকের কাহার সম্প্রদায়ের পিতৃপুরুষের জীবন বিশ্বাস-বাহিত উপকথা এবং অপরটি কাহার সম্প্রদায়ের ভাঙন, কৃষি নির্ভর জীবনের ক্রম অবসান এবং বাঁশবন ঘেরা উপকথার হাঁসুলী বাঁকের বিরান প্রান্তর হওয়ার কথকতা। উপন্যাসে 'কাহারদের জীবনযাপন এবং সঙ্গে সঙ্গে

১. হাসান আজিজুল হক, বাংলা কথাশিল্পে কয়েকজন : মগ্ন অবলোকন ও সামান্য বিচার, চারুলিপি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪১১, পৃ. ৭৫

জীবিকারও বদল ঘটে গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। বনওয়ারী এ পরিবর্তন দেখে যতই বলেছে এ যুদ্ধে কাহারদের কিছু যায় আসে না ততই সে দেখেছে চোখের সামনে সব বদলে যাচ্ছে।'[১] তবে ঔপন্যাসিকের অধিক সমাজমনস্কতা, ইতিহাসচেতনা ও রাজনৈতিকবোধের কারণে দুটি কাহিনিস্রোতধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। *'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'*য় বিশেষ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী প্রত্নপ্রতিম উপকথার জগতে বিচরণ করলেও ঐ বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপকথানির্ভর জীবনে নতুন কালের অভিঘাত কিভাবে সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব ও সত্যকে বাস্তবায়িত করেছে – সমাজ-রাজনীতি-নৃবিজ্ঞানের সমন্বিত পর্যবেক্ষণে তা উদ্ভাসিত হয়েছে। ফলে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-য় সমাজগতির অনিবার্য পরিণতি লাভ করেছে শিল্প-প্রমূর্তি।'[২] বলা যায়, 'একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রতিফলক হওয়া সত্ত্বেও পরিশেষে এটি হয়ে উঠেছে চিরায়ত জীবন-উপলব্ধির স্মারক; অবিস্মরণীয় মহাকাব্য।'[৩]

তারাশঙ্করের উপন্যাসে সামন্তসমাজের অবসান ও ধনতান্ত্রিক সমাজ জীবনের সূচনাপর্বের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক শিল্পরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর *'চৈতালী ঘূর্ণি'*র শ্রমিক আন্দোলন, *ধাত্রীদেবতা-গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম*, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে আর্থ-সামাজিক-সামাজিক বাস্তবতা ও *কালিন্দী*র রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যতিক্রমী ইঙ্গিতবহ উপস্থাপন তাঁর শিল্পিত সৌকর্যে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর বহন করে। উপন্যাসে বর্ণিত আঞ্চলিকতা, সমাজের নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীজীবন উপস্থাপন তাঁর উপন্যাসসমূহকে কালোত্তীর্ণ করেছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) 'কল্লোল যুগে'র অন্যতম প্রধান লেখক। বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকটি কালজয়ী উপন্যাসের প্রণেতা তিনি। কুমারডুবি কয়লাখনিতে কাজ করার সময়েই তিনি গল্প ও উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত হন। তাঁর রচনায় কয়লাখনির শ্রমিকদের শোষিত জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কিছুদিন পর তিনি কুমারডুবি থেকে কলকাতায় আসেন এবং সেখানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাস প্রমুখের সাহচর্য লাভ করেন এবং 'কালিকলম' ও 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখক শ্রেণিভুক্ত হন। এক পর্যায়ে তিনি এ সাহিত্য আন্দোলনের সামনের সারিতে চলে আসেন।

---

১. মাহমুদ উল আলম, *বাংলা কথাসাহিত্যে যুদ্ধজীবন*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০০, পৃ. ২৮৮

২. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৩ গিয়াস শামীম , বাংলা সাহিত্যে অঅঞ্চলিক উপন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৯

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলোর মধ্যে *বধূবরণ* (১৯৩১) এবং *কয়লাকুঠির দেশ* (১৯৫৮) অন্যতম। তবে তাঁর *কয়লাকুঠির দেশ*ই সবচেয়ে বাস্তবধর্মী ও জনপ্রিয় উপন্যাস। উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের গতিধারাকে বদলে দিয়েছিল। *কয়লাকুঠির দেশে* একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের সব গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য ও যাবতীয় উপাদান উপস্থিত। এ উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালি পাঠক প্রথম জেনেছিল আসানসোল, রানিগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনিতে কর্মরত কুলি-কামিন, সাঁওতাল, বাউড়িদের নিয়তিতাড়িত মর্মান্তিক জীবনচিত্র, যাদের কথা এর আগে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ তুলে ধরেননি। নামহীন অন্ত্যজ ও অবজ্ঞাত এই মানুষগুলিকে নিয়ে যে কালজয়ী সাহিত্য রচনা সম্ভব তা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেন। এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন :

> কয়লাকুঠির গল্পগুলি বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠক সমাজের একঘেয়ে প্রথাবদ্ধ জীবনে এক অনাস্বাদিত মুক্তির সুখস্পর্শ বহন করে আনল। এক সজীব সতেজ জীবনরসের অফুরন্ত স্রোত প্রবাহিত করে দিল বাংলা কথাসাহিত্যে। কয়লাখনির অতল থেকে লেখক তুলে আনলেন দীপ্ত প্রাণের হীরকখণ্ড। রাণীগঞ্জ ধানবাদ অঞ্চলের কয়লাকুঠির অধিবাসী সাঁওতাল, বাউড়ী কুলি-কামিনীদের সুস্থ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আদিম জীবনের নিঃসঙ্কোচ প্রেম, ঈর্ষা, আত্মত্যাগ ও অকুণ্ঠ স্থূল উদ্দামতার বলিষ্ঠ সরল কাহিনী বাঙালী পাঠকের বিস্মিত দৃষ্টিতে মুগ্ধ অভিভূত করে দিল।[১]

কয়লাকুঠির দেশের কাহিনিতে দেখা যায়, সেখানকার গ্রীষ্মকাল নিদারুণ। মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্যের তাপ, পায়ের নিচের মাটি 'তেতে আগুন' – এমন অবস্থায় মানুষগুলি বর্ষাকালের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। কিন্তু সেবার বর্ষার দেখা নেই, চারিদিকে তাই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা। *কয়লাকুঠির দেশ* উপন্যাসের চরিত্রগুলি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মাতামহ বেশ কয়েকটি কয়লাখনির মালিক ছিলেন। সেই সূত্র ধরে কয়লাখনির কুলি, মজুর, শ্রমিকদের জীবনাচার নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকাটা লেখকের জন্য অস্বাভাবিক নয়। আর এ পরিচয় আরও গভীর হয় যখন তিনি কোলিয়ারিতে চাকরি করতে যান। এ সকল চরিত্র পর্যবেক্ষণে লেখকের অসাধারণ দক্ষতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রশংসা করেছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *বধূবরণ* (১৯৩১) পরিপূর্ণ সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনি বয়নই এখানকার মূল উপজীব্য বিষয়। উপন্যাসে সুষমার সন্তানহীনতা নিয়ে লেখক যে গল্পের অবতারণা করেছেন তা আমাদের প্রচলিত সমাজ কাঠামোরই অংশ। সন্তানহীনা 'বাঁজা' নারী সমাজের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত। সুষমা তাই ক্রমাগত উত্তেজিত হতে থাকে, হতাশ হয়ে পড়ে। জীবন থেকে তার সুখ, শান্তি,

---

১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

স্বস্তি সব হারিয়ে যায়। তার হৃদয় মাতৃত্বের জন্য হাহাকার করে ওঠে। কাহিনির গতিধারা চলতে থাকলেও পরিণতিতে আত্মহননই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বনে পরিণত হয়। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নাগরিক মননসমৃদ্ধ হলেও তাঁর রচনা গ্রামীণ জীবনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। তিনিই প্রধানত গ্রামীণ জীবন তথা শিল্পাঞ্চলের সাহিত্যের প্রথম সার্থক রূপকার। বিশেষষত এ অঞ্চলের নারীনির্যাতনের মর্মন্তুদ কাহিনি তাঁর উপন্যাসে প্রাধ্যন্য লাভ করেছে। অসহায় নারীর বিড়ম্বিত জীবনের কথা তিনি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৮৮) ত্রিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃত। তিনি উপন্যাসে সমাজ ও জীবনের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। তাঁর *বেদে* (১৯৩৩) উপন্যাস পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি।...তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে মনে তোমার প্রশংসা করেছি। সেই কারণে এই দুঃখবোধ করেছি, কোন কোন বিষয়ে তোমার পৌনঃপুন্য আছে- বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুন প্রবৃত্তি। সে প্রবৃত্তি মানুষের নেই বা তা প্রবল নয় এমন কেউ বলে না। কিন্তু সাহিত্যে সকল বিষয়ে সংযম আবশ্যক, এ ক্ষেত্রেও। ...যে মানুষ মাটির কাছাকাছি আছে তাকেই তুমি নানা দিক থেকে দেখতে গিয়েছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস মিথুনাসক্তি সম্বন্ধে তারা এত বুভুক্ষু নয়– অন্তত আমাদের দেশের হিন্দু জনসাধারণ। এ সম্বন্ধে উগ্রতা নরোয়ে প্রভৃতি দেশের সাহিত্যে দেখেছি। দেখে আমি এ মনে করে বিস্মিত হয়েছি যে আমাদের দেশের মানুষের এ ব্যাপারে এমনতর নিত্যজাগ্রত লালসা নেই (পল্লী গ্রামের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে)। আমাদের দেশের শিক্ষিতশ্রেণির মধ্যে এই প্রবৃত্তির উৎসুকতা অনেকের মধ্যে আজকাল দেখা যায়- তার প্রধান কারণ মানুষের জীবন ক্ষেত্রের বিচিত্র ব্যাপারে তাদের ঔৎসুক্য নেই- সেই কারণেই এই এক নেশা নিয়েই তারা নিজেকে ভোলাতে চায়।...এই কারণে আমাদের সাহিত্যে এখন এই মিথুনাসক্তির লীলা বর্ণিত দেখি তখন তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্দাম বলিষ্ঠতার পরিচয় পাইনে – সেই জন্যে ওটাকে – অশুচি রোগের মতই বোধ হয়। ...এই জন্যই নরোয়েতে যেটা দৃষ্টিকটু নয় আমাদের দেশে সেটা কুৎসিত। অন্যান্য বিচার সম্বন্ধেও তাই। আমাদের সাহিত্যে বারে বারেই কেবলি দুর্বল রুগ্‌ণ মুমূর্ষুদের লালায়িত লালসার অতিবর্ণনায় আমরা মানুষের যে মূর্তি দেখি সেটা বীভৎস- তার আনুষঙ্গিক ভাবে প্রবল প্রবৃত্তিশালী চিত্তের প্রচণ্ডতা দেখতে পাইনে বলে অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হয়। এই রকম রোগ বিকারের বর্ণনাস্থান সাহিত্য নয়। এটা ডাক্তারী শাস্ত্রে শোভা পায়।[১]

১. *'বেদে'* উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ৩১ শে আশ্বিন, ১৩৩৫, কল্লোল, বৈশাখ, ১৩৩৬, (দ্রষ্টব্য : মাহবুব সাদিক, *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত*, জীবনীগ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ. ২৫)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও রবীন্দ্রপ্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। একসময় তিনি ভাবতেন রবীন্দ্রনাথই সবকিছুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু *কল্লোলে* এসে তাঁর সে ভাব আস্তে আস্তে কেটে যেতে থাকে। তিনি দেখলেন এক নতুন পৃথিবী। ভাবলেন, আর অনুকরণ নয়, সৃষ্টি করতে হবে নতুন অধ্যায়। নতুন সাহিত্য সৃষ্টির এ প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি সফল হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি বাংলা সাহিত্যে লাভ করলেন স্থায়ী আসন। অচিন্ত্যকুমারের নায়ক-নায়িকারা স্থবির সমাজের পঁচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আন্দোলন করে ভারতীয় সমাজ জীবনকে 'টুটাফুটা' কিংবা 'বেদে' করে দিয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের ক্ষেত্রে যৌনতা হচ্ছে সাহিত্যের উপাদান, তবে বুদ্ধদেব বসুর মতো 'বীভৎস যৌন মিলন' নেই; অনেক ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমার রোমান্টিক ভাবদৃষ্টির আশ্রয় নিয়েছেন। *বেদে* সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেছেন :

> কল্লোল পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বই নিয়ে সমালোচক মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছিল। সমালোচকদের মতে, কল্লোলে প্রকাশিত সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারি উপন্যাস 'বেদে'। এ বই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন ছিল যথার্থ। নয় বছর বয়স থেকে একুশ বাইশ বছরের একটি ছন্নছাড়া মানুষের জীবনই এই উপন্যাসের পরিধি। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে- রহস্যঘন তটরেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদীর মত প্রবাহিত যার জীবন সেই তো বেদে। এমনি ছয়টি ঘাটে-জীবনে যেমন ছয়টি রস, অম্ল, মধুর, লবণ, কটু, কষা ও তিক্ত তেমনি পদপ্রান্তে ছয়টি নায়িকা- আহ্লাদি, আসমানি, বাতাসি, মুক্তা, বন, জ্যোৎস্না ও মৈত্রেয়ী- ক্ষণকালের বিশ্রাম নিতে চেয়ে নায়ক আবার সম্মুখের টানে এগিয়ে চলেছে। সমস্ত প্রাপ্তিই তৃপ্তিহীন, সমস্ত তৃপ্তিই প্রাপ্তিহীন।[১]

বেদে উপন্যাসের নায়কের নাম কাঞ্চন, ওরফে কাঁচা ওরফে পঁচা; যেন স্রোতের শেওলা সে। জীবনে কোনো লক্ষ্য নেই তার। ভবঘুরে যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত সে। ছয়টি নায়িকার প্রতি তার প্রেম, তার মিথুন প্রবৃত্তি; নারী সম্পর্কে তার যৌনচেতনা সম্পূর্ণ অবন্ধনহীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক মাত্র। এই বোহেমীয় মনোভাব হলো যৌন চেতনার উল্লাস, কোনো প্রচলিত প্রেমের রীতি তার আদর্শ নয়, যখন যা চায় এমন; মন যখন চায় না পেছনে ফিরে তাকাবার তার ইচ্ছাটি আর নেই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *বেদে* উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন :

> জীবনের কুৎসিত, বীভৎস, দারিদ্র্যপিষ্ট, বিদ্রোহ-ক্ষুব্ধ, পাপ-পিচ্ছিল দিকের প্রতি একটা অস্বাস্থ্যকর প্রবণতা দেখাইয়াছেন।...আবার এই কুৎসিত আবেষ্টনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যসঞ্চার, বীভৎসতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে

---

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *বেদে*, প্রথম প্রকাশ : ১৯২৮, পৃ. ২৯

সুষমায় গোপন প্রবাহ – ইহাও এই প্রকার বিষয় নির্বাচনের পক্ষে একটা প্রবল আকর্ষণ। বেদে উপন্যাসে *বাতাসী* অধ্যায় এইরূপ কাব্য সুষমামণ্ডিত।[১]

বেদে প্রকাশিত হবার পর রক্ষণশীল সমাজ বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রবল আপত্তি তোলেন। উপন্যাসের নায়ক প্রভাত কলকাতার কোনো একটা অফিসের কেরানি। মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ বেদনা ও অভাব-অভিযোগ, দারিদ্র্য– তার জীবনের নিত্যসঙ্গী। আর নায়িকা অশ্রু সেও এক নিঃসীম বেদনার জীবন নিয়ে জলপাইগুঁড়ির কোনো একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর জীবন বেছে নিয়েছে। দু'জনের জীবনের সেতু হলো জ্বালাময় দুঃখের অনুভূতি আর তাকে জয় করার জন্যে তাদের হৃদয়ের প্রেম। তারা বিয়ে করেনি, বিয়ে হয়তো তাদের জীবনে সম্ভব নয়; কিন্তু তাদের দেহের ক্ষুধা ও মনের বৃহত্তর যৌন উপলব্ধিজাত প্রেম তাদের জীবনকে বড় করেছে। যা বিবাহের ফলে হয়তো প্রতিদিনের প্রেম ঘষামাজায় ম্লান মলিন হয়ে যেত, নিষ্প্রভ হয়ে যেত।

অচিন্ত্যকুমারের মিথুন প্রবৃত্তির উত্তরণ ঘটেছে *আকস্মিক* (১৩৩৬) উপন্যাসে। অচিন্ত্যকুমার এখানে অনেকাংশে অশ্লীলতার গণ্ডি অতিক্রম করেছেন। তাঁর চরিত্র পরিকল্পনা, ঘটনা সন্নিবেশ ও জীবনের সমালোচনা সর্বত্রই আকস্মিকতার অতি-প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। *ঊর্ণনাভ* (১৯৩৩), *প্রচ্ছদপট* (১৯৩৪), *কাক জ্যোৎস্না* (১৩৩৮) প্রভৃতি উপন্যাসে যে জীবনধর্মী কাব্যময়তা জেগে উঠেছে তা 'ঊর্ণনাভে'র নায়ক সুশান্তের জীবনানুভূতির মতো। তাঁর *জননী জন্মভূমিশ্চ* (১৩৩৯) উপন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের সঙ্গে নতুন চেতনার সংঘর্ষের চিত্র সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কল্লোল চেতনার মনস্তত্ত্ব প্রেম ও যৌন জিজ্ঞাসা, দারিদ্র্য ও জীবনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ, যা এক সময় রবীন্দ্রনাথকে চ্যালেঞ্জ করার মতো শোনা গিয়েছিল, সেই অচিন্ত্যকুমার 'পরম পুরুষে' রূপান্তরিত হয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) 'কল্লোল গোষ্ঠী'র অন্যতম লেখক। সাধারণ মানুষের প্রতি অনুরাগই তাঁর সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। নাগরিক জীবনের পঙ্কিল বিকৃত কুৎসিত রূপের পাশাপাশি তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের নৈতিক সংকটের ভয়াবহতার চিত্র তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের *পাঁক* (১৯২৬) উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে মুচি সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠীর জীবনাচার নিয়ে। এ উপন্যাসে অবহেলিত নারী জীবনের উন্মোচনে লেখক বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। *উপনয়ন* (১৯৩৩) উপন্যাসে

---

১. শ্রী শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৪৬৬-৪৬৭

জীবনের বাস্তব চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশ চিত্রিত হয়েছে। *মিছিল* (১৯৩৩) উপন্যাসে জাতীয় আন্দোলন – বিশেষ করে অসহযোগ আন্দোলন – মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত আন্দোলন ও মতাদর্শকে প্রতিফলিত করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি, পটভূমি-রচনা সবের মধ্যেই রয়েছে আধুনিক যুগের ছোঁয়া, পাশ্চাত্যের প্রভাব সেখানে বেশি।

ত্রিশোত্তর বাংলা সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি তাঁর সাহিত্যে দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় এ কথা আরো স্পষ্ট করেছেন এভাবে – 'অনুকূল ছিলো না সময়টা – কারো পক্ষেই নয়, সদ্য যারা উপার্জনে সচেষ্ট তাদের পক্ষে রীতিমত বৈরী। জগৎ জুড়ে ব্যবসা-মন্দা চলছে, ভারতবর্ষে গান্ধীজীর উপবাস, ঢাকা চাটগাঁর সন্ত্রাসবাদ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো। আর অবশ্য বিবর্ণমান বেকারবাহিনী, বেসরকারি আপিশগুলোতে ছাটাই – বাঙালীর বিপুল বাঞ্ছিত সরকারি কর্মেও কুঞ্চিত হলো মাসান্তিক বেতন, যেন বৃটিশ দম্ভের শৈথিল্য প্রাপ্তির ইঙ্গিত জানিয়ে।'[১]

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে আমিত্ব, আত্মতা ও নিঃসঙ্গতা। পরিবার-সমাজ ও স্বজনের সঙ্গে বিশেষ যোগসূত্র না থাকায় প্রতিকূল পরিবেশ এবং বিরূপ ঘটনাধারা তাঁকে ক্রমশ আত্মসমাহিত, নিভৃতচারী, অন্তর্মুখী, সীমাহীন একাকীত্ববোধ ও নিঃসঙ্গচেতনায় আবিষ্ট করে তুলেছিল। এ কারণে অনেকে মনে করেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসে সমষ্টিচেতনা তথা বৃহত্তর সমাজচেতনা উপেক্ষিত হয়েছে। আবার অনেকে মনে করেন, প্রতিকূল সমাজ প্রতিবেশ ও বিনাশী যুগচৈতন্য তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল। ফলে তাঁর রচনায় যে জীবনবাদ প্রতিষ্ঠা পেল, তা মূলত পলায়নপ্রবণ, বিচ্ছিন্নতাপীড়িত ও নৈঃসঙ্গ্যশাসিত। বিবর্ধমান পুঁজিবাদী সঙ্কটকে উপেক্ষা করে উনিশ শতকী ইয়োরোপীয় সাহিত্য যেমন আশ্রয় করেছিল অন্তর্চেতনার পলল মৃত্তিকায়; তেমনি কলোনিশাসন ও যুগ সঙ্কটকে ভুলে থেকে বুদ্ধদেবও সমাহিত হলেন ব্যক্তিভুবনে, আশ্রয় নিলেন ফেলে আসা রোমান্টিক স্বপ্নলোকে জীবনের বিকল্প ভেবে শিল্পকেই করলেন অঙ্গীকার।[২]

---

১. বুদ্ধদেব বসু, *আমার যৌবন*, এম. সি সরকার এন্ড সন্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৩, পৃ. ৮২

২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস : নৈঃসঙ্গচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭, পৃ. ১০৭

দাম্পত্য সংকট ও বিবাহোত্তর প্রেম বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। প্রেমের সঙ্গে জীবনকে তিনি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সংযুক্ত করেছেন। তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসে প্রেমই মৌল চেতনার পরিচায়ক হয়ে উঠেছিল। *সাড়া* (১৯৩০), *ধূসর গোধূলি* (১৯৩৩), *বাসর ঘর* (১৯৩৫) প্রভৃতি উপন্যাসে বুদ্ধদেবের কবিত্বশক্তির পরিচয় যেমন অস্পষ্ট থাকেনি, তেমনি প্রেমচেতনাও হয়ে উঠেছে স্পষ্টতর।

বুদ্ধদেবের কবিসত্তারই ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রধান বা কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র অথবা নায়ক চরিত্রটি তারই প্রতিভূ পরিচয়ে সমৃদ্ধ এক সৃষ্টি। লেখক নিজস্ব চরিত্রবৈশিষ্ট্যের আভাসই সূচিত করেছেন এই সব চরিত্র। প্রায়শই তারা কবি-শিল্পী অথবা অধ্যাপক। সে কারণে তাঁর উপন্যাসে বিষয়-বৈচিত্র্য বিধৃত থাকলেও নায়ক চরিত্রের প্রকাশ প্রায়শই বৃত্তাবদ্ধ এক জীবনেরই বৈশিষ্ট্য বহন করে। 'বুদ্ধদেবের নানা উপন্যাস গল্পে ছড়ানো এই যে অসংখ্য নায়ক-চরিত্র এদের মধ্যে বৈচিত্র্য বা স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে না। বস্তুত তার সব নায়ক চরিত্রই একটি মাত্র মুখের ছাঁচে গড়ে তোলা। সে মুখ স্বয়ং লেখকের। তাঁর রচনার বিভিন্ন নায়ক যত কথা বলেছে, তাদের প্রায় সকলের কথার মধ্য দিয়ে একজনের কণ্ঠস্বরই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে কণ্ঠস্বর বলাবাহুল্য বুদ্ধদেব বসুর।'[১]

আধুনিক নগরজীবনের বহুমাত্রিক বিকৃতি ও বিচ্যুতি এবং পুঁজিবাদী সভ্যতার শ্রমশোষণ পদ্ধতি বুদ্ধদেব বসুর *যবনিকা পতন* (১৯৩১) উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। 'বুদ্ধদেব বসুর *যবনিকা পতন* উপন্যাসে পুঁজিবাদী শ্রমনীতির অভ্যন্তর শোষণে বিপর্যস্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা-নৈঃসঙ্গ্য ও হার্দ্য-যন্ত্রণার চিত্র পাওয়া যায়, পাওয়া যায় ধনবাদী সমাজের অন্যতম অন্তর্লক্ষ্মণ যৌন-ব্যভিচারের কলুষ-পঙ্কিল ছবি।'[২] বুদ্ধদেব বসুর *অসূর্যম্পশ্যা* উপন্যাসে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অনিবার্য চাপে নিষ্পেষিত ব্যক্তি হৃদয়ের নৈঃসঙ্গ্য ও সত্তাশূন্যতার অন্তহীন যন্ত্রণার ছবি চিত্রিত হয়েছে। এই সমাজের নারীর সীমাহীন অসহায়ত্ব ও শূন্যতা এ উপন্যাসের সরমা চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। *অসূর্যম্পশ্যা*র সরমা পারিবারিক ও সামাজিক ব্যভিচার-অবিচারের নির্মম শিকার। দরিদ্রতা তার মা ভানুমতী সেন তথা তার পরিবারকে রুচিহীনতা ও অনৈতিকতার অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে। স্বামী ব্যারিষ্টার অক্ষয় সেনের মৃত্যুর পর ভানুমতী জীবনধারণ আর মিথ্যা আভিজাত্য প্রদর্শনের আর্থ-উৎস হিসেবে তার নিজকন্যা সরমার উদ্ভিন্ন যৌবনকে বেছে নেয়।

---

১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস : নৈঃসঙ্গচেতনার রূপায়ণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

বুদ্ধদেব বসুর *তিথিডোর* উপন্যাসে স্বাতীর প্রেম আখ্যানের অন্তরালে চল্লিশের দশকের বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনের নানামাত্রিক চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে একদিকে মধ্যবিত্ত সমাজের ভাঙন, অন্যদিকে চোরাকারবারি, কালোবাজারির সাহায্যে নব্য ধনিক শ্রেণির উত্থানের ফলে মানুষের সব প্রত্যয় যুগস্রোতে ভেসে গিয়েছিল। এই নষ্ট সময়ের ছোঁয়া *তিথিডোরের* মানুষদের গায়েও লাগে। বিপন্ন হয় তারা সময়ের বিনষ্টিতে। 'মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মসন্ধ্যান এবং তার বিশ্লেষণ রয়েছে বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন উপন্যাসে। এরমধ্যে বৃহৎ তিথিডোরে উঠে এসেছে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিবর্তনমুখী ঘটনাবলী। রাজন বাবুর সংসারে পাঁচ পাঁচটি সুন্দর মেয়ে এবং একমাত্র পুত্র বিজনের বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণির নতুন চেহারা ফুটে উঠেছে তেমনি নিঃসঙ্গতার অন্তঃবিক্ষেপ জেগে উঠেছে রাজেন বাবু, স্বাতী ও সত্যেন চরিত্রের ব্যাপ্তি ও বিকাশের মধ্য দিয়ে। স্বাতী আর সত্যেনের প্রেম এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য।'[১] *বাসরঘর* উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে বিংশ শতাব্দীর নবযুগের ভাবনাকে লক্ষ করা যায়। শাশ্বত রীতি-নীতি, ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রতি যাদের অনাস্থা – তাদেরই বৃত্তান্ত রয়েছে এ উপন্যাসে। ত্রিশোত্তর কথা সাহিত্যের এ এক বিশিষ্ট লক্ষণ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) 'কল্লোলের কুলবর্ধন' বলে সুপরিচিত। 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও ত্রিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে 'কল্লোল' চেতনার এক সমৃদ্ধ ফসল রূপেই তিনি সমৃদ্ধি লাভ করেছেন ও বিশিষ্ট হয়েছেন। মূলত বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের মধ্যবিত্ত পরিবারের যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবকাঠামোর মধ্যে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন, সেই পারিবারিক ও সামাজিক বিন্যাস এবং সেই সঙ্গে আমৃত্যু সঙ্গী মাথার অসুখের প্রচণ্ড যন্ত্রণা তাঁর মানসগঠনে ও শিল্পসৃষ্টির প্রাণরস আহরণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। মূলত 'বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে যে অস্থিরতা, অমঙ্গল আশঙ্কা ও বৈশ্য মনোভাব প্রবল বেগে সমাজ ও ব্যক্তি মানসকে পীড়িত করে তুলেছিল, তা অবশ্যই তাঁর সচেতন শিল্পীমনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কালের এই আন্তরিক বেদনার, মধ্যবিত্ত মানসের সংক্ষুব্ধ হৃদয়াবেগের যথার্থ রূপকাররূপে তাই অভিনন্দিত, প্রশংসিত তাঁর সাহিত্য প্রয়াস।'[২]

---

১. মাহমুদ কামাল, *দ্বিতীয় পাঠের তিথিডোর*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, *উত্তরাধিকার*, বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ, ৩৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ২৭৭

২. মুহম্মদ রেজাউল হক, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

মানিকের রচনাসমূহ জীবন থেকে সংগৃহীত তথ্য ও অভিজ্ঞতার সমারোহ। তাঁর বাস্তব চেতনার সঙ্গে সেগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। জীবনকে তিনি ঔপন্যাসিক সততায় আবিষ্কার করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর প্রয়োজনীয় ভূমিকা। আর সেই ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের বৃহত্তর মধ্যবিত্ত ও সাধারণ জনজীবন থেকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম এক গভীর মানবিক বোধে অভিষিক্ত। একজন সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি জীবনকে দেখেছেন; আর কথাসাহিত্যকে তিনি সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছেন সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে। তাই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রকৃত অর্থেই সমাজবাস্তবতার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম পথিকৃৎ। প্রাসঙ্গিক একটি উদ্ধৃতি স্মরণীয় :

> বিশ্বব্যাপী সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য সংস্কৃতি যে অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত হবে, জীবনের সামগ্রিক প্রতিফলন যে সাহিত্যেও ঘটবে, এ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা খুবই স্পষ্ট ছিল। উপলব্ধির এই স্বাতন্ত্র্য ও তীক্ষ্ণতাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টিকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকসত্তার সামগ্রিক রূপের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার ভিত্তিভূমি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা মূলত ত্রিশোত্তরকাল পর্বেই। এ সময়ে তিনি *জননী* (১৯৩৫), *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫), *পুতুল নাচের ইতিকথা* (১৯৩৬), *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে বাংলা উপন্যাস ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন এবং স্থায়ী আসন লাভে সক্ষম হন। বস্তুত, মানিকের এ সময়-কালের উপন্যাসে রোমান্সধর্মিতা, রহস্যময়তা ও জীবন-অভিজ্ঞতার যে প্রকাশ ঘটেছে তা ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ-কেন্দ্রিক ও মার্কসীয় দর্শনজাত মনোভঙ্গির দ্বারা উদ্বুদ্ধ। ফলে, আজন্ম মনে-প্রাণে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনায় বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসীয় দর্শনে তাঁর সাহিত্যিক মানসকে পরিশীলিত করে বাংলা উপন্যাসের ধারায় স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে পাওয়া যায় পদ্মা তীরবর্তী মানুষের জীবন সংগ্রামের ইতিহাসের পাশাপাশি সেখানকার সমাজবাস্তবতার নিখুঁত চিত্র। তাঁর পূর্বে সাধারণ মানবজীবন বাংলা সাহিত্যে উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠলেও বাস্তবনিষ্ঠা নিয়ে তা রূপায়িত হয়ে ওঠেনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। সে কারণেই তাঁর রচনার ব্যতিক্রমধর্মী পরিচয় তাঁকে কল্লোলপন্থী করেনি। বরং একজন স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখক হিসেবে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

---

১. শাহিদা আখতার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

একজন প্রগতিশীল চিন্তাধারার সর্বাধুনিক শিল্পী হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের জগতে নতুনতর আবহ রচনার সুযোগও সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। তিনি সমস্যাপীড়িত মধ্যবিত্ত ও সাধারণ জীবনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে নতুন মানব-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপেও ছিলেন আন্তরিক। বস্তুত, মার্কসবাদে দীক্ষিত ঔপন্যাসিক মানবসম্পর্কের টানাপোড়েন ও অন্যান্য পরিচয়ের ক্ষেত্রে এই মতবাদকে আশ্রয় করে অসম্পূর্ণতার পথ থেকে সম্পূর্ণতার পথে প্রতিষ্ঠিত করে সমকালে একজন দায়বদ্ধ লেখক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে একজন আধুনিক বাস্তববাদী লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান সর্বজনস্বীকৃত। সমাজজীবনে বিদ্যমান বাস্তব অনুষঙ্গই হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যকর্মের বিষয়। নিম্নবিত্তের সংকট, মধ্যবিত্তের অবক্ষয়, পুঁজিবাদের দাপট, বুর্জোয়া রাজনীতির বিধ্বংসী রূপ তিনি সচেতনভাবেই উপস্থাপন করেছেন। সমকাল-পরিসরে প্রচলিত নরনারীর প্রেমবিরহ কিংবা রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস নয়, বরং মানবজীবনের বহুমাত্রিক জীবনসত্যকেই তিনি করে তুলেছেন তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়। সাহিত্য রচনার শুরুতেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, সাহিত্যজগতে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। জনৈক মাধববাবুকে লেখা একটি পত্রে তিনি বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এভাবে :

> অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি.এস.সি পড়বার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি– বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করছিলাম যে, সাহিত্য জগতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। এরকম সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অন্যকাজে সময় নষ্ট করা যায় না। তখন কল্লোল যুগের সমারোহ, কিন্তু আমি টের পেয়েছিলাম সাহিত্যে যে মোড় ঘুরছে 'কল্লোলী সাহিত্য' তার লক্ষণমাত্র, আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে – সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকালে 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল লেখক 'রবীন্দ্রবলয়' থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারার সৃষ্টি করেন। এই তরুণ লেখকগোষ্ঠী প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের ফরাসি ও রুশ সাহিত্যের আবহে অনুপ্রাণিত হয়ে নবতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার, সাহিত্যশিল্পে নিরীক্ষাধর্মী পরিচর্যা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত বৈচিত্র্যময় ঘটনাপ্রবাহ এ সময়ে শিল্পিচৈতন্যের অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। মূল্যবোধের ক্রমাগত বিপর্যয়, প্রচলিত ধ্যানধারণায় অনাস্থা পট-পরিবেশকে করে তুলেছিল বিপন্ন। কেবল শাহরিক জীবন-পরিবেশেই নয়, এ সময়ে

---

১. যুগান্তর চক্রবর্তী (সম্পা.), *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র*, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, মে ২০১১, পৃ. ২৮৩

গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাও হয়ে উঠেছিল সংকটাপন্ন; আবহমান-প্রচলিত বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার প্রতি যুবসমাজের অনাস্থা প্রকট হয়ে উঠছিল। পরিবর্তিত এই জীবনধারাকে এই পর্যায়ের তরুণ লেখকগোষ্ঠী অঙ্গীকার করলেন। জীবনের আকাঁড়া বাস্তবতাকে তাঁরা কথাসাহিত্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করেন। 'জীবনের নানান ক্ষেত্র থেকে সৃষ্টির জন্য নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এঁরা। সেই বহুল উপকরণ দিয়ে নানাধরনের কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ গড়ে উঠেছে। যার পরিচয় এর আগে বাঙলা কথাসাহিত্যে আর এমন স্পষ্ট করে এত পাওয়া যায়নি। সুগভীর দেহোত্তীর্ণ প্রেমচেতনার সঙ্গে বিক্ষুব্ধ দেহকামনার জটিল নিগূঢ় সম্পর্ককে অবচেতনার মাধ্যমে নতুন তাৎপর্যদান, নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের সংশয়-সংগ্রাম ও সংকটের জটিল রূপবিন্যাস, ...নরনারীর প্রেম-কামনা ও আনন্দ-বেদনার অপরূপ রূপকথা কিংবা সমাজের একেবারে নীচুতলার 'অবজ্ঞাত অপজাত' মানুষের আদিম প্রাণ-পিপাসা ও প্রবৃত্তির অনাবৃত রূপ– এমনি নানাদিক থেকে এই শতকের তৃতীয় দশকে শুরু হ'ল প্রচলিত বহতা ধারায় একটা বড়রকম আলোড়ন সৃষ্টির প্রয়াস, বহমান গতিকে ভিন্নমুখী করার উদ্যম।[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভিন্নমুখী উদ্যম ও উদ্যোগেরই সহযাত্রী ছিলেন। 'উনিশ শতকের ইউরোপে গড়ে-ওঠা যথাস্থিতবাদী ও বাস্তববাদী শিল্প-আন্দোলন' সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সতত সচেতন। তদুপরি সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট-বিপর্যয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), রুশবিপ্লব (১৯১৭), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১) প্রভৃতি দৈশিক ও আন্তর্দেশিক ঘটনাবলি তাঁর সাহিত্যমানসে যে প্রভাব ফেলেছে, তার অনিবার্য প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কথাসাহিত্যে। 'কিশোর বয়স থেকেই দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সহানুভূতি, বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতি ঘৃণা, নিজ পারিবারিক বলয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মধ্যবিত্তের অন্তর্গত ক্লেদ ও অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে বিদ্বেষ, ব্যাধিগ্রস্ত মনে সার্বক্ষণিক মৃত্যুচিন্তা ও জীবনের অনিশ্চয়তাবোধ, যুদ্ধবিষয়ক চাকরি ও যুদ্ধবিরোধী প্রচারে অংশগ্রহণ, সংবেদনশীল শিল্পিহৃদয়ে যুদ্ধের দুঃসহ অনুভব, দুর্ভিক্ষের অনাচার ও নির্মম মনুষ্যত্বহীনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়[২] – এসবের প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় নির্মিত হয়েছে তাঁর শিল্পিমানস; এবং এসবেরই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাবে নির্মিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস।

---

১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৪৩

২. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ১৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যধারার নিবিড় পাঠক। তিনি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব ও কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে বাংলা উপন্যাসে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি স্বতন্ত্র প্রতিভায় নিজ দেশকালের প্রেক্ষাপটে বিরাজিত সমস্যা ও সংকটকে তাঁর রচনায় সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। কল্লোল যুগের সাহিত্যিক বাস্তবতা তাঁর হাত ধরেই সত্যস্বরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি ছিলেন "কল্লোলের'ই কুলবর্ধন।"[১]

১৯২৮ সালে, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র থাকাকালে, 'অতসী মামী' গল্পের মাধ্যম মানিক্যের যে সাহিত্যযাত্রা সূচিত হয়েছিল তা আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার ক্রমাগত অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে আরও সচল ও বেগবান। আটাশ বছরের দীর্ঘ সাহিত্যযাত্রায় সমাজ ও সমাজ-অন্তর্গত মানুষকে শিল্পের অন্তর্গত করে তিনি বাংলা সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন স্বতন্ত্র স্বাদ ও ব্যঞ্জনা। গ্রাম, শহর কিংবা শহরতলির বাস্তবজীবনঘনিষ্ঠ মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সমাচার নিয়ে তিনি যেসব উপন্যাস রচনা করেছেন সেগুলো শিল্পমানে ও পরিমাণে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বস্তুত, কমবেশি আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা অবলম্বনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব উপন্যাস রচনা করেছেন, সেগুলো হচ্ছে – *জননী* (১৯৩৫), *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫), *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬), *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬), *অমৃতস্য পুত্রাঃ* (১৯৩৮), *অহিংসা* (১৯৪১), *ধরাবাঁধা জীবন* (১৯৪১), *চতুষ্কোণ* (১৯৪২), *শহরবাসের ইতিকথা* (১৯৪৬), *চিন্তামণি* (১৯৪৬), *খুনী* (১৯৪৩-১৯৪৫)), *আদায়ের ইতিহাস* (১৯৪৭), *পেশা* (১৯৫১), *ছন্দপতন* (১৯৫১), *পাশাপাশি* (১৯৫২), *নাগপাশ* (১৯৫৩) *চালচলন* (১৯৫৩), *তেইশ বছর আগে পরে* (১৯৫৩), *শুভাশুভ* (১৯৫৪), *পরাধীন প্রেম* (১৯৫৫), *মাশুল* (১৯৫৬), *প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান* (১৯৫৬), *মাটি-ঘেঁষা মানুষ* (১৯৫৭), *শান্তিলতা* (১৯৬০), প্রভৃতি।

জননী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস *জননী* (১৯৩৫)।[২] এ উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে কলকাতার শহরতলীর একটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারকে নিয়ে। উপন্যাসের নামকরণ থেকে

১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৫

২. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, যদিও রচনাকালের হিসেবে দ্বিতীয়। যে-উপন্যাসটি তিনি সর্বপ্রথম রচনা করেছিলেন – 'দিবারাত্রির কাব্য', গ্রন্থাকারে সেটি বেরোয় পরে।

অনুমেয় যে, এর কাহিনি সম্পূর্ণতা পেয়েছে এক জননীকে কেন্দ্র করে, যার নাম শ্যামা; উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার স্বামী শীতল নেশাগ্রস্ত, ছিটগ্রস্ত, বেহিসেবি এবং অনৈতিক জীবনচর্যায় অভ্যস্ত। অর্থ আত্মসাতের অপরাধে তার আঠারো মাসের কারাদণ্ড হয়। এরপর শ্যামার জীবনে নেমে আসে কঠিন দুর্যোগ। সংসারের অভাব-অনটনে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। একারণে সে নিজ বাড়ি ভাড়া দিয়ে আশ্রয় নেয় বনগাঁয়ে ননদ মন্দাকিনীর বাড়িতে। মন্দাকিনী ও তার স্বামী রাখালসহ পরিবারের সকলের আন্তরিক আতিথেয়তায় সে এ-বাড়িতে প্রায় পাঁচ বছর অবস্থান করে। একপর্যায়ে সে বাড়ি বিক্রি করে দেয়। শীতলও জেলজীবন থেকে ফিরে আসে। পরিবর্তিত জীবনে শ্যামার ছেলে বিধান কলকাতায় পড়তে যায়, এবং ব্যাংকে চাকরি নেয়; মেয়ে বকুলের কৃষ্ণনগরে বিয়ে হয়। অতঃপর বনগাঁয়ের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে শ্যামা কলকাতায় বিধানের বাসায় আশ্রয় নেয়। শীতল মারা যায়, বিধান বিয়ে করে, এবং বিধান-সুবর্ণের সন্তান লাভের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। উপন্যাসে জননী শ্যামার জীবনযন্ত্রণা, দাহ ও দ্রোহের স্বরূপ অসামান্য ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়েছে। 'শ্যামা এমন এক জননী, ভাবপ্রবণতার বিলাসে ভাসবার মতো যার না ছিল উপায়, না রুচি। দায়িত্বজ্ঞানহীন নেশাখোর স্বামী থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় লোকের অনাদর ও পীড়ন থেকে সন্তানদের রক্ষা করার লড়াই করার কৌশলটি আয়ত্ত করতেই তার জননীত্ব – জননীর এই ভূমিকার মধ্যেই ছিল মানিকের লেখকজীবনের পরিণতির বীজ, তাই মানিকসাহিত্য মূল্যায়নে এই উপন্যাসটি অধ্যয়ন অপরিহার্য।[১] নির্ণয় প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন –

জননী উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামাকে বাস্তবধর্মী চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেছেন। সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র হিসেবে চরিত্রটি বিশেষত্বমণ্ডিত। শ্যামা পরিশ্রমী, হিসেবি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলে কেউ নেই। মাতৃগর্ভে থাকাকালে সে পিতাকে হারায়, মাকে হারায় এগারো বছর বয়সে। যে মামাকে আশ্রয় করে সে বাঁচতে চেয়েছে সেও সম্পত্তি বিক্রয় করে এক

'জননী' রচনার ও প্রকাশের ইতিহাস জানার জন্য লেখকের বয়ঃকনিষ্ঠ এক লেখক এবং গুরুজনস্থানীয় এক সম্পাদকের স্মৃতিচারণ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমজন ভবানী মুখোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন : "মানিকের 'জননী' উপন্যাসখানি একটি ফুলস্কেপ সাইজের বিরাট খাতায় লেখা ছিল। ছোট অক্ষরে লেখা সেই উপন্যাসটি হাতে করে তাকে অনেক ঘুরতে হয়েছে। জেনারেল প্রিন্টার্সের সুরেশবাবু 'জননী' ছাপবার আগে আর্য পাবলিশিং-এরশশাঙ্ক চৌধুরীর কাছে অনেকদিন রাখা ছিল।" দ্বিতীয় জন সজনীকান্ত দাস,...'শনিবারের চিঠির সম্পাদক। তিনি জানিয়েছেন: "মানিকের প্রথম গ্রন্থের প্রকাশ সম্বন্ধে যাবতীয় সংকলন-গ্রন্থে ও সাময়িকপত্রে ভুল লেখা হইয়াছে। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে নয়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ 'জননী' ছাপিয়া মানিক সর্বপ্রথম গ্রন্থকার-শ্রেণীভুক্ত হন।" (দ্রষ্টব্য : হায়াত মামুদ সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ৭৪৩)

১. সত্যপ্রিয় ঘোষ,'প্রাক-কমিউনিস্ট পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', অনিল আচার্য (সম্পা.) *অনুষ্টুপ*, কলকাতা, বিংশতি বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৬-১৩৭

বিধবাকে নিয়ে সংসারক্ষেত্র থেকে উধাও হয়ে গেছে। স্বামীগৃহেও এসেও সে সুখী হয়নি। স্বামী শীতলের কাছ থেকে সে বরাবরই পেয়েছে অবহেলা, অপমান, অত্যাচার। শ্যামার সুখ-দুঃখকে সে কখনোই আমলে্ নেয়নি। বিবাহিত জীবনের সাত বছর সন্তান জন্মদানে ব্যর্থতার কারণে সংসারক্ষেত্রে তার অবস্থা হয়ে উঠেছিল উন্মুল ও অসহায়। সাত বছরের ব্যবধানে প্রথম সন্তান জন্মদানের মধ্য দিয়ে সে আনন্দময় জীবনের আস্বাদ পায়। তার এ-সময়কার উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে এভাবে :

> কাত হইয়া শুইয়া পাশে শায়িত শিশুর মুখের দিকে এক মিনিট চাহিয়া থাকিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল ভিতরে একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া ঘটিয়া চলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মুখখানা তাহার অভিনব হইয়া উঠিতেছে। কতটুকু মুখ, কী পেলবতা মুখের! মাথা ও ভুরুতে চুলের শুধু আভাস আছে। বেদানার জমানো রসের মতো তুলতুলে আশ্চর্য দু'টি ঠোঁট ও গাল ছুইয়াছিল। বুকের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। এই বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ প্রাণ স্পন্দন কোথা হইতে আসিল? শ্যামা কাপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল রোমান্স। স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রসবের পর নাড়ি সংযোগ বিচ্ছিন্ন সন্তানের জন্য এ কী কাণ্ড ঘটিতে থাকে মানুষের মধ্যে? আশ্বিনের প্রভাত ছিল উজ্জ্বল। দু'দিন দু'রাত্রির মরণাধিক যন্ত্রণা শ্যামা দুঃস্বপ্নের মতো ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সকালে তাহার আনন্দের সীমা নাই।[১]

অসীম আগ্রহ ও অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে শ্যামা সন্তান লালন-পালন শুরু করে। অব্যাহত আদর যত্নের পরও বারো দিনের মাথায় তার প্রথম সন্তানের মৃত্যু হয়। তার বিশ্বাস, সন্তান পালনে অদক্ষতা কিংবা দেবতার অসন্তুষ্টিই তার সন্তানমৃত্যুর কারণ। অবশ্য প্রথম সন্তান না বাঁচলেও তাকে কেন্দ্র করে সে রপ্ত করে নিয়েছে সন্তান পালনের কৌশল। দুবছর পর সে পুনরায় পুত্র-সন্তানের মা হয়। পুত্রের নাম বিধান। প্রথম সন্তানের অকালমৃত্যুর কথা স্মরণ করে বিধানের জন্মের পর সে কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। বিধানের পর জন্ম নেয় মেয়ে বকুল, ছেলে ফণি এবং শেষ বয়সে জন্ম নেয় একটি অন্ধ মেয়ে।

প্রথম সন্তান জন্মের পর সন্তানকে দেখে প্রতিবেশীরা যখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখনই অজানা আতঙ্কে ভয়ার্ত-শিহরিত হয়ে উঠেছে শ্যামা। প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সন্তান বাঁচাবার জন্য শ্যামা কালীঘাট ও তারকেশ্বরের পূজা মানত করেছে, নিজে 'গোটা পাঁচেক মাদুলি' ধারণ করেছে। প্রতিদিন সে মাদুলি ধোয়া জল খেয়েছে। ছেলের কপালে মাদুলি স্পর্শ করে কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত বোধ করেছে। এরপরও শিশু বিধানের জ্বর

---

১. *জননী*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৭

হলে সে দিশেহারা হয়ে উঠেছে। রানীর চোখে অঞ্জলি হলে সে এটিকে অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করেছে এবং সন্তান হারানোর আশঙ্কায় শিহরিত হয়েছে।

শীতলের সংসার বিমুখতার কারণে পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে শ্যামাকে। সে সংগ্রামকে জীবনের নিয়তি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সাধারণ এক নারী থেকে হয়ে উঠেছে অসাধারণ। স্বীয় প্রচেষ্টায় যে জগৎ সে নির্মাণ করেছে সেখানে শীতলের অবস্থান গৌণ। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় তা উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে :

> ছেলেমেয়েদের লইয়া নিজের জন্য যে জীবন শ্যামা রচনা করিয়াছে, তার মধ্যে শীতল আশ্রয়ের মত, জীবিকার উপায়ের মতো তুচ্ছ একটা প্রয়োজন মাত্র। আপনার প্রতিভায় সৃজিত সংসারে শ্যামা ডুবিয়া গিয়াছে। শীতল সেখানে ঢুকিবার রাস্তা না খুঁজিলেই সে বাঁচে।[১]

শীতল জেলে যাওয়ার পর শ্যামার টাকা আত্মসাৎ করে স্বয়ং তার মামা। এতে তার বিপদ আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। তথাপি সে জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়ে না। প্রথমে সে বাড়ির ছাদের ছোট্ট কক্ষে বসবাস শুরু করে, এবং নিচের তলা ভাড়া দিয়ে দেয়; তারপর পুরো বাড়ি ভাড়া দিয়ে সে ননদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এখানে সে অব্যাহত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন-জীবিকার সংস্থান করে; সন্তান প্রতিপালন করে। ছেলের সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবে সে অন্যের চোখ এড়িয়ে তাকে ঘি-দুধ-সন্দেশ খাওয়ায়। এভাবে মাতৃত্বের কাছে তার নৈতিকতা হার মানে। অবশেষে মন্দাকিনীর পরামর্শে সে শহরের বাড়ি বিক্রি করে দেয়। কন্যা বকুলের সঙ্গে ধনীপুত্র শঙ্করের প্রেমের সম্পর্ককে শ্যামা ভয় পায়। এমতাবস্থায় মোহিনীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত থাকার প্রয়াস পায় হয়। দাম্পত্য জীবনে বকুল সুখে আছে কিনা – তা জানতে শ্যামা বকুলের অগোচরে তাকে লেখা মোহিনীর চিঠি পড়ে।

শ্যামা শুধু নিজ সন্তান নয়, ননদ মন্দাকিনীর প্রতিও ছিল স্নেহপ্রবণ। মন্দাকিনীর স্বামী রাখাল দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে মন্দাকিনীর দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে সে বিষণ্ন হয়ে পড়ে। মন্দার জন্য তার চোখ ছলছল করে। সংসারে মেয়েদের অসহায়ত্বের বিষয়টি সে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে :

> মন্দার কোন পরিবর্তন নাই। সে তো এখনো জানে না। ছেলেদের লইয়া সে বিব্রত হইয়া রহিল। আড়চোখে তাহার সানন্দ চলাফেরা দেখিতে দেখিতে শ্যামার বড় মমতা হইতে লাগিল, সে মনে মনে বলিল, 'অ পোড়াকপালী !'...মন্দার সমস্যা শ্যামাকে বড়ো বিচলিত করিয়াছে। রাখালের প্রতি সে যেন ক্রমে ক্রমে

১. *জননী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

> বিদ্বেষবোধ করিতে আরম্ভ করে। সংসারে স্ত্রীলোকের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিজের কাছে সে অপদস্থ হইয়া যায়। যে আশ্রয় তাহাদের সবচেয়ে স্থায়ী, কত সহজে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যে লোকটির উপর সবদিক দিয়া নির্ভর করিতে হয়, কত সহজে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসে?[১]

স্বামীর সোহাগবঞ্চিত শ্যামার মনের অবদমিত ইচ্ছেগুলো একসময় তাকে বিকারগ্রস্ত করে তোলে। স্বামীর সঙ্গে রাখালের মামাতো বোন রাজবালার গোপন আলাপনে সে ফুঁসে ওঠে। নিজের যৌবনের দিনগুলো বিপর্যস্ত, বিবর্ণ ও বঞ্চনাময় হওয়ায় সে অন্যের সুখময় দাম্পত্য সম্পর্ককে ঈর্ষা করে। স্বামীসঙ্গহীন শ্যামার নারীহৃদয়ের ঈর্ষাময় অনুভূতিকে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে :

> বেড়ার ফুটা দিয়া জ্যোৎস্নার কতকগুলি রেখা ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানে শিয়ালগুলি ডাক দিয়া নীরব হইল। বেড়ার ব্যবধান পার হইয়া পাশের ঘরে রাখালের মামাতো বোন রাজবালার স্বামীর সঙ্গে ফিসফিস কথা শোনা যায়, রাজবালার স্বামী আদালতে পঁচিশ টাকার চাকরি করে। পঁচিশ টাকায় অত ফিসফিস কথা? শ্যামার স্বামী মাসে তিনশ টাকাও রোজগার করিয়াছে, নিজের বাড়িতে নিজের পাকা শয়নঘরে স্বামীর সঙ্গে অত কথা শ্যামা বলে নাই। আর ওই চাপা হাসি? শ্যামা শিহরিয়া ওঠে।[২]

জীবনে শত বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্যামা কখনো কখনো হয়ে উঠেছে অসহিষ্ণু। তবে বিধান নব্বই টাকা বেতনের চাকরি পেয়েছে জেনে সে খুশিতে বিহবল হয়। শ্যামাকে যারা এতদিন অপমান-অবহেলা করেছে তাদেরকে কটুকথা বলতেও সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। এরপর সে বকুলকে শ্বশুরালয় থেকে নিয়ে আসে, বিধানকে বিয়ে দেয় এবং দাস-দাসী নিযুক্ত করে।

বিধানের স্ত্রী সুবর্ণকে শ্যামা সহ্য করতে পারেনি। নিজের অতীত জীবনের কথা স্মরণ করে সে পুত্রবধূকেও ঈর্ষা করে। কারণে-অকারণে সংসারের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে সে সুবর্ণকে গালমন্দ করে। সুবর্ণ তার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও শ্যামার মধ্যে বিতৃষ্ণা তৈরি হয়। তবে সুবর্ণের মা হওয়ার সংবাদে শ্যামার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে – 'সুবর্ণকে শ্যামা যেন বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটি দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কোথা গেল ক্ষুদ্র বিদ্বেষ, তুচ্ছ শত্রুতা। সুবর্ণের জীবন লইয়া শ্যামা যেন বাঁচিয়া রহিল।[৩]

---

১. *জননী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
২. *জননী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯
৩. *জননী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

এ উপন্যাসে শীতল একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। শ্যামাকে বিয়ে করার পর শীতল কোনো দায়-দায়িত্ব পালন করেনি। সে মদ এবং নারীমোহে মত্ত হয়ে থেকেছে। উপন্যাসের শুরুতে শ্যামার প্রতি তার নানা নির্যাতনের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। শ্যামার সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিকেও সে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেনি। শ্যামাকে বিয়ে করার আগে শীতল আরেকটি বিয়ে করেছিল। শীতলের সংসারে এসেই শ্যামা বুঝতে পারে শীতল নেশাগ্রস্ত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বামীর নির্যাতন সহ্য করা ছাড়া শ্যামার কোনো গত্যান্তরও ছিল না। বিধানের জন্মের পর শীতলের নারী-আসক্তি কমে গেলেও শ্যামার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি। তাদের নিরুত্তাপ দাম্পত্য সম্পর্কের একটি বর্ণনা লক্ষণীয় :

> শীতলের সম্বন্ধে ভাবিবার তাহার সময় নাই। তার গোছানো সংসারে শীতল কবে কি বিপর্যয় আনে, এই তার আশঙ্কা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহাদের। সংসার শ্যামার, ছেলে মেয়ে শ্যামার – ওর মধ্যে শীতলের স্থান নাই। নিজের গৃহে নিজের সংসারের সঙ্গে শীতলের সম্পর্ক শ্যামার মধ্যস্থতায়, গৃহে শীতল শ্যামার আড়ালে পড়িয়া থাকে, স্বাধীনতাবিহীন স্বাতন্ত্র্যবিহীন জড় পদার্থের মতো। একদিন শীতল মদ খাইতো, শ্যামাকে মারিত, কিন্তু শীতল ছাড়া শ্যামার তখন কেহ ছিল না। আজ শীতলের মদ খাইতে ভালো লাগে না, শ্যামাকে মারা দূরে থাক ধমক দিতেও তাহার ভয় করে। শ্যামা আজ কত উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে। কোনো দিকে কোনো বিষয়ে খুঁত নাই শ্যামার, সেবায়–যত্নে, বুদ্ধি বিবেচনায়, ত্যাগে–কর্তব্য পালনে সে কলের মত নিখুঁত – শ্যামার সঙ্গে তুলনা করিয়া সব সময় শীতলের যেন নিজেকে ছোটলোক বলিয়া মনে হয়, এবং সে যে অপদার্থ ছিটগ্রস্ত মানুষ, এ তো জানে সকলেই, অন্তত শ্যামা জানে শীতলের তাহাতে সন্দেহ নাই।[১]

স্ত্রীকে গুরুত্ব না দিলেও মেয়ে বকুলের প্রতি শীতলের স্নেহ অন্তহীন। বকুলও পিতাকে ভালোবাসে। কর্মস্থল থেকে টাকা আত্মসাতের পর শীতলের জেল হয়। এ অবস্থায় একমাত্র বকুলই তার জন্য কাঁদে। জেল থেকে মুক্ত হয়ে শীতল পাল্টে যায়। তার শারীরিক দুরবস্থা শ্যামাকে বিপর্যস্ত করে। সে দেখে শীতলের চোখমুখ ফুলে বীভৎস আকার ধারণ করেছে। শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। প্রাসঙ্গিক বর্ণনা এরকম :

> শীতল দাঁড়াইয়া থাকে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কাঁপে, তারপর সহসা শ্যামার কি হয় কে জানে, ফণীকে জোর করিয়া নামাইয়া দিয়া জননীর মত ব্যাকুল আবেগে শীতলকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া আনে, শিশুর

---

১. *জননী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

মত আলগোছে শোয়াইয়া দেয় মাদুরে, বলে, 'এমন করে ভুগছ, আমাকে একটা খবরও তুমি দিলে না গো।'[১]

মন্দাকিনী এ উপন্যাসের একটি ভিন্ন মনস্তত্ত্বের চরিত্র। মন্দাকিনীর মধ্যেও মাতৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার তীব্র বাসনা লক্ষণীয়। শাশুড়ির আধিপত্যের কারণে সন্তানদের স্নেহ করার অধিকারও তার নেই। তাই রাখালের পরামর্শে মন্দাকিনী সন্তানদের নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে ওঠে। শাশুড়ির প্রভাববলয় থেকে সে সন্তানদের বের করে আনে। রাখাল অল্প বেতনের চাকরি করলেও নানা কৌশলে অর্থবিত্তের মালিক হয়। একারণে সে দ্বিতীয় বিয়েতে উৎসাহী হয়। মন্দাকিনী সতীনের চেয়ে শাশুড়ির ভয়ে তটস্থ থাকে। অপরদিকে রাখালের দ্বিতীয় স্ত্রী সুপ্রভা কর্তৃত্বের চেয়ে ভালোবাসাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছে। এ কারণে মন্দাকিনীর সঙ্গে সে সমঝোতা করে।

এ উপন্যাসে শ্যামার জ্যেষ্ঠপুত্র বিধান। শিশুকালে পশুপাখির প্রতি ছিল তার তীব্র আকর্ষণ ও মমত্ববোধ। সে প্রতিভাবান ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন। স্কুলে যাওয়ার পথে প্রতিবেশী বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে অপমান করলে সে পরবর্তীকালে তার গাড়িতে চড়েনি। অর্থসংকটে লেখাপড়া ছেড়ে তাকে চাকরিতে যোগ দিতে হয়। মায়ের অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে সে সুবর্ণকে বিয়ে করে। আজীবন সংসারের প্রতি উদাসীন পিতার প্রতিও সে নমনীয় থেকেছে। পিতার দায়িত্বহীনতা তাকে দায়িত্ববান হতে বাধ্য করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক চিন্তাচেতনাসম্পন্ন নারীচরিত্রও এ উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। ভালোবাসাময় দাম্পত্যজীবন নির্ণয়ে তিনি তুলে ধরেছেন সুপ্রভা-রাখালের সম্পর্ক। খুব অল্প পরিসরে শহুরে পাশ করা নার্স শ্রীমতী সরযুবালা দে-র সুখী পরিবারের চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে :

কি আনন্দেই ওরা দিন কাটায়। সাজিয়া গুজিয়া ফিটফাট হইয়া থাকে, গান করে, গ্রামোফোন বাজায়, দিবারাত্রি শ্যামার কানে ভাসিয়া আসে ওদের হাসির শব্দ। মেয়ে দুটি নয়, মোটা সরযূ পর্যন্ত যেন উল্লাসের একটা হালকা হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়ায়। বাপ, মা আর মেয়েরা যেন বন্ধু। সমানভাবে তাহারা হাসি-তামাশা করে। তাস খেলে চার জনে মিশিয়া, এক সঙ্গে সিনেমা দেখিতে যায়।[২]

---

১. *জননী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

২. *জননী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

এ উপন্যাসে শুধু জননী চরিত্রই চিত্রিত হয়নি, জননীর চারপাশের বিভিন্ন চরিত্র, তাদের সাংসারিক জীবনাচার, পরিবেশ পরিস্থিতি সুনিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসে শ্যামা, মন্দাকিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া, সত্যভামা, রানী, বকুলমালা, সুপ্রভা, রাজবালা, সরযু, বিভা, শামু, সুবর্ণলতা – এই তেরোটি নারী চরিত্র রয়েছে। এছাড়া শীতল, রাখাল, হারাণ, বিধান, বিমান বিহারী, কমলবাবু, শঙ্কর, তারাশঙ্কর, কনকের স্বামী, মোহিনী, বনবিহারী – এই এগারোটি পুরুষ চরিত্র রয়েছে। এদের সংসারিক জীবনের নানা টানাপড়েন, ভাঙাগড়া প্রভৃতি নিয়েই *জননী* উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। শ্যামা-শীতলের সংসার, মন্দা, সুপ্রভা এবং রাখালের সংসার, বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসার, কনকের সংসার, বকুল ও মোহিনীর সংসার এবং সরযুর সংসারের চিত্র যেমন অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি চিত্রিত হয়েছে সংসারবিবাগী তারাশঙ্করের জীবনচিত্র। এ সূত্রে লেখক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জননী* উপন্যাসে কয়েকটি মা-চরিত্র পাওয়া যায়। শ্যামা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মন্দাকিনী, সত্যভামা, সুপ্রভা, বকুল ও সুবর্ণ – এরা প্রত্যেকেই জননীরূপে অঙ্কিত হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কোমল মাতৃহৃদয়ের পরিচয় রয়েছে। সকল শ্রেণি-বর্ণের মধ্যেই সন্তানের জন্য মায়ের হৃদয়ের হাহাকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থকভাবে প্রকটিত করেছেন। এ উপন্যাসে উচ্চশ্রেণির মা হিসেবে যেমন বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতৃত্বকে তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি সত্যভামার মাতৃত্বের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত শ্রেণির যন্ত্রণাও প্রকাশিত হয়েছে। এসব চরিত্র অঙ্কনের সূত্রে মানিকের সামাজিক বোধ সম্পর্কিত উপলব্ধির স্বচ্ছতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জননী রক্তে-মাংসে গড়া এ সমাজেরই প্রতিনিধি। জাগতিক সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান, হীনতা-নীচতার সমবায়ে নির্মিত হয়েছে জননী শ্যামা। সংকীর্ণতা ও ঔদার্যের যুগপৎ সমন্বয়ে চরিত্রটি অসাধারণ। তাই শ্যামা সন্তানের জন্য চুরি করতে দ্বিধাবোধ করে না। সন্তানের জন্য সমস্ত দুঃখ-দৈন্য সে অকুণ্ঠচিত্তে বরণ করে নেয়। আবার যখন সে বিগত জীবনের অপ্রাপ্তি, অপূর্ণতা ও বঞ্চনাকে প্রত্যক্ষ করে তখন তীব্র বিদ্বেষে তার অন্তর ছেয়ে যায়। জীবনযুদ্ধে ধ্বস্ত ও ক্লান্ত শ্যামার মনোভাবনায় তা স্পষ্ট :

> উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তাও শ্যামা করিত, নিশ্বাসও ফেলিত। জননীর জীবন কেমন যেন নীরস অর্থহীন মনে হইত শ্যামার কাছে। কোথায় ছিল এই চারিটি জীব, কি সম্পর্ক ওদের সঙ্গে তাহার, অসহায় স্ত্রীলোক সে, মেরুদণ্ড বাঁকানো এ ভার তার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে কেন? কিসের এই অন্ধ মায়া? জগজ্জননী মহামায়া কিসের ধাঁধায় ফেলিয়া তাহাকে দিয়া এত দুঃখ বরণ করাইতেছেন? সুখ কাকে বলে একদিনের জন্য সে তাহা জানিতে পারিল না, তাহার একটা প্রাণ নিংড়াইয়া চারটি প্রাণীকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে – কেন? কি লাভ তাহার? চোখ বুজিয়া সে যদি আজ কোথাও চলিয়া যাইতে পারিত! – ওরা দুঃখ পাইবে, না খাইয়া

হয়তো মরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায় তার? সে তো দেখিতে আসিবে না। পেটের সন্তানগুলির প্রতি শ্যামা যেন বিদ্বেষ অনুভব করিত – সব তাহার শত্রু, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ![১]

জননী উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শহর, শহরতলি ও গ্রাম - এই তিনটি পট-পরিবেশের বর্ণনা করেছেন। বিয়ে হয়ে শ্যামা এসেছিল শীতলের শহরতলির বাড়িতে। শহরের মতো সেটি ঘিঞ্জি এলাকা নয়। শীতল জেলে যাওয়ার পর শ্যামার সংসার ছোট হয়ে আসে। তাই পুরো বাড়িটা ভাড়া দিয়ে সে আশ্রয় নেয় বনগাঁয়ে। এখানে ছিল বিশাল বাগান, পুকুর ও প্রতিবেশী :

বড় রাস্তা ছাড়িয়া ছোট রাস্তা, পুকুর ধারে বিঘা পরিমাণ ছোট একটি মাঠ, লাল ইটের একতলা একটি বাড়ি ও কলাবাগানের বেড়ার মধ্যবর্তী দু'হাত চওড়া পথ, তারপর রাখালের পাকা ভিত, টিনের দেয়াল ও শণের ছাউনির বৈঠকখানা। তিনখানা তক্তপোষ একত্র করিয়া তার উপরে শতরঞ্চি বিছানো আছে। তিন জাতের মানুষের জন্য হুকা আছে তিনটি।...বাহিরের ঘরখানা দেখিলেই সন্দেহ হয় রাখালের অবস্থা বুঝি খারাপ নয়, অনেকটা উকিল মোক্তারের কাছারি ঘরের মত তাহার বৈঠকখানা। বৈঠকখানার বাহিরেই বহিরাঙ্গন, সেখানে দুটা বড় বড় ধানের মরাই। তারপর রাখালের বাসগৃহ, আট-দশটা ছোট বড় টিনের ঘরের সমষ্টি, অধিবাসীদের সংখ্যা বড় কম নয়।[২]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *জননী* উপন্যাসে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এখানে শীতল প্রথমে ছিল প্রেসের মালিক, পরবর্তীকালে সে প্রেস বিক্রি করে দেয় এবং অন্য প্রেসের ম্যানেজার হয়। রাখাল চাকুরে, হারান ডাক্তার, বিধান ব্যাংকার, সরযু নার্স, বিভা স্কুলশিক্ষক এবং কনকের স্বামী কেরানি। জননী উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে লেখক অভাবনীয় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'শুধু বাঙালি জীবনে নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার পটভূমিতে জননীসত্তার যে অপরিসীম গুরুত্ব ও মহিমা তিনি তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর মধ্যদিয়ে আমরা তাঁর সুগভীর জীবনবোধ ও সূক্ষ্মতর শিল্পদৃষ্টিরও পরিচয় পাই। শুধু বিষয় গৌরবের দিক থেকেই নয়, সৃষ্টিনৈপূণ্যে অর্থাৎ কাহিনি-সজ্জা, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উপন্যাসটি সার্থকতা লাভ করেছে।[৩]

---

১. জননী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

২. *জননী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৪-৬৫

৩. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ-৬৩

জননী উপন্যাসে জীবনসংগ্রামের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে মানবতাবোধের জয় হয়েছে। শ্যামার জীবনযুদ্ধের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে এ-সত্যটি অভিব্যঞ্জিত হয়েছে যে, শত বিপত্তি সত্ত্বেও নারী তার অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম। এ উপন্যাস প্রসঙ্গে সরোজমোহন মিত্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> এই উপন্যাসে কোন ভাবালুতা নেই, প্রচলিত রোমান্স নেই, আছে চিরায়ত সুখ-দুঃখময় বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক জননীর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের বাস্তব চিত্রণ। দৈনন্দিন জীবনের বিস্তৃত বর্ণনায়, বাস্তব পরিবেশ রচনায় শ্যামার কাহিনী অত্যন্ত স্বাভাবিকতা লাভ করেছে। এই কাহিনী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আপন কাহিনী হয়ে উঠেছে। সাধারণ বাঙালি সংসারে আমরা এই জননীকেই দেখি। এই চরিত্র রূপায়ণে মানিকের দক্ষতা এবং বাস্তবতা বিস্ময়কর।...
>
> প্রথম উপন্যাসেই মানিক তাঁর নিপুণ ভাষা প্রয়োগ, ব্যাঙ্গাত্মক রচনাভঙ্গি, নিখুঁত চরিত্র রূপায়ণ এবং অপূর্ব বাস্তবতার পরিচয় দিয়ে বাঙলা উপন্যাসের এক নতুন দিক খুলে দিলেন। তাঁর উপন্যাসে জননীর যে বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বাঙলা সাহিত্যে তা ছিল দুর্লভ।[১]

শ্যামা উজানে দাঁড় বেয়ে বিরুদ্ধ পরিবেশে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। সমাজ-সংসারে সে কখনো অনুকূল পরিবেশ পায়নি। ছাপ-ছাপ অন্ধকার সরিয়ে সে আলোকিত জীবনের সন্ধান পেতে চেয়েছে। নিজের সঙ্গে সে ইতি-নেতি নিয়ে তর্ক করেছে; কিন্তু সংসারক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়নি। এজন্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যামা চরিত্র হয়ে উঠেছে শাশ্বত বাঙালি নারীর প্রতিনিধি।

দিবারাত্রির কাব্য

প্রকাশক্রমের দিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস *দিবারাত্রির কাব্য* (১৯৩৫)। জননী উপন্যাসের নয়মাস পরে এটি প্রকাশিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটিই মানিকের লেখা প্রথম উপন্যাস। এটি ১৯৩৪ সালে প্রথম 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩৫ সালে কলকাতার ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে মুদ্রিত হয়। এ-প্রসঙ্গে ভবানী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> একদিন তখনকার গ্লোব সিনেমার ওপরতলায় সস্তার টিকিটে তিনটের শোতে ছবি দেখছি, পিছন থেকে কে কাঁধে হাত রাখল, পিছন ফিরে দেখি মানিক। হাতে তার একখানি কালো এক্সারসাইজ বই।। সিনেমা ভাঙতে মানিক আমাকে টেনে নিয়ে কার্জন পার্কের একপাশে বসে তার নতুন লেখা পড়ে শোনালো। তখন

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ২৩২

সেটি একটি গল্প ছিল, কিন্তু পরে বঙ্গশ্রীতে যখন প্রকাশিত হয় তখন সজনীকান্তের উপদেশানুসারে সে আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদরচনা করে। এবং পরে এই কাহিনীগুলি 'দিবারাত্রির কাব্য' নামে প্রকাশিত হয়।[১]

'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় প্রকাশের ব্যাপারে সজনীকান্ত দাস তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> শ্রীমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গল্প (সরীসৃপ-১৩৪০ আশ্বিন) লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে একটি বিচিত্র উপন্যাস হস্তে তাঁহার শুভাগমন ঘটিল। এই উপন্যাসের ক্রম পরিণতির কাহিনিও বিচিত্র।... লেখাটির পরিণতি সম্বন্ধে তখনও অব্যবস্থিত মানিক 'একটি দিন' নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে উপন্যাসটি উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমনভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি 'একটি দিন' সম্পূর্ণ গল্পাকারে ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক 'একটি দিনে'র উপসংহার 'একটি সন্ধ্যা' লইয়া উপস্থিত হইলেন। 'একটি সন্ধ্যা'তেও শেষ হইল না, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা 'রাত্রি' তে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে 'রাত্রি' – 'দিবারাত্রির কাব্য' হইল।[২]

দিবারাত্রির কাব্য প্রসঙ্গে ' লেখকের ভূমিকা'য় স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর (১৩৪১) বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।
>
> দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক – তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটা নতুন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection – মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।[৩]

দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসে চরিত্রের সংখ্যা খুবই স্বল্প। হেরম্ব, সুপ্রিয়া, আনন্দ, মালতী, অশোক ও অনাথ প্রমুখ চরিত্রকে কেন্দ্র করে এ-উপন্যাসের কাহিনি শিল্পরূপ পেয়েছে। মানিকের বক্তব্যসূত্রে এবং উপন্যাস পাঠেও সহজে অনুমেয় যে, *দিবারাত্রির কাব্যে* মানিকের বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ রূপকের আবরণে ফুটে উঠেছে। এ-উপন্যাসের তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগ : দিনের কবিতা, দ্বিতীয় ভাগ : রাতের কবিতা এবং তৃতীয় ভাগ :

---

১. হায়াত মামুদ সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ৭৪৩

২. সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশকাল-১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬১

৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'লেখকের কথা', *দিবারাত্রির কাব্য*, (দ্রষ্টব্য : হায়াত মামুদ সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ৭৪৩)

দিবারাত্রির কাব্য। তিনটি ভাগেই রয়েছে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হেরম্ব, যিনি একটি কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। উপন্যাসটির প্রতিটি ভাগ শুরু হয়েছে কবিতা দিয়ে। এ কবিতা রূপকাশ্রয়ী এবং মূল বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথম ভাগের কবিতাংশ এরকম :

প্রাতে বন্ধু এসেছে পথিক,
পিঙ্গল সাহারা হতে করিয়া চয়ন
শুষ্ক জীর্ণ তৃণ একগাছি।
ক্ষতবুক তৃষার প্রতীক
রাতের কাজল–লোভী কাতর নয়ন
ওষ্ঠপুটে মৃত মৌমাছি।
স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে সে দাঁড়ায়,
আমারে পোড়ায় তবু উত্তপ্ত নিঃশ্বাস
গৃহাঙ্গনে মরীচিকা আনে।
বক্ষ রিক্ততায় মমতায়
এ জীবনে জীবনের এল না আভাস
বিবর্ণ বিশীর্ণ মরুতৃণে।[১]

প্রথম ভাগে বর্ণিত ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, হেরম্ব ও সুপ্রিয়ার জীবনের ক্রমপরিণতির যে পূর্বাভাস লক্ষ্য করি তাই উপর্যুক্ত কবিতায় 'পিঙ্গল সাহারা', 'শুষ্ক জীর্ণ তৃণ', 'ক্ষতবুক তৃষা', 'মৃত মৌমাছি', 'মরীচিকা' 'বিবর্ণ বিশীর্ণ মরুতৃণ' ইত্যাদি প্রতীকে আভাসিত হয়েছে।

প্রথম ভাগে দেখা যায়, জনবসতি থেকে বহু দূরের রূপাইকুড়ায় অশোক-সুপ্রিয়ার বসবাস। অশোকের সংসারে সুপ্রিয়া যখন ধ্বস্ত-ক্লান্ত, জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ, তখন সেখানে তার প্রথম যৌবনের প্রেমিক হেরম্বের আকস্মিক আগমন ঘটে। হেরম্ব বিপত্নীক। বিবাহিত জীবনের একপর্যায়ে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। উপন্যাসসূত্রে জানা যায়, সুপ্রিয়া তার বাল্যপ্রেমের মোহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। পাঁচ বছর পর হেরম্বকে কাছে পেয়ে সুপ্রিয়া তাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে; এবং অশোকের পরিবর্তে হেরম্বকেই জীবনসঙ্গী

১. *দিবারাত্রির কাব্য*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০৯

হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছে। কিন্তু তার লিবিডোতাড়িত আত্মনিবেদন বারবার হোঁচট খেয়েছে হেরম্বের বক্র-বক্তব্যের নিষ্ঠুরতায়।

এ উপন্যাসে সুপ্রিয়ার স্বামী অশোক রূপাইকুড়া থানার দারোগা। অসতী স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে সে যখন রিরসাকে আটক করে, তখন তার গৃহে উপস্থিত হয় তারই স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক হেরম্ব। খুনি আসামী প্রসঙ্গে হেরম্ব-অশোকের আলাপচারিতার একপর্যায়ে দ্বিচারিণী স্ত্রীর প্রতি সমাজের ভূমিকার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আলোচনার এক পর্যায়ে সুপ্রিয়া অকস্মাৎ মূর্ছা যায়। তার এ ব্যাধি বেশ পুরনো। তবুও রাতের গভীরতায় অসুস্থ ও অবসন্ন সুপ্রিয়া হেরম্বের কক্ষে আসে ভবিষ্যৎ আশ্বাসের আকাঙ্ক্ষায়। সে হেরম্বের সঙ্গে চলে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু সুপ্রিয়ার আগ্রহ বা ইচ্ছাকে গুরুত্ব না দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুপ্রিয়ার প্রতি সে কোনো আকর্ষণই বোধ করে না। সুপ্রিয়ার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। তার কাছে সুপ্রিয়া রহস্যময় বা অস্পষ্ট কোনো নারী নয়। এ কারণে সুপ্রিয়ার প্রতি সে নির্মোহ ও আকর্ষণহীন। হেরম্ব যে সুপ্রিয়ার চেতন-অবচেতনজাত ভাবনারাশি শনাক্ত করতে সক্ষম তা এ-উপন্যাসের বর্ণনাংশেও স্পষ্ট।

সুপ্রিয়ার মতো হেরম্বের জীবনও রহস্যময়তায় ঢাকা। দাম্পত্যজীবনে তার আচরণও সুস্থ-স্বাভাবিক ছিল না। তার উদাসীনতার কারণে স্ত্রী উমা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। তার প্রতি সুপ্রিয়ার গভীর অনুরাগের কথা জানতে পেরেও সে অশোক দারোগার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। পাঁচ বছর পর সে আবার সুপ্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছে। সুপ্রিয়া তার সঙ্গে চলে আসার প্রস্তাব দিলে সে সময় নিয়েছে। হেরম্ব সবসময় জীবনসম্পর্কিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা তাকে নিয়ন্ত্রণ করলেও সে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ফলে সমাজ-সংসার-প্রিয়জন সবার কাছ থেকে সে বিচ্ছিন থেকে গেছে।

*দিবারাত্রির কাব্যে*র দ্বিতীয় ভাগ 'রাতের কবিতা'। এর শুরুতেও যুক্ত হয়েছে একটি কবিতা। 'রাতের কবিতা'য় অন্ধকারের প্রসঙ্গই বারবার উত্থাপিত হয়েছে। প্রথম ভাগের কবিতার মতোই এভাগের কবিতাও ইঙ্গিতবাহী ও রূপকধর্মী। কবিতার শেষের ছয় পঙ্‌ক্তিতে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট :

শান্ত রাত্রি নীহারিকা লোকে
বন্দী রাত্রি মোর বুকে উতল ধীর-
অনুদার – সংকীর্ণ আকাশ।
মৃত্যু মুক্তি দেয় না যাহাকে

প্রেম তার মহামুক্তি। – নূতন শরীর
মুক্তি নয়, মুক্তির আভাষ।[১]

এ ভাগ শুরু হয়েছে পুরীর সমুদ্র সৈকতে হেরম্বের সঙ্গে অনাথের সাক্ষাতের মাধ্যমে। বারো বছর বয়সে ভাবালুতাতাড়িত হেরম্ব তার চেয়ে চার বছরের বেশি বয়সী মালতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু হেরম্বের পরিবর্তে গৃহশিক্ষক অনাথকেই মালতী বিয়ে করে। শৈশবে এই অনাথ ছিল হেরম্বের কাছে রূপকথার রহস্যময় মানুষ। মালতীকে দেখার প্রবল তাড়নায় অনাথের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেরম্ব শহরের উপকণ্ঠে বাগান-ঘেরা ভগ্নপ্রায় একটি বাড়িতে উপস্থিত হয়। এসময় তৃষ্ণার্ত হেরম্বকে জল পরিবেশন করে মালতীর একমাত্র কন্যা আনন্দ। আনন্দকে দেখে হেরম্ব বিস্মিত ও বিমোহিত হয়। তার মনে হয় – 'আনন্দ অপ্সরী নয়, বিদ্যাধরী নয়, তিলোত্তমা নয়, মোহিনী নয়। তাকে চোখে দেখেই মুগ্ধ হওয়া যায়, উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোন কারণ থাকে না।'[২] বারো বছর বয়সে দেখা মালতীকে সে আবিষ্কার করে আত্মজা আনন্দের মধ্যে :

> আনন্দকে দেখে তার মনে হল সেই মালতীই যেন বিশ্বশিল্পীর কারখানা থেকে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত হয়ে গত বিশ বছর ধরে প্রকৃতির মধ্যে, নারীর মধ্যে, নানা পশুপাখির মধ্যে ভোরের শিশির আর সন্ধ্যাতারার মধ্যে রূপ, রেখা ও আলোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাকে তৃপ্ত করার যোগ্যতা অর্জন করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শীতকালের ঝরা শুকনো পাতাকে হঠাৎ একসময় বসন্তের বাতাস এসে যেভাবে নাড়া দিয়ে যায় আনন্দের আবির্ভাবও হেরম্বের জীর্ণ পুরাতন মনকে তেমনিভাবে নাড়া দিয়ে দিল।[৩]

রাতের কবিতায় আনন্দ একটি জটিল, অজ্ঞাত, অস্পষ্ট ও রহস্যময় চরিত্র। আনন্দের সঙ্গে হেরম্বের গড়ে-ওঠা সম্পর্কও রাত্রির মতো অস্পষ্ট, রহস্যময়। 'পারস্পরিক এ প্রেমের অগ্রগতির পথে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, মান, অভিমান, পরস্পরকে বারবার স্পর্শ করেছে। মধ্যরাত্রে আনন্দ চন্দ্রকলা নৃত্য পরিবেশন করলো হেরম্বকে; আবেগময়, প্রাণময় এ নৃত্য উভয়কে প্রেমে অধিষ্ঠিত করেছে চূড়ান্তভাবে।'[৪] চন্দ্রকলা নৃত্য শেষে :

---

১. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

২. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৩. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৪. মনসুর মুসা, 'দিবারাত্রির কাব্য', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূঁইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর-২০১২, পৃ. ৯৯

আকাশের চাঁদের কাছে পৌঁছে, আনন্দ একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। হেরম্বের দেহের আশ্রয়ে নিজের দেহকে আরও নিবিড়ভাবে সমর্পণ করে সে আকাশের নিষ্প্রভ তারা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল।[১]

আনন্দ চরিত্রে অকৃত্রিমতা, আদিম সারল্য ও সৌন্দর্যবোধ লক্ষণীয়। প্রথম ভাগের শেষে হেরম্ব মাঠের শুষ্ক তৃণের উপর বিচরণ করেছিল এবং ভেবেছিল, বৃষ্টির আবির্ভাবে এই বিবর্ণ তৃণদল সজীব হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় ভাগের শেষেও দেখা যায় – 'আনন্দের মুখে দৃষ্টিনিবন্ধ রেখে দু'হাতের তালুতে পৃথিবীর সবুজ নমনীয় প্রাণবান তৃণের স্পর্শ অনুভব করে হেরম্ব খুশি হয়ে উঠল। প্রশান্ত চিত্তে ভাবল, পূর্ণিমার নাচ শেষ করে অমাবস্যায় ফিরে না গিয়ে আনন্দ ভালোই করেছে।'[২]

তৃতীয় ভাগ 'দিবারাত্রির কাব্যে'র শুরুতেও কবিতা সংযোজিত হয়েছে। আর এ কবিতাতেই উপন্যাসের চূড়ান্ত পরিণতির আভাস দেওয়া হয়েছে। এ অংশে আনন্দ আগুনে আত্মাহুতি দেয় যা লেখক 'শ্মশানে'র রূপকে তুলে ধরেছেন :

'সব্যসাচি! আমি ক্ষুধাতুর,
শ্মশানের প্রান্ত-ঘেঁষা উত্তর-বাহিনী
নদীস্রোতে চলেছি ভাসিয়া,
মোর সর্ব ভবিষ্যৎ-ভরা
ব্যর্থতার পরপারে। – কে হে কাহিনী
মোর লাগি রহিবে বসিয়া ?'[৩]

এ ভাগে জানা যায়, হেরম্বকে দাম্পত্যধর্মে অর্জনে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে এলোমেলো হয়ে গেছে সুপ্রিয়ার জীবন। অনিদ্রা, অবসাদ ও মনোজাগতিক ক্লান্তির চাপে সে আক্রান্ত হয়েছে দুরারোগ্য হিস্টিরিয়া রোগে। রূপাইকুড়ায় হেরম্ব ছয় মাসের মধ্যে সুপ্রিয়াকে নিয়ে যে নতুন জীবন শুরু করার আশ্বাস দিয়েছিল, সে-ই আশ্বাসই সুপ্রিয়াকে সমুদ্র-তীরবর্তী পুরীতে হেরম্বের সন্নিধানে নিয়ে আসে। সুপ্রিয়া পুরীতে এসে আনন্দ ও হেরম্বের সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করে। আবার ঝড়ের মধ্যে অশোক সমুদ্র দেখানোর নাম করে সুপ্রিয়াকে ছাদ থেকে ফেলে মারতে চেয়েছিল – এটিও সে হেরম্বকে জানায়। এ সবই হেরম্বের কাছে সুপ্রিয়ার অস্থির মস্তিষ্কের

১. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
২. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
৩. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

কল্পনা বলে মনে হয়। হেরম্ব যদিও অনবরত সুপ্রিয়ার প্রেম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করে গেছে, তবু সে মাঝে মাঝে তার প্রতি দুর্বলতাও প্রদর্শন করেছে :

> ক্রমাগত সুপ্রিয়ার চিত্তকে ভিন্নাভিমুখী করার চেষ্টায় মাঝে মাঝে তার ভ্রান্তি জন্মে যায় সুপ্রিয়ার প্রেমকে হত্যা করার বদলে সে বুঝি প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।[১]

হেরম্বের জীবনে আনন্দের উপস্থিতি সুপ্রিয়া মেনে নিতে পারে না। এ ঘটনা তাকে মানসিকভাবে আরো বিপর্যস্ত করে তোলে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সুপ্রিয়া হেরম্বকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু হেরম্ব তার আহবানে সাড়া দেয়নি। একারণে সুপ্রিয়াকে অশোকের কাছে ফিরে যেতে হয়েছে, হেরম্বও চলে গেছে পুরীতে – আনন্দের আশ্রমে।

এ ভাগে দেখা যায়, মালতী-অনাথের অসম সংসারও শেষপর্যন্ত সুখের হয়নি। অনাথ বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করেছে। মালতীর জীবনাচারও স্বাভাবিক নয়। জীবনে কোনো প্রত্যাশাই তার পূরণ হয়নি। যে অনাথকে জীবনসঙ্গী করে সে পালিয়ে এসেছিল, সে-ই অনাথ তাকে কিছুই দিতে পারেনি। এ দম্পতিকে বাস করতে হয়েছে লোকালয় থেকে দূরবর্তী একটি ছোট মন্দিরে। দাম্পত্যজীবনে মালতী যতই অনাথের প্রতি তার অনুরাগ প্রদর্শন করেছে, ভালোবাসাপ্রাপ্তির জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে ততই অনাথ তার প্রতি নির্মম উদাসীনতা দেখিয়েছে। মালতী বৈষ্ণবী হলেও অনাথের উপেক্ষার প্রতিশোধ নিতে সে তান্ত্রিক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর বক্তব্য :

> 'সুরাসক্ত ও ধর্মচর্চার আড়ালে অস্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত মালতী ও তার স্বামী অনাথের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা ও চূড়ান্ত মানস-বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও লেখকের আধুনিক জীবনদৃষ্টির লক্ষণ পরিস্ফুট।[২]

বস্তুত, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, স্বামীর ঔদাসীন্য প্রভৃতি মালতীকে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে। তাই সে সর্বক্ষণ অতৃপ্তির যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে :

---

১. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশ কাল : জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৫

> সুখ? নাইবা রইল সুখ! সুখতো শুট্‌কি মাছ। জিভকে ছোট না করলে স্বস্তি মেলে না। সুখ স্থান জুড়ে নেই, প্রেম দিয়ে ভরে নাও, আনন্দ দিয়ে পূর্ণ কর। সুবিধা কত। মদ নেই যদি মদের নেশা সুধায় মেটাও।[১]

অনাথ একসময় শিক্ষকতা করেছে, পরবর্তীকালে সে প্রেমিক এবং শেষকালে সাধক ও পলাতক। মালতীর সঙ্গে তার সুখী দাম্পত্য জীবন যাপনের কোনো নিদর্শন এ উপন্যাসে নেই। অনাথ গৃহে অবস্থান করেও গৃহী নয়। সময়ে-অসময়ে বিচলিত হয়ে পড়লেই সে ধ্যান শুরু করে। তার এ ধ্যানমগ্নতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অজ্ঞাত। প্রতীয়মান হয়, এক্ষেত্রে মালতীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টাই তার লক্ষ্য। অনাথ কয়েকদিন নিরুদ্দেশ হলে মালতী তাকে খোঁজার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। মধ্যরাতে মালতী হেরম্বের কাছে অনাথকে খুঁজতে যাওয়ার কথা বললে হেরম্ব বাধা দেয়। কিন্তু মালতী নিবৃত্ত হয় না। সে কন্যা আনন্দসহ সবকিছু হেরম্বের কাছে সমর্পণ করে গোঁসাই ঠাকুরের আশ্রমে চলে যায়। বিদায়ের প্রাক্কালে সে হেরম্বকে বলে :

> 'আনন্দকে দেখ হেরম্ব। দুঃখ দিও না ওকে। তোমার মাস্টার মশায়ের হাতে আমার যে দুর্দশা হয়েছে ওর যেন সেরকম না হয়। টাকা-পয়সা যা রোজগার করেছি সব রেখে গেলাম। আমার ঘরে যে কাঠের সিন্দুক আছে, তাতে সোনার গয়না আর রূপার বাসন কোসন পাবে। সবচেয়ে বড় চাবিটা সিন্দুকের তালার। মন্দিরে ঠাকুরের পিছনে একটা ঘটিতে সতেরটা মোহর আছে, ঘরে নিয়ে রেখ। এখানে বেশি দেরি না করে কলকাতায় চলে যেও। ঠাকুরের জন্য ভেব না, আমি পূজার ব্যবস্থা করব।'[২]

পিতা-মাতার বিকারগ্রস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দ ক্রমান্বয়ে বিষণ্ন ও ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। এ-অবস্থায় তাকে রেখে হেরম্ব সুপ্রিয়ার সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে দেখা করতে যায়। সেখানে সুপ্রিয়া তার সঙ্গে হেরম্বকে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করে। এসব জটিল ঘটনার দোলাচলে আনন্দ দিশেহারা হয়ে ওঠে। সুতীব্র বেদনা এবং তীর্যক ঈর্ষায় কাতর হয়ে সে চন্দ্রকলা নৃত্যের আয়োজন করে। তার নির্দেশে হেরম্ব আঙিনায় ঘি যুক্ত বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলন করে :

> খানিকক্ষণ আগুনের সান্নিধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একে একে কাপড় জামা খুলে আনন্দ অর্ঘ্যের মতো আগুনে সমর্পণ করে দিল। তার গলায় সোনার হারে তাবিজ ছিল, বাহুতে তুলসীর মালা ছিল, হাতে ছিল সোনার চুড়ি। একে একে খুলে তাও সে আগুনে ফেলে দিল।[৩]

---

১. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

২. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৩. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

উন্মত্ত আনন্দ নিরাবরণ-নিরাভরণ হয়ে নৃত্য শুরু করে। নাচতে নাচতে সে অগ্নিকুণ্ডের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করে। ক্রমে ক্রমে সে অগ্নিশিখার নিকটবর্তী হয় এবং একসময়ে সে বিরাট যজ্ঞানলে প্রবেশ করে। সিঁড়িতে বসে হেরম্ব তখন অপলক তাকিয়ে থাকে। তার যেন কিছুই করণীয় নেই। এখানেই কাহিনির সমাপ্তি।

আনন্দ আত্মাহুতি দিয়ে হেরম্বেরও যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছে। উপনিবেশ-শাসিত সময়ে বেড়ে ওঠা হেরম্ব কোথাও শান্তি পায়নি, সর্বত্রই সে অস্থিরতা লক্ষ করেছে। সমকাল তাকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ ও সমাজবিচ্ছিন্ন করেছে। এ উপন্যাসে হেরম্ব তিনটি নারীর সংস্পর্শে এসেছে – উমা, সুপ্রিয়া ও আনন্দ। উমা তার স্ত্রী। একটি শিশু-কন্যা রেখে সে আত্মহত্যা করে। উমার আত্মহত্যার কারণ উপন্যাসে বিস্তারিতভাবে না থাকলেও দু-একটি ইঙ্গিত রয়েছে। বিশেষ করে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর সুপ্রিয়ার অভিযোগের মধ্যে তা উপস্থাপিত হয়েছে :

> আজ টের পেলাম, বৌ কেন গলায় দড়ি দিয়েছিল। আপনি মেয়ে মানুষের সর্বনাশ করেন কিন্তু তাদের ভার ঘাড়ে নেবার সময় হলেই যান এড়িয়ে।[১]

উপন্যাসের প্রথম ভাগ থেকে তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত হেরম্ব ছুটে চললেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। তার আত্ম-বিশ্লেষণের পর্যায়টি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে :

> সমারোহের সঙ্গে দিনের পর দিন নিজের এই অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে সে বয়ে বেড়িয়েছে। চকমকির মত নিজের সঙ্গে নিজেকে ঠুকে চারিদিকে বয়ে বেড়িয়েছে আগুন। কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সে-ই উমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সে খুনী![২]

আনন্দের নিঃসঙ্গতা নিয়তি-নির্ধারিত, তা দূর করবার সামর্থ্য হেরম্বের ছিল না। এই একাকীত্ব ও পিতা-মাতার জটিল সম্পর্ক থেকে মুক্তির জন্য হেরম্ব তাকে নিয়ে লোকালয়ের বাইরে ঘর বাঁধার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ততদিনে আনন্দ মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে :

> আনন্দ তো কবি নয়। মেয়েরা কবি হয় না। পৌরুষ ও কবিত্ব একধর্মী। নিখিল মানবতার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে একদা রণিত-ধ্বনির প্রতিধ্বনিকে সে কখনও খুঁজে বেড়াতে পারবে না। জগতে তার দ্বিতীয় প্রতিরূপ নেই, সে বৃহতের অংশ নয়, সার্থকও নয় ; সম্পূর্ণ এবং ক্ষুদ্র। যে বংশ প্রবাহ মানবতার রূপ, সে তা বোঝে না। অতীত ভবিষ্যতের ভারে তার জীবন পীড়িত নয়, সার্থকও নয়। সৃষ্টির অনন্ত সূত্রে সে গ্রন্থির

---

১. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

২. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

মতো বিগত ও অনাগতকে নিজের জোরে যুক্ত করে রাখে না। পৃথিবী যেমন মানুষের জড় দেহকে দাঁড়াবার নির্ভর দেয়, মানুষের জীবনকে এরা তেমনি আশ্রয় যোগায়। পৃথিবী জুড়ে হেরম্বের আত্মীয় থাক, আনন্দের কেউ নেই। সে একা।[১]

বস্তুত ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বৃত্তবদ্ধ সামাজিক পরিমণ্ডলে মধ্যবিত্তজীবনের যে শূন্যতা তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্যে* প্রতিভাত হয়েছে। 'অস্তিত্ববাদী উপন্যাস বলতে যা বোঝায় মানিক তারও পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর দিবারাত্রির কাব্য বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।'[২]

দিবারাত্রির কাব্যের কাহিনি বিক্ষিপ্ত হলেও লেখক রূপকের আশ্রয়ে বিস্তর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তিনি হেরম্ব চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্লেষণপ্রবণ হেরম্ব যে অস্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তা তার নিজের বক্তব্যে স্পষ্ট। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার চিন্তা-কর্মের মিল পাওয়া যায় না।

উপন্যাসে সুপ্রিয়া ও আনন্দ অর্থাৎ দিবা ও রাত্রির আগমন দ্বন্দ্বময় কাহিনির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সুপ্রিয়াকে লেখক দিনের রূপকে এবং আনন্দকে রাতের রূপকে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর বক্তব্য স্মরণীয় :

> *দিবারাত্রির কাব্য*-এর হেরম্ব-আনন্দের প্রেম কল্পনা, পূর্ণিমা নিশীথে নৃত্যপরা তরুণী আনন্দের অপার্থিব সৌন্দর্য রূপায়ণ কিংবা গভীর নির্জন রাত্রে পরীনৃত্যের জন্যে রচিত আগুনের কুণ্ডে তার আকস্মিক আত্মাহুতি – সবই এক তরুণ কথাশিল্পীর রোমান্টিক ভাবসৌন্দর্যের সঙ্গে একান্তভাবে মিশে আছে বিশ শতকের সুকঠিন বাস্তব পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠা, অস্তিত্বের নানান সংকটের মুখোমুখি দাঁড়ানো এক ঔপন্যাসিকের যথার্থ বাস্তবনিষ্ঠ শিল্প বিন্যাসের জন্য নিগূঢ় পিপাসা।...উপন্যাসটির নায়ক চরিত্রে প্রথম বিশ্বোযুদ্ধোত্তর কালের বুদ্ধিজীবী নাগরিক মধ্যবিত্ত মানসের জটিল দ্বন্দ্বদীর্ণ, বিচ্ছিন্ন অনিকেত সত্তার বিশ্লেষণধর্মী তীক্ষ্ম আত্মজিজ্ঞাসার যে অভিব্যক্তি চোখে পড়ে, তা নিঃসন্দেহে লেখকের গভীর বাস্তব সচেতনতার শিল্পরূপ।[৩]

---

১. *দিবারাত্রির কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

২. আবুল ফজল, 'পুতুল নাচের ইতিকথা', ভূঁইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১৫

৩. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

দিবারাত্রির কাব্যের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে উমা, অশোক দারোগা প্রমুখ চরিত্র স্বাভাবিক জীবনযাপনে ব্যর্থ হয়েছে। হেরম্ব ও উমা, সুপ্রিয়া ও অশোক, মালতী ও অনাথ কোনো দম্পতিই সুখী হয়নি। একটি জটিল, দ্বন্দ্বময় মনস্তাত্ত্বিক টানাপড়েন এবং প্রেম ও অপ্রেমের উপাদান নিয়ে *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। সমালোচকগণ মনে করেন *দিবারাত্রির কাব্যের* সঙ্গে তুলনীয় কোনো উপন্যাস মানিক উত্তরকালে লেখেননি। সমালোচক যুগান্তর চক্রবর্তী বলেন :

> 'বিশ শতকের মধ্যবিশ দশকের পরবর্তী পৃথিবীর অর্থনৈতিক সংকট এবং বিশ্বাসনাশক দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী শূন্যতায় বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজমানসিক প্রতিক্রিয়া, তার বিপন্ন অস্তিত্ব, হৃদয় ও মস্তিষ্কের মৌলিক বিচ্ছেদ, আমাদের সাহিত্যে এই প্রথম ছায়া ফেলে।'[১]

দিবারাত্রির কাব্যের শরীরেই শুধু কবিতার সংক্রমণ নেই, এর আত্মায়ও কবিতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের ঘটনা, চরিত্র-চিত্রণ, করণ-কৌশল ও পরিবেশ সবই কবিতায় সন্নিবেশিত এবং পুরো উপন্যাসটি নানা সমস্যার উপর আবর্তিত হয়েছে। ফলে *দিবারাত্রির কাব্য* বিষয়ানুযায়ী বিন্যাসের কারণে একটি কাব্যধর্মী উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে।

পুতুলনাচের ইতিকথা

পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬)[২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস। এ উপন্যাসে গ্রামীণ জীবন ও সমাজের বিচিত্রমাত্রিক বিষয় অসামান্য ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়েছে। মানুষের সামাজিক ও জৈবিক বাস্তবতা অন্বেষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। *উপন্যাসের কথা* শীর্ষক প্রবন্ধে মানিক বলেছেন :

> লিখতে শুরু করেই আমার উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক পড়লো। কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাঁদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এল *পুতুলনাচের ইতিকথার* উপকরণ এবং কয়েকদিনে একটি গল্প লিখে ফেলার বদলে দীর্ঘদিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাসটি – এ ব্যাপারের সঙ্গে

---

১. যুগান্তর চক্রবর্তী, 'দিবারাত্রির কাব্য : একটি উপন্যাসের জন্ম', ভূঁইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

২. 'জলধর সেন সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় পৌষ, ১৩৪১ থেকে অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ (ডিসেম্বর, ১৯৩৪-ডিসেম্বর ১৯৩৫) পর্যন্ত 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ডি.এম. লাইব্রেরী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম গ্রন্থাকারে তা প্রকাশ করে...।' (দ্রষ্টব্য : সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ : ১৯৯৯, পৃ. ২৩২)

সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনেক দিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।[১]

স্পষ্টতই মানিক অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক 'চোরা মোহ' থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে *পুতুলনাচের ইতিকথার* আখ্যান পরিকল্পনা করেছেন। উপন্যাসটি লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত হলেও শশী চরিত্রকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ঘটনাংশ আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ যেহেতু শশী চরিত্রকেন্দ্রিক, সেহেতু তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ- বেদনা, প্রত্যাশা-অচরিতার্থতার সঙ্গে উপন্যাসের মৌলদর্শন সম্পর্কিত। এ-প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

বাংলা উপন্যাসে আধুনিক জীবন-ভাবনা বিন্যাসের দিক থেকে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র নায়ক এক অনন্য চরিত্র সন্দেহ নেই। আবার অন্যদিকে একথাও সত্য যে একালের উপন্যাসে, বিশেষত মানিকের অনেক রচনাতেই শ্রমজীবী মানুষের কিংবা অবহেলিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর যে অর্থনৈতিক সংকট ও সংগ্রামের ছবি মেলে কিংবা যে অবচেতন আশ্রিত যৌন সমস্যার মুখ্য ভূমিকা থাকে, অর্থাৎ যাদের আমরা সাহিত্যে আধুনিকতার অন্যতম মৌল লক্ষণ বলে জানি, 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে সেইসব লক্ষণ আদৌ তেমনভাবে পাইনি। কিন্তু তবু হয়তো নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার যথার্থ স্বরূপ লক্ষণের দিক থেকে এই গ্রন্থ এক তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় সৃষ্টি। গ্রন্থটিতে আধুনিকতার সেই স্বরূপলক্ষণের অনেকটাই ফুটে উঠেছে মানিকের বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্ভবমর্মভেদী বাস্তবদৃষ্টির মাধ্যমে।[২]

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের নাট্যিক সূচনা বেশ রোমাঞ্চকর। গাওদিয়া গ্রামের হারু ঘোষ তার মেয়ে মতির বিয়ের জন্য পাত্র দেখে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে বৃষ্টি আসলে সে গাওদিয়ার অন্তর্বর্তী খালের ধারে একটি বটগাছের নিচে দাঁড়ায়; তখনই বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হয়। লেখক তার মর্মান্তিক মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।

---

১. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, 'উপন্যাসের ধারা' *লেখকের কথা*, (দ্রষ্টব্য : ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (সম্পা.), *উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৬৬৫)

২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'পুতুলনাচের ইতিকথা', নারায়ণ চৌধুরী (সম্পা.) মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮১, পৃ. ৭৩

হারুর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল আর বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মমগ্নতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কটাক্ষ করিয়া আকাশের দেবতা দিগন্ত কাঁপাইয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন। তারপর জোরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল।...

হারুকে সহজে এখানে কেহ আবিষ্কার করিবে, এরূপ সম্ভাবনা কম। এদিকে মানুষের বসতি নাই। এদিকে আসিবার প্রয়োজন কাহারো বড় একটা হয় না, সহজে কেহ আসিতেও চায় না। গ্রামের লোক ভয় করিতে ভালবাসে। গ্রামের বাহিরে খালের এপারের ঘন জঙ্গল ও গভীর নির্জনতাকে তাহারা ওই কাজে লাগাইয়াছে। ভূত- প্রেতের অস্তিত্ব হয়তো গ্রামবাসীরই ভীরু কল্পনায়, কিন্তু স্থানটি যে সাপের রাজ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।[১]

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শশী এসময় শহর থেকে বাড়ি ফিরছিল। এই ভূত-প্রেত ও সাপ-খোপের রাজ্যে দিবসের শেষ সূর্যের আবছা আলোয় আবিষ্কার করে শশী। বজ্রাঘাতে মৃত হারু ঘোষকে দেখতে পেয়ে সে কর্তব্য সচেতন হয়। অতঃপর গোবর্ধনের সহযোগিতায় সে নৌকাযোগে হারুর মৃতদেহ গ্রামে নিয়ে যায় এবং সকলের সহযোগিতায় সৎকার করে। *পুতুলনাচের ইতিকথা*র সূচনা-পর্যায়ে হারু ঘোষের এই মৃত্যুদৃশ্য অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক বিপরীতক্রমে যেন জীবনের প্রতি মমত্ববোধকেই পরিবেশন করেছেন। 'মানিকের উপন্যাসের অন্যতম সুর এখানে ধ্বনিত। মৃত্যুচেতনাকে বাদ দিয়ে জীবনচেতনা পূর্ণতা পায় না। জীবনের সমগ্রতাকে পেতে হলে মৃত্যুকে বাদ দিতে পারি না। এই বোধ এখানে পরিস্ফুট। মৃত্যুর পটভূমিতে নশ্বর জীবনকে দেখার অভিলাষ এখানে সক্রিয়।'[২]

*পুতুলনাচের ইতিকথা*র প্রধান চরিত্র শশী। তার পিতা গোপাল দাস, মাতৃহীন সংসারে পিতার সাহচর্য ও কঠোর তত্ত্বাবধানে সে বেড়ে ওঠে। শশী পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। কলকাতা শহরে সে লেখাপড়া করেছে এবং সম্প্রতি ডাক্তারি পাশ করে গ্রামে ফিরেছে। শাহরিক জীবনাচারের সঙ্গে পরিচয় এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও তার মধ্যে গ্রামীণ সংস্কার বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে শশী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অবক্ষয়দীর্ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। লেখক তার চরিত্রকাঠামো তুলে ধরেছেন এভাবে :

---

১. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৬৯

২. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১৩৮

> শশীর চরিত্রে দু'টি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নাই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট। তাহার কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মূক। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সঙ্গে না মিশিলে এ কথা কেহ টের পাইবে না যে, তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে। তাহার বুদ্ধি, সংযম ও হিসাবী প্রকৃতির পরিচয় মানুষ সাধারণত পায়। সংসারে টিকিবার জন্য দরকারি এই গুণগুলির জন্য শশীকে সকলে ভয় ও খাতির করিয়া চলে।[১]

উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা গোপাল দাসের বিষয়বুদ্ধি ও স্বার্থপরতা যেমন শশীর ধমনীতে প্রবিষ্ট হয়েছে ঠিক তেমনি কলকাতায় পঠন-পাঠন এবং বন্ধু কুমুদের সাহচর্যসূত্রে সে অর্জন করেছে সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও শিল্পিত ভাবনা-চেতনা। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নশেষে সে অতঃপর গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে এবং গ্রামীণ মানুষের চিকিৎসায় নিজেকে নিয়োজিত করে; কিন্তু শাহরিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চটজলদি গ্রামীণ জীবন-পরিবেশের সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে পারে না :

> প্রথমটা শশী একটু উদভ্রান্ত হইয়া গেল। মাথা ঘামাইয়া ঘামাইয়া জীবনকে ফেনাইয়া, ফাঁপাইয়া মানুষ এমন বিরাট ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে? জানিবার এত বিষয়, উপভোগ করিবার এত উপায়, বিজ্ঞান ও কাব্য মিশিয়া এমন জটিল, এমন রসালো মানুষের জীবন? তারপর গ্রামে ডাক্তারি করিতে বসিয়া প্রথমে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের বাজনার মতো বাজিতেছিল, সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এইসব অশিক্ষিত নরনারী, ডোবা পুকুর, বনজঙ্গল, মাঠ, বাকি জীবনটা তাহাকে এখানেই কাটাইতে হইবে নাকি? ও ভগবান, একটা লাইব্রেরি পর্যন্ত যে এখানে নাই! ক্রমে ক্রমে শশীর মন শান্ত হইয়াছে। সে তো গ্রামেরই সন্তান, গ্রাম্য নরনারীর মধ্যে গ্রামের মাটি মাখিয়া গ্রামের জলবায়ু শুষিয়া সে বড় হইয়াছে। হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য। শহর তাহার মনে যে ছাপ দিয়াছিল তাহা মুছিবার নয়, কিন্তু সে শুধু ছাপ, দাগা নয়। শহরের অভ্যাস যতটা পারে বজায় রাখিয়া বাকিটা সে বিসর্জন করিতে পারিল, কুমুদ ও বইয়ের কল্যাণে পাওয়া বহু বৃহত্তর আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমে ক্রমে সে চিন্তা ও কল্পনাতে পর্যবসিত করিয়া ফেলিতে লাগিল।[২]

ক্রমশ শশী গ্রাম্যজীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তার সময় অতিবাহিত হয় শ্রীনাথের দোকানে, বাঁধানো বকুলতলায় ও কায়েতপাড়ায়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকর্ম, গল্পগুজব, তাস-পাশা-আড্ডায় সময়

---

১. *পুতুল নাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

২. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

অতিবাহিত করে। একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও তাদের মধ্যে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান। উপরিতলে তারা সহজ-সরল হলেও তাদের মধ্যে রয়েছে জটিলতা, কুটিলতা, কুশ্রিতা ও রহস্যময়তা; যা দেখে শশী প্রায়শ যন্ত্রণাবোধ করে; গ্রামীণ জীবনের প্রতি তৈরি হয় বীতশ্রদ্ধা।

আধুনিক ভাবধারায় শিক্ষিত শশীকে গ্রামবাসী সমীহ করলেও তার সঙ্গে কেউ একাত্ম হতে পারেনি। এই দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটই শশীকে দগ্ধ করেছে। 'শশীর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মন অনুধাবন করতে পেরেছিল, তার অসহায়ত্ব ও সীমাবদ্ধতার অন্যতম কারণ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অসাম্যের গভীরে নিহিত। নইলে আধুনিক ডাক্তার শশীকে কেন গণ্ডগ্রামে হাসপাতালের নামে ডিসপেন্সারির চিকিৎসক হতে হয়? ...মানিক ব্যাখ্যা করেননি এতসব, সাধারণ ভাগ্যবাদী মানুষের দৃষ্টিবিন্দুতে সকল অসঙ্গতি ও অপূর্ণতাকে নিয়তির লীলাখেলা বা অদৃশ্য জাদুকরের সুতোয় বাঁধা পুতুলনাচের রূপক হিসেবেই হয়তো বিন্যাস করেছেন। দেখিয়েছেন স্বায়ত্তশাসিত মানুষের স্বভাগ্য-নির্মাণের দৃষ্টান্তও।'[১]

উপন্যাসের শুরু থেকে হারু ঘোষের পুত্রবধূ কুসুম ও কন্যা মতির সঙ্গে শশীর হার্দ্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়। হারু ঘোষের মৃত্যুর পর শশী স্বেচ্ছায় এই পরিবারের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে। কুসুমের ভালোবাসাকে শশী গ্রামীণ জীবনযাপনের ক্ষীণ প্রাণপ্রবাহ ও প্রণোদনা হিসেবে বিবেচনা করেছে। তার নির্দয় অবহেলার পরও কুসুমের ভালোবাসা যেন তার একান্ত প্রাপ্য। তাই কুসুম যখন অবলীলায় শশীর প্রতি নিজেকে নিবেদন করতে চেয়েছে, তখনই অহংবোধ থেকে কুসুমকে সে বলেছে – 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?'[২] ফলে সময়ের পরিক্রমায় শশীর প্রতি কুসুমের অবদমিত উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়ে এবং সে বলে :

> 'আপনাকে কি বলব ছোটবাবু, আপনি এত বোঝেন। লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না? সাধ আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্যে কোনো সুখ চাই না – বাকি জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি – আর কোনো আশা নেই, ইচ্ছে নেই, সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।'[৩]

---

১. ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'নিয়তির পক্ষ বিপক্ষ অথবা পুতুল ও মানুষের দ্বৈরথ', ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮, পৃ. ১৬০

২. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

৩. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

বলা যায়, শশীর সঙ্গে শীতল সম্পর্ক এবং আত্মোপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে কুসুম গাওদিয়া ত্যাগ করে চিরদিনের জন্য পিত্রালয়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কুসুমের গ্রাম ত্যাগের সংকল্পে শশী অকস্মাৎ কুসুমের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে এবং তাকে গাওদিয়া অবস্থানের জন্য অনুরোধ করে, এবং তালবনে আহবান করে। কিন্তু শশী কিংবা গাওদিয়ার প্রতি সমস্ত সম্পর্কের ইতি টেনে কুসুম পিত্রালয়ে গমন করে। ওদিকে মতিও কুমুদকে সঙ্গে নিয়ে নিরুদ্দেশের উদ্দেশে যাত্রা করে। সমস্ত সহায়-সম্বল, ঘরদোর, জমিজমার মায়া পরিত্যাগ করে গোপাল দাসও রাত্রির অন্ধকারে গাওদিয়া পরিত্যাগ করে। অতঃপর শূন্যভারাক্রান্ত গাওদিয়ার প্রতি, গাওদিয়ার দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষদের ছেড়ে শশীও গাওদিয়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে চায়, গ্রামসেবায় তার আর আগ্রহ থাকে না। কিন্তু যে মানুষ ও মাটির সঙ্গে তার নিয়তি নির্ধারিত সম্পর্ক ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তা প্রত্যাখ্যান করে কলকাতা কিংবা বিলেত যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। শশীর আত্মোপলব্ধি লক্ষণীয় :

> কি আর করিবে শশী, এ ভার তো ফেলিবার নয়। গভীর বিষণ্ন মুখে একে একেযাওয়ার আয়োজনগুলি বাতিল করিয়া দিল। ...গাঁয়ে থাকিতে হইলে হাসপাতালে প্রত্যেক রোগীর নাড়ি টিপিতে না পারিলে শশীর চলিবে কেন? কাজ আর দায়িত্ব ছিল জীবনে, কাজ আর দায়িত্বের জীবনটা আবার ভরপুর হইয়া উঠিল। নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন অপরিবর্তনীয়।[১]

শশীর বন্ধু কুমুদ উন্নতচিত্ত, প্রাণোচ্ছল, উদারহৃদয়; কিন্তু বোহেমীয়। বিদ্যাবুদ্ধি, শিল্পসাহিত্য, আধুনিক ধ্যানধারণায় সে শশীর চেয়েও সে উঁচু মাপের। নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অফুরন্ত প্রাণশক্তি রয়েছে তার। শশী কলকাতা পরিত্যাগের পর কুমুদের সঙ্গে তার একধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। অনেকদিন পরে, অনেকটা আকস্মিকভাবেই সে বিনোদিনী অপেরা পার্টির সঙ্গে সে গাওদিয়া গ্রামে আসে। কুমুদের এই পরিবর্তন শশীকে আলোড়িত করে। ফলে শশী তার অবচেতন সত্তায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রেরণাপ্রাপ্ত হয়।

শশীর বাবা গোপাল দাস এ-উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। গোপাল সুদখোর হলেও গ্রামবাসীর কাছে তিনি বড়বাবু হিসেবে পরিচিত। অর্থ-সম্পদের প্রতি অনৈতিক লোভ, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা ও রূপজ মোহের কারণে তিনি গ্রামজীবনে সমালোচিত ও ঘৃণিত। মানুষকে ঠকিয়ে তিনি নানা পন্থায় অর্থ উপার্জন করেন।

---

১. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩

এককালে তিনি মানুষ কেনাবেচার দালালিও করেছেন। অর্থের বিনিময়ে তিনি গ্রামের তিনজন বৃদ্ধের বিয়ে দিয়েছেন, যাদের একজন যামিনী কবিরাজ। জনশ্রুতি রয়েছে, অর্থের প্রলোভনে তিনি 'থুড়থুড়ে বুড়া' যামিনী কবিরাজের সঙ্গে সুন্দরী সেনদিদির বিয়ে দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> গোপাল দাসের কারবার লোকে বলে গলায় ছুরি দেওয়া। আসলে সে করে সম্পত্তি কেনাবেচা ও টাকা ধার দেওয়া। অর্থাৎ দালালি ও মহাজনি। শোনা যায়, এককালে সে নাকি বার তিনেক জীবন্ত মানুষের কেনাবেচার ব্যাপারেও দালালি করিয়াছে – তিনটি বৃদ্ধের বৌ জুটাইয়া দেওয়া। সে আজকের কথা নয়। বৃদ্ধ তিনজনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হইয়াছে। এখন যামিনী কবিরাজের মরণ হইলেই ব্যাপারটা পুরোপুরি ইতিহাসের গর্ভে তলাইয়া যাইতে পারে।... গ্রামের কলঙ্কিনীদের মধ্যে শশীর সেনদিদির প্রসিদ্ধিই বেশি। গোপালের সঙ্গে তার নামটা জড়ানো হয় বেশি সময়। লোকে নানা কথা বলাবলি করে।[১]

পরবর্তীকালে সেনদিদি ও গোপালকে ঘিরে গ্রামবাসীর মধ্যে নানা সন্দেহ ফেনিয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে গোপালের দায়টাই বেশি। কারণ, তার আচরণ বরাবরই নীতিহীন। তিনি নানা অপকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। তার কারণে বাসুদেব বাড়ুজ্যের পরিবার গ্রামছাড়া হয়েছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, তার এসব অনাচারের অন্তরালে ছিল পুত্র শশীকে গ্রামজীবনে প্রতিষ্ঠা করা। শশী ছাড়াও গোপালের রয়েছে তিন কন্যা – বিন্ধ্যবাসিনী, বিন্দুবাসিনী ও সিন্ধু। বড় কন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর বিয়ে দিয়েছেন বড়গাঁর নায়েব শ্যামাচরণ দাসের পুত্র মোহনের সঙ্গে। মোহনের একটি পা খোঁড়া। মেজ মেয়ে বিন্দুবাসিনীর বিয়ে হয়েছে কলকাতার বড়বাজারের নন্দলাল অ্যান্ড কোং-এর নন্দলালের সঙ্গে। বলা যায়, দুই মেয়েরই বলি হয়েছে তার অনৈতিক লোভ-লালসার কাছে।

মৃত্যুর পূর্বে যাদব পণ্ডিত হাসপাতাল নির্মাণের জন্য তার বাস্তুভিটা ও পনেরো হাজার টাকা শশীর নামে উইল করে দিয়ে যান। এই অর্থ লোপাটের জন্য অনেক চেষ্টা করেন গোপাল। তবে হাসপাতাল পরিচালনার জন্য শশী যে কমিটি গঠন করেন, সেখানে নিজের নাম না দেখে গোপাল মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। নানা অনভিপ্রেত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিশেষে শশী গ্রাম পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলে গোপাল আকস্মিকভাবে গাওদিয়া ছেড়ে চিরকালের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক এলাকা লক্ষণীয় :

> সেই যে গেল গোপাল আর ফিরিল না। সংসারী গৃহস্থ মানুষ সে, সমস্ত জীবন ধরিয়া ফলপুষ্পশস্যদাত্রী ভূমিখণ্ড, সিন্দুক ভরা সোনারূপা, কতকগুলি মানুষের সঙ্গে পারিবারিক ও আরো কতকদুলি মানুষের সঙ্গে

১. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-২৭৬

সামাজিক সম্পর্ক, দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি যত কিছু অর্জন করিয়াছিল সন সে দিয়া গেল শশীকে, মরিয়া গেলে যেমন সে দিত।[১]

যাদব পণ্ডিত ব্যতিক্রমী চরিত্র। ভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে সে গাওদিয়ায় বসতি স্থাপন করে। তিনি সূর্যবিজ্ঞানে বিশ্বাস করেন। গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। শশী যাদব-পরিবারের স্নেহধন্য হলেও তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা ও অলৌকিক ক্ষমতা বিশ্বাস করেন না। যাদব প্রায় শশীর কাছে আধুনিক চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা ও সূর্যবিদ্যার মহিমা ব্যাখ্যা করেন। শশী সূর্যবিজ্ঞানের ক্ষমতা যাচাই করতে কথোপকথনের একপর্যায়ে তাঁর কাছে তাঁরই মৃত্যুক্ষণ জানতে চায়। প্রত্যুত্তরে যাদব রথের দিনে তার মৃত্যু হবে বলে জানান। অবিলম্বে সমস্ত গ্রামে বিষয়টি রটে যায়। অতি আগ্রহী মানুষের তৎপরতায় অবশেষে প্রতিষ্ঠা পায় যে, যে- কোনো রথের দিন নয়, আসন্ন রথের দিনেই দেহ রাখবেন যাদব পণ্ডিত। এমতাবস্থায় শশী যাদবের সম্মান রক্ষার্থে তাঁকে তীর্থে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু যাদব নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, এবং অগ্নিমূর্তি ধারণ করে শশীকে বলেন –

'আমার সঙ্গে তুমি পরিহাস করছ শশী, ঠাট্টা জুড়েছ। আমি ভণ্ডামি আরম্ভ করেছি ভেবে নিয়েছ না? কোনদিন আমাকে তুমি বিশ্বাস কর নি, চিরকাল ভেবে এসেছ আমার সব ভড়ং – লোক ঠকিয়ে আমি জীবন কাটিয়েছি! দুপাতা ইংরেজি পড়ে সবজান্তা হয়ে উঠেছ, এসব তুমি কি বুঝবে? কি তুমি জান যোগসাধনের? তুমি তো ম্লেচ্ছাচারী নাস্তিক।'[২]

অবশেষে রথের দিনেই যাদব আফিম খেয়ে সস্ত্রীক মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু এ মৃত্যু যে যাদব ঘোষিত অলৌকিক মৃত্যু নয় – একথা শশী বলতে পারে না। কারণ 'জনতার ভাবাবেগের স্রোতের সামনে সত্যপ্রকাশে অক্ষম শশীকে তা দেখতে হয়। মিথ্যার কাছে নিঃশেষে পরাজয় হল শশীর। যাদবের পরাজয় ভ্রান্ত অহংবোধের কাছে।'[৩] এ-প্রসঙ্গে শশীর আত্মভাবনা লক্ষণীয় :

সত্যি মিথ্যায় জড়ানো জগৎ। মিথ্যারও মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হইয়াও থাকিতে পারে মিথ্যা। যারা যাদব ও পাগলদিদির পদধূলি মাথায় তুলিয়া ধন্য হইয়াছিল, তাদের মধ্যে কে দুজনের মৃত্যুরহস্য অনুমান করিতে পারিবে? চিরদিনের

১. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩
২. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮
৩. সুমিতা চক্রবর্তী, 'গাওদিয়া গ্রামের শশী ডাক্তার', *উপন্যাসের বর্ণমালা*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৩, পৃ. ৮৯

জন্য এ ঘটনা মনে গাঁথা হইয়া রহিল, এক অপূর্ব অপার্থিব দৃশ্যের স্মৃতি। দুঃখ-যন্ত্রণার সময় এ কথা মনে পড়িবে! জীবন রুক্ষ নীরস হইয়া উঠিলে এ আশা করিবার সাহস থাকিবে যে, খুঁজিলে এমন কিছুও পাওয়া যায় জগতে, বাঁচিয়া থাকার চেয়ে যা বড়। শোক, দুঃখ, জীবনের অসহ্য ক্লান্তি এসব তো তুচ্ছ, মরণকে পর্যন্ত মানুষ মনের জোরে জয় করিতে পারে। কত সংকীর্ণ দুর্বলচিত্তে যে যাদব বৃহতের জন্য, মৃদু হোকপ্রবল হোক, ব্যাকুলতা জাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, শশী তাই ভাবে। যখন ভাবে, তখন আফিমের ক্রিয়ায় যাদবের চামড়া ঢাকিয়া চটচটে ঘাম, বিন্দুর মতো ছোট হইয়া আসা চোখের তারকা আর মুখে ফেনা উঠিবার কতা সে ভুলিয়া যায়।[১]

উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র কুসুম। চৌদ্দ বছর বয়সে পরানের স্ত্রী হিসেবে সে গাওদিয়ায় পদার্পণ করে। দীর্ঘ দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে কুসুম ছিল নিঃসন্তান। তাই তার মধ্যে কোনো সাংসারিক আকর্ষণ তৈরি হয়নি। পিতার আর্থিক সচ্ছলতার কারণে শ্বশুর পরিবারের সবাই তাকে বেশ সমীহ করে। শশীর প্রতি সে ছিল মনেপ্রাণে নিবেদিত। অসুস্থতার অজুহাতে সে তার কাছাকাছি আসতে চায়। শশীর সান্নিধ্যে তার 'শরীর কেমন জানি করে'[২]। তাই নির্জন দুপুরে সে একাকী শশীর ঘরে প্রবেশ করে। তার এই আচরণ যুগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে অবাস্তব মনে হলেও জনৈক সমালোচকের মতে, 'এক্ষেত্রে কুসুমের সাহস এবং পরিসর অনেক বেশি। কুসুমের পরকীয়া সম্পর্কের আচরণ তার গৃহবন্দি জীবনে স্বামীর প্রভুত্বের মধ্যে নয়। তার সম্পর্ক বাইরের পরিসরে। কথাশিল্পী মানিক কুসুমকে ঘরছাড়া করেননি। গৃহের বলয়ের মধ্যে থেকেই কুসুম বেড়ি ভেঙেছে।'[৩] তবে শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক অবস্থান এবং সামাজিক গুণমানের বিচারে কুসুম শশীর সমকক্ষ নয় বলে অবচেতন সত্তায় তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেও চেতনস্তরে শশী নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ফলে কুসুমের মন মরে যায়; এবং একপর্যায়ে সে গাওদিয়া ছেড়ে তার পিত্রালয়ে চলে যায়। কুসুমের চলে যাওয়ার সংবাদে শশী বিপন্ন বোধ করে এবং কুসুমকে গাওদিয়ায় অবস্থানের জন্য অনুরোধ করে। উপরন্তু কুসুমের সান্নিধ্য অর্জনের জন্য সে তার তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। শশী এরপর তার ঘনিষ্ঠতা কামনা করলে কুসুম বলে :

'কতবার নিজে যেচে এসেছি, আজকে ডেকে এনে হাত ধরা-টরা কি উচিৎ ছোটবাবু?'...'আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যেদিন আপনার সুবিধে হবে ডাকবেন, আমি অমনি সুড়সুড় করে আপনার সঙ্গে চলে যাব?

---

১. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১

২. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

৩. সেলিনা হোসেন, *ফিরে দেখা : নোরা ও কুসুম*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ*, *উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

কেউ তা যায়?'... মানুষ কি লোহার গড়া, যে চিরকাল সে একরকম থাকবে, বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।'[১]

কুসুম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, কিন্তু আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নারী। 'প্রেমের মর্যাদা ও আত্মসম্মানের গৌরব নিয়ে কুসুম ভালবাসা পেতে চেয়েছিল। কিন্তু শশীর এই নিরাসক্ত উপেক্ষা বোধকরি কুসুমকে পুতুল ধরে নিয়েই – আর এখানেই কুসুমের প্রতিবাদ।'[২]

উপন্যাসে কুমুদের স্ত্রী মতি। কুমুদের প্রতি তার ভালোবাসা পরিশেষে বিয়েতে গড়ায়। বিয়ের পর এই নবদম্পতি শহরের একটি হোটেলে ওঠে। সেখানে কুমুদের আচরণে মতি প্রভূত্বের আভাস পায়। সে লক্ষ্য করে – 'ছোট-বড় সেবার সুযোগ মতিকে কুমুদ অফুরন্তই দিয়াছে, মতি চা করে, খাবার দেয়, তৃষ্ণার জল জোগায়। দাড়ি কামানোর আয়োজন করে, ক্ষুর ধুইয়া সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখে, কুমুদের টেরিও মতিই কাটে, দিয়াশলাই-সিগারেট প্রভৃতি যোগান দেয়। আরো কত কী মতি করে।'[৩] কুমুদের স্পর্শে ও সান্নিধ্যে গেঁয়ো মেয়ে মতি বদলে যেতে শুরু করে। কুমুদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সে হয়ে ওঠে নিখাদ সহযোগী। পরিবর্তিত মতিকে দেখে শশী বিস্মিত হয়ে যায় :

মতিকে দেখিয়া সে বাক্যহারা হইয়া গেল। এই মতি কি তার চোখের সামনে বড় হইয়াছিল গাওদিয়ার গ্রাম্য আবহাওয়ায়? এ যেন শশীর অচেনা মেয়ে, অজানা জগতে এতকাল বাস করিয়া আজ প্রথম তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া হাবার মত যে চাহিয়া থাকিত, জলে-ধোয়া আলোর মতো কি স্নিগ্ধোজ্জ্বল তার চাহনি এখন! কি ভারি চলন মতির, কি রমণীয় তার ভঙ্গিমা! মতির অঙ্গুলি-হেলনও যেন মধু, অর্থময়। মনে হয় তার দেহ-মন যেন অহরহ কার আকর্ষণ ও আহ্বানের জন্য প্রতিটি মুহূর্তে উদ্যত, উৎকর্ণ হইয়া আছে।[৪]

কুমুদের সাহচর্যে গ্রামের মেয়ে মতি ক্রমশ বদলে যায়। দায়িত্বজ্ঞানহীন কুমুদ তাকে গাওদিয়ায় পাঠাতে চাইলেও মতি তার যাযাবর স্বামীর সান্নিধ্যকেই জীবনের কাম্যবস্তু মনে করে।

বিন্দু চরিত্রটি লেখকের স্বতন্ত্র সৃষ্টি। পিতা গোপালের চাতুর্যে কলকাতার পাট ব্যবসায়ী নন্দলালের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিবাহোত্তরকালে নন্দলাল গাওদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। বরং প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে সে

---

১. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬

২. সমরেশ মজুমদার, 'চরিত্রচিত্রণ', *পুতুলনাচের ইতিকথা*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৭, পৃ. ১৭৮

৩. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

৪. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

বিন্দুকে কলকাতার একটি বাড়িতে আটকে রাখে, মদ্যপানে বাধ্য করে। ক্রমশ বিন্দুও এই মরণ-নেশায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে; মদের মধ্যে সন্ধান করে জীবনের নির্বাণ। শশী তাকে এই জীবন থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য গাওদিয়ায় নিয়ে আসলেও বিন্দু স্বস্তি পায় না। মদ্যপানের জন্য সে দিশেহারা ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শশীর দৃষ্টিকোণ উৎসারিত ভাবনা লক্ষণীয় :

> একদিন হয়তো সাঁড়াশি দিয়া দাঁত ফাঁক করিয়া তাহাকে নন্দর ও জিনিসটা গিলাইতে হইয়াছিল, আজ মদ ছাড়া বিন্দুর চলে না। তাছাড়া, শুধু মদের নেশা নয়, সাত বছর ধরিয়া নন্দ তাহাকে যে উত্তেজনায় অস্বাভাবিক জীবন দিয়াছিল, সেই জীবনও বিন্দুর অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিপুল বিকারগ্রস্ত বিরহ তো শুধু নন্দর জন্য নয় – লজ্জাকর বিলাসিতার জন্য, সঙ্গীত ও উন্মত্ততার জন্য। গ্রামের বৈচিত্র্যহীন স্তিমিত নিস্তেজ জীবন বিন্দুর সহিতেছে না।[১]

একপর্যায়ে নন্দলাল বিন্দুকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও সে অসম্মতি জানায়। কারণ এতদিনে সে সংসার জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। 'গাওদিয়া গ্রামের সহজ-সরল বালিকা বিন্দুর পরিণতি অসঙ্গত সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামো ও নির্দয় পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ফল। উত্তরকালে বিন্দুর আচরণ তার জীবনের হয়ে ওঠা সত্য নয়। এক বিকৃত সময় ও পরিস্থিতির শিকার বিন্দু।'[২] অবক্ষয় জর্জরিত পুরুষশাসিত সমাজের নির্মমতার শিকার এই বিন্দু।

যাদব পণ্ডিতের স্ত্রী পাগলদিদির প্রসঙ্গও রয়েছে। তিনি সহজ-সরল নির্ভেজাল জীবনে অভ্যস্ত একজন গ্রামীণ নারীর প্রতিনিধি। আনমনা স্বভাবের বলে গ্রামবাসী তাঁকে 'পাগলাদিদি' বলে সম্বোধন করে। শশীর প্রতি তাঁর স্নেহমমতা অকৃত্রিম। এ উপন্যাসে তিনি আফিম খেয়ে স্বামীর সঙ্গে আত্মহত্যা করেছেন; সহমৃতা হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি কেবল স্বামী যাদবকেই অনুসরণ করেছেন, নিজের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি।

এসব চরিত্র ছাড়াও কিছু পরিপ্রেক্ষিতের চরিত্র রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনি হয়ে উঠেছে গতিময়। এই চরিত্রসমূহ হচ্ছে – হারুর স্ত্রী মোক্ষদা, হারুর বোন, বোনঝি বুঁচি, ছেলে পরাণ, পরাণের শ্বশুর, গোপালের সংসারের কুন্দ, জমিদার শীতল বাবু, তার বাড়ির যাত্রাদর্শক মেয়েরা, শ্রীনাথের দোকানে

---

১. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

২. চঞ্চল কুমার বোস, *মানিক-সাহিত্যে মাতাল চরিত্র*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

এবং সামনের বাঁধানো গাছতলায় সমবেত গ্রামের মানুষেরা, বাসুদেব বাড়ুজ্যের বাড়ির মেয়েরা, মৃত বালক ভুতো, মাঝি গোবর্ধন, জেলে নবীন, হাসপাতালের রোগী, বাজিতপুরের উকিল বাবু, জয়া ও বনবিহারী প্রমুখ।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে লেখক সমাজবাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন। গাওদিয়ার গ্রামীণ সমাজ সংকীর্ণতা, হানাহানি ও দলাদলিতে পূর্ণ। তাদের জীবন কুসংস্কারাচ্ছন্ন। গাওদিয়ার পল্লিজীবনের চিত্র শশীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে :

> শেষরাত্রে ঢেঁকির শব্দে ঘুম ভাঙিয়া যায়। তখন হইতে সন্ধ্যার নীরবতা আসিবার আগে কায়েতপাড়ার পথের ধারে বটগাছটার শাখায় জমায়েত পাখির কলরব শুরু হওয়া পর্যন্ত বন্য ও গৃহস্থ জীবনের যত বিচিত্র শব্দ শশীর কানে আসে সব যেন ঢাকিয়া যায় যামিনীর হামানদিস্তার ঠুকঠুক শব্দে আর গোপালের গম্ভীর কাশির আওয়াজে। বাড়িতে মেয়ে–পুরুষ হাসে, কাঁদে, কলহ করে, বাহিরে যুবক ও বৃদ্ধের দল তাস খেলে, আড্ডা দেয়, চাষী মজুর গয়লা কুমোর সেকরা জেলে দোকানি এরা ছাড়া অলস অকর্মণ্যতার অতিরিক্ত ভদ্র পেশা যাদের আছে আঙুলে গুনিয়া ফেলা যায়। শ্রীনাথের দোকানে লালচে আলোয় কীর্তি নিয়োগীর মাথার তেলমাখা আবটি চকচক করিতে দেখিলে নৈশ আকাশের তারা ও চাঁদের আলোর দিকে চাহিতে শশীর লজ্জা করে। বাগ্দীপাড়ার জেল-ফেরত কয়েকজন বীরপুরুষ রাতদুপুরে পরস্পরের মাথা ফাটাইয়া দেয়, শশীর হাতের বাঁধা ব্যাণ্ডেজ তাহাদের খোলা হয় জেলের হাসপাতালে।[১]

এই চিরাচরিত একঘেয়ে জীবন থেকে কেউ-কেউ বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু হাজার বছর ধরে যে আচরিত প্রথা-পদ্ধতি গ্রামীণ জনপদকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে সেখান থেকে তাদের বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। আবদ্ধ ও অবরুদ্ধ জীবন হয়ে ওঠে তাদের নিয়তি।

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে হারুঘোষের বজ্রাঘাতে মৃত্যু, যাদব পণ্ডিত-পাগলদিদির ইচ্ছামৃত্যু, সেনদিদির মনোজাগতিক রূপ-রূপান্তর, মতি-কুসুমের বিচিত্র চিত্তচাঞ্চল্য সবকিছুর মধ্যে এক অব্যাখ্যাত রহস্য ক্রিয়াশীল থাকায় অনে সমালোচকই অদৃশ্য নিয়তিকেই সমস্ত ঘটনার নিয়ন্ত্রক বলে বিবেচনা করেছেন। গাওদিয়ার জনজীবনে বসবাস সত্ত্বেও যে রহস্যময় মানবজীবনের অন্তর্লোক শশী নিরূপণ করতে পারেনি, সে রহস্যসংসক্ত শক্তি অনিবার্যভাবেই নিয়তি। উপন্যাসে কুসুমের পিতা অনন্তের বিষণ্ন উক্তিতে উঠে এসেছে এই নিয়তির স্বরূপ :

---

১. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

> সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বৈ তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।[১]

যে-শক্তিকে সাধারণ বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করা চলে না, এবং যে-শক্তিকে মানববুদ্ধিতে নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব, সে-শক্তিই অনিবার্যভাবে নিয়তি। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতঃপূর্বে রচিত ও প্রকাশিত দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের পরিণাম ও প্রতিপাদ্য নিয়ন্ত্রণে স্পষ্টতই লিবিডোকেই মানব প্রবৃত্তির প্রাণশক্তিরূপে বিবেচনা করেছেন। *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শশী শহুরে শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক; একদিকে স্বপ্নকল্পনা অন্যদিকে বিচার-বিবেচনা ও বিষয়বুদ্ধি শশী চরিত্রের দুই বিপরীত প্রান্ত। এরকম স্বপ্নকল্পনাময় অথচ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন শশী ডাক্তার শহর কলকাতার আড়ম্বরপূর্ণ জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যাবর্তন করে অভাব-অনটনগ্রস্ত গ্রামীণ জীবনে। গ্রামজীবনে চিকিৎসাসূত্রে আকাঙ্ক্ষিত অর্থোপার্জন যে অসম্ভব, তা শশীর অজানা নয়। পিতার ইচ্ছায় ও তাগিদে গ্রামে এলেও সে প্রতিষ্ঠার অজুহাতে যে- কোনো সময় শহর জীবনে স্থিত হতে পারতো। কিন্তু শশী তা করেনি। যে অদৃশ্য শক্তির টানে শশী গ্রাম পরিত্যাগে অক্ষম, সে-শক্তি কোনো কোনো সমালোচকের দৃষ্টিতে ফ্রয়েডীয় লিবিডো। এই শক্তির টানে সে কখনো আশাবাদী হয়েছে, আবারকখনো বা নিক্ষিপ্ত হয়েছে হতাশার অতল গহ্বরে।

গাওদিয়ার জীবনে মতি-কুসুম-সেনদিদি শশীকে সময়ে-অসময়ে আন্দোলিত করেছে। এদের প্রতি শশী তার অবচেতন হৃদয়ের গুহাস্তরে লালন করেছে অদম্য এক আসক্তি। কিন্তু বসন্ত রোগাক্রান্ত সেনদিদি শ্রীহীন হয়ে গেলে, কুমুদের সঙ্গে বিয়ের পর মতি কলকাতায় চলে গেলে এবং অবিরাম প্রণয় নিবেদনে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে ধ্বস্ত ও ক্লান্ত কুসুম গাওদিয়া পরিত্যাগ করলে শশী এক বিবর্ণ ও প্রাণহীন জীবনে নিক্ষিপ্ত হয়। বিশেষত যে তালবনে কুসুমের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য শশী অবচেতন মনে প্রায়ই ছুটে যেতো, সে তালবনও শশীকে আর টানে না।

> জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে। ... তালবনে শশী কখনো যায় না। মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।[২]

পুতুলনাচের ইতিকথা রচনা প্রসঙ্গে মানিক বলেছিলেন, অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের চোরামোহ থেকে মুক্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি *পুতুলনাচের ইতিকথা* রচনার প্রয়াস পেয়েছেন, সেহেতু এ-উপন্যাসে

---

১. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২

২. *পুতুলনাচের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩

নিয়তিবাদ কিংবা লিবিডোর ভূমিকাকে প্রধান করে দেখা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে এ-উপন্যাস মানুষ ও গ্রামীণ জনপদকে ভালোবেসে সেই জীবনে শশী চরিত্রের স্থিত হওয়ার অসামান্য আখ্যান। কলকাতা ও গাওদিয়া অর্থাৎ কেন্দ্র ও প্রান্তের দ্বন্দ্বে পরিশেষে শশীর অস্তিত্বমূলে গাওদিয়া কীভাবে গ্রন্থিত হয়ে যায় তারই ইতিবৃত্ত *পুতুলনাচের ইতিকথা*। উপনিবেশিত সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তিচিত্তে এই দ্বন্দ্ব কেমন ছিল তা শশী চরিত্রের দ্বন্দ্বময় টানাপড়েনের মধ্যেই সুপ্রত্যক্ষ। উপন্যাসের উপসংহার পর্যায়ে পিতা গোপালের গাওদিয়া পরিত্যাগ সূত্রে গাওদিয়া থেকে পলায়নোন্মুখ শশীর আত্মোপলব্ধি 'এ ভার তো ফেলিবার নয়', কিংবা 'কাজ আর দায়িত্ব ছিল জীবনে, কাজ আর দায়িত্বের জীবনটা আবার ভরপুর হইয়া উঠিল' – সূত্রে এই সত্য বিজ্ঞাপিত হয় যে, শশী এক দ্বন্দ্বময় জীবনোপলব্ধিতে উত্তীর্ণ চরিত্র। জনৈক সমালোচক তাই বলেছেন :

এই উপন্যাসটি মূলত স্ববিরোধিতায় দীর্ণ এক গ্রামীণ জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবীর আত্মপ্রতারণার এবং সব শেষে আত্মবিনির্মাণ সূচনার আখ্যান। উপন্যাসের নামে যে-ইঙ্গিতই থাকুক, অন্যান্য কুশীলবদের পুতুলনাচের ইতিবৃত্ত ঔপন্যাসিকতার মুখ্য আধেয় নয়। শশীর প্রকিতারহীন আত্মসৃষ্ট সংকটের গ্রন্থি রচনা আর গ্রন্থিমোচনের প্রয়াস আখ্যানের মূল উপজীব্য। যেহেতু অপরতার বোধ ছাড়া অস্তিত্বচেতনার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, অন্য সব কুশীলবেরা সমান্তরাল অপর সত্তাদের সংগঠন দিয়ে উপন্যাসের পরিসরকে পূর্ণতা দিয়েছে।[১]

পুতুলনাচের ইতিকথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুমাত্রিক বাচনের বহুস্বরিক প্রত্যয় হলেও এ-উপন্যাসের উপনিবেশিত জীবন ও সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিচিত্তের বিচিত্র টানাপড়েনের বিষয়টি প্রধান প্রতিপাদ্য হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে।

পদ্মানদীর মাঝি

পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)[২] উপন্যাসে সমকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার চিত্রাঙ্কনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। *পদ্মানদীর মাঝি* পদ্মাতীরবর্তী অন্ত্যজ ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনালেখ্য নিয়ে লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসে তিনটি প্রতিপাদ্য সন্নিবেশন করা হয়েছে। প্রথমত–এক থেকে তিন পরিচ্ছেদ পর্যন্ত পদ্মা নদী নির্ভর কেতুপুরবাসীর জীবনাচার, দ্বিতীয়ত–চতুর্থ পরিচ্ছেদে কুবের কপিলার অসম আখ্যান, তৃতীয়ত–হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গ। এ তিনটি

---

১. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'পুতুলনাচের ইতিকথা : প্রত্যাবর্তনের সন্দর্ভ', উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৭২

২. 'সজনীকান্ত প্রদত্ত তথ্যে জানা যায়, পদ্মানদীর মাঝির প্রকাশকাল ২ মে, ১৯৩৬। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ্যান্ড সন্স, কলকাতা। ... গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত পূর্বাশা মাসিকপত্রে ১৯৩৪-এ উপন্যাসটির কয়েকটি কিস্তি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।' (দ্রষ্টব্য : সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ : ১৯৯৯, পৃ. ৪৩)

প্রতিপাদ্যের একটির সঙ্গে আরেকটির অমিল বিস্তর হলেও *পদ্মানদীর মাঝি* হয়ে উঠেছে পদ্মা তীরবর্তী ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনাচারের অখণ্ড প্রামাণ্য দলিল। 'এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে ধীবর জনগোষ্ঠীর যে বিস্তৃত আখ্যান তার মর্মমূলে শোষণ ও দারিদ্র্যের রূপটি অত্যন্ত প্রকট। কুবের, গণেশ, রাসু, সিধুর সংসারচিত্রই তার প্রমাণ। প্রান্তিক এই লোকসকলের বসবাসের ক্ষেত্রটিও যেমন গ্রামের মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন তেমনি সংকীর্ণ পরিসরবিশিষ্ট।[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত গতানুগতিকতাকে পরিহার করে নতুন এক পথ বিনির্মাণ করেন। *পদ্মানদীর মাঝি*তে তিনি পূর্ব বাংলার পদ্মানদীর তীরবর্তী অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য, শ্রমজীবী ও সংগ্রামশীল ধীবর সম্প্রদায়ের বাস্তব জীবনালেখ্য বেছে নেন। এ উপন্যাসে কেতুপুরের মাঝিদের জীবন-জীবিকা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, ঔদার্য-সংকীর্ণতা ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। উপন্যাসটি রচনার মাধ্যমে তিনি মধ্যবিত্তের বাইরে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বৃহৎ সামাজিক পটভূমির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন :

> *পদ্মানদীর মাঝি*তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের পটভূমি ও পরিসরগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেন এবং কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মানসদৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করেন পূর্ববাংলার পদ্মাতীরবর্তী অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য-অবজ্ঞাত শ্রমজীবী সংগ্রামশীল ব্রাত্য ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনের পট-পরিসরে। *পদ্মানদীর মাঝি* রচনার প্রাক-পরিসরে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের সজাগতা দুর্লক্ষ্য হলেও *পদ্মানদীর মাঝি*তে বাংলা উপন্যাসের অভিজ্ঞতার সীমা বিস্তৃত হয়েছে। উপন্যাসবিধৃত জীবন ও চরিত্রপুঞ্জকে অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করার কৃতিত্বে এ-উপন্যাসে ব্যতিক্রমধর্মিতা প্রদর্শন করেছেন লেখক।[২]

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস লেখার আগে তিনি অনেক দিন অন্তরঙ্গভাবে জেলেদের মধ্যে কাটিয়েছেন। এ উপন্যাসে পদ্মানদী বিধৌত কেতুপুর অর্থাৎ কুবেরের গ্রাম, তার শ্বশুরবাড়ি চরডাঙা, কপিলার শ্বশুর বাড়ির গ্রাম আকুর-টাকুর, গঞ্জ-শহর আমিনবাড়ি – এই সব মিলিয়ে একটা বিশেষ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেইসঙ্গে উঠে এসেছে সোনাখালি গ্রামে উদযাপিত রথের মেলা এবং ময়না দ্বীপের প্রসঙ্গ। তবে মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে কেতুপুরের জেলেপাড়াকে ঘিরেই। এ প্রসঙ্গে শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক, কথাশিল্পী মানিক, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৮৮

২. গিয়াস শামীম, *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৫, পৃ. ১৩-১৪

> ...উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণ রূপে নিম্নশ্রেণি অধ্যুষিত গ্রাম্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমা নির্দেশ। এই ধীবর পল্লীর জীবন যাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত হয় নাই।[১]

সাতটি পরিচ্ছদে বিন্যস্ত *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের ঘটনাংশ এরকম : পদ্মা নদীর তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের জেলেপাড়ায় বসবাস করে কুবেরসহ আরও অনেকে। তাদের জীবন দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। কুবেরের স্ত্রী মালা আজন্ম পঙ্গু। ছেলে ও মেয়ে নিয়ে কুবেরের সংসার। এ সংসারে কুবেরই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। সে সহজ-সরল-নিরীহ কিন্তু নিয়তিচালিত। নদীতে মাছ ধরার উপযুক্ত তার নিজের কোনো নৌকা বা জাল নেই। অন্যের নৌকা ও জাল দিয়ে সে পদ্মার বুকে মাছ ধরে সংসার চালায়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন তার প্রত্যাশিত হলেও সে নিরুপায়। তার মতোই জীবন যাপন করে কেতুপুরের গণেশ, ধনঞ্জয়, শ্যামাদাস, গোপী, যদু, পীতম মাঝি, লখা, চণ্ডী, পাঁচী, সিধুদাস, জহর, উলুপী, অধর, বৈকুণ্ঠ, বঙ্কু, এনায়েত, বসীর, হিরু, নকুল, আমিনুদ্দি, রাসু, মুরারি, নকুল, চালানবাবু, কেদারনাথ এবং আরও অনেকে। এদের সঙ্গে ভিন্ন অঞ্চল থেকে রহস্যময় হোসেন মিয়া এসে তাদের ঘিরে আলো-আঁধারি জীবন-যাপন শুরু করে। এরা রক্তে-মাংসে বাস্তবতাসমৃদ্ধ জীবন্ত মানুষ। সামাজিক পরিমণ্ডলে বিচরণকারী এ সকল মানুষ সমাজসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে সরোজমোহন মিত্রের বক্তব্য স্মরণযোগ্য :

> তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি অতিক্রম করে বাস্তবতার সঙ্গে এক গভীর ও সর্বজনীন সাংকেতিকতার সফল সংমিশ্রণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। লেখক দার্শনিক না হয়েও প্রকৃত দ্রষ্টা ছিলেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির গুণে তিনি এ সকল মাঝি মানুষের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যেখানে তারা কেবল পূর্ববঙ্গের দরিদ্র ধীবর তো নয়, বিশ্বজগতের শ্রমকাতর ক্ষুধার্ত পদদলিতের প্রতিনিধি।[২]

---

১. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ : ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১৬

২. সরোজমোহন মিত্র, *পদ্মানদীর জেলেজীবন ও ময়নাদ্বীপ*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজীজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯ মে ২০০৮, পৃ. ১৯১

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে বর্ণিত জেলেপাড়ার জীবন-পরিবেশে জীবনধারণের সুযোগ-সুবিধা যৎসামান্য। এখানে নাগরিক সুবিধা নেই বললেই চলে; নেই যানবাহন এবং চলাচলের উপযোগী প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট। যাতায়াতের একমাত্র বাহন নৌকা। এই শ্রীহীন সমাজব্যবস্থার মধ্যে কুবেরদের জীবন আবর্তিত। জীবন বাস্তবতার এই জীবন্ত চিত্রই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর এ উপন্যাসে। কুবেরের নিত্য জীবন-যাপন নিয়ে লেখকের উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> শরীরের দিকে তাকাইবার অবসর কুবেরের নাই। টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এবারও সে জমা লইতে পারে নাই। সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এ নির্ভরও বিশেষ জোরালো নয়, পদ্মার মাছ ধরিবার উপযুক্ত জাল তাহার নাই। ধনঞ্জয় অথবা নড়াইলের যদুর সঙ্গে সমস্ত বছর তাহাকে এমনিভাবে দু-আনা, চার-আনা ভাবে মজুরি খাটিতে হইবে।[১]

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে কুবের-গণেশ ও ধনঞ্জয়দের জীবিকার প্রধান-উৎস মাছ-শিকার। সমপেশার লোক হলেও কুবের-গণেশের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের আর্থিক অবস্থার মধ্যে ব্যাপক তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। ধনঞ্জয়ের নৌকা আছে, মাছ ধরার জাল আছে, কিন্তু কুবের-গণেশের নেই। 'গরীবের মধ্যে তারা গরীব, ছোট লোকের মধ্যে আরো বেশি ছোটলোক'। আর এই লোকগুলো সমাজে অর্বাচীন। তাই 'প্রতিরাত্রে কষ্টার্জিত মাছের অর্ধেক কুবের-গণেশ আর বাকি অর্ধেক পায় ধনঞ্জয়।' আবার অনেক সময় মাছ গণনায়ও ধনঞ্জয় তাদের দুজনকে ঠকায়। প্রভাবশালীরা যে অধিক সম্পদ অর্জনের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রবলভাবে প্রতারণার আশ্রয় নেয় তা এ-উপন্যাসে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটিই এতদঞ্চলের বাস্তবতা। এ প্রসঙ্গে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বক্তব্য স্মরণযোগ্য :

> নৌকার মালিক হওয়ার জন্যই কুবের ও গণেশকে না ঠকিয়ে তার (ধনঞ্জয়) উপায় নেই, তার ঐ একটুখানি আর্থিক সঙ্গতিই তাকে ওদের ঠকাবার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সস্তা মাছ ছাড়া আর কিছু হাতাবার ক্ষমতা ঐ নিম্ন–মধ্যবিত্ত লোকটির জীবনেও হবে না এবং এই দায়িত্ব পালনে তার টার্গেট সব সময়েই নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী মানুষ।[২]

---

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, *উপন্যাস সমগ্র*, *প্রথম খণ্ড*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৯২

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগী চোখের স্বপ্ন', ঘনশ্যাম চৌধুরী (সম্পা.) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় – সমগ্রতার সন্ধানে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৪৯

উপন্যাসে দেখা যায়, ধনঞ্জয়ের তুলনায় কুবের ও গণেশের পরিশ্রমও বেশি। এতো পরিশ্রমের পরও তারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে, তাদের জীবনে আকাঙ্ক্ষিত সুখ কখনোই আসে না। প্রতিনিয়ত তারা দুর্দশা ও দুশ্চিন্তার মধ্যেই দিন কাটায়। আবার বর্ষা মৌসুমে মাছ ধরে দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা হলেও অন্যসময় তাদের দুর্দশা চরমে ওঠে –

> ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে যে তাহার মীনসন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নদীর মালিককে খাজনা দিয়া হাজার টাকা দামের জাল যাহারা পাতিতে পারে তাহাদের স্থান ছাড়িয়া দিয়া, এতবড় পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করা তার মত গরিব জেলের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধনঞ্জয় যদুর জোড়াতালি-দেওয়া ব্যবস্থায় যে মাছ পড়ে তার দু-তিন আনা ভাগে কারো সংসার চলে না। উপার্জন যা হয় এই ইলিশের মরসুমে। শরীর থাক আর যাক, এ সময় একটা রাত্রিও ঘরে বসিয়া থাকিলে কুবেরের চলিবে না।[১]

উপন্যাসে জেলেপাড়ার অনেকগুলি পরিবারের বাস্তব জীবনালেখ্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গরিবিই তাদের প্রধান সমস্যা। দারিদ্র্যের কারণে কুবের হোসেন মিয়ার পকেট থেকে সামান্য পয়সা চুরি করে। কুবের জমিদারের নায়েব শীতলের কাছে সামান্য কিছু বাড়তি আয়ের জন্য চুরি করে মাছ বিক্রি করে– কিন্তু শীতল 'পয়সা কাল দেব' বলে চলে যায়। কুবের সে অর্থ আর কখনো পায় না। সকলের কাছেই কুবেররা শোষণ-বঞ্চনা আর প্রতারণার পাত্র। অর্থনৈতিকভাবে এ দরিদ্রশ্রেণির মানুষেরা কেবল জমিদার- জোতদার-মহাজন কর্তৃক বঞ্চিত হয়নি – তারা তাদের অধস্তন কর্মচারীদের দ্বারাও প্রতারিত হয়েছে।

পদ্মা-তীরবর্তী কেতুপুরে জীবনধারণের সুযোগ-সুবিধা একেবারেই অপ্রতুল। এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। চলাচলের জন্য কোনো ভালো সড়ক বা যানবাহন নেই, গ্রামে যাওয়ার একমাত্র ব্যবস্থা নৌযান। বর্ষাকালে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা অকল্পনীয় দুঃখ-দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। কেতুপুরের ঘরবাড়িও জৌলুশহীন। দৈন্যপীড়িত কুটিরের মধ্যে তাদের বসবাস; জীবনযাপন। জেলেপল্লির অবস্থান গ্রামের বাইরে; পূর্বদিকে। মূল গ্রাম থেকে তারা অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। এর কারণ, গ্রামের 'ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর মানুষগুলো তাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে।' গ্রামে জমির সংকট নেই 'তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওটুকুই।' এ গ্রামে যেন তাদের অধিকার নির্ধারিত।

---

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে পদ্মা তীরবর্তী কেতুপুরের মানুষগুলো জেলে ও মাঝি। তাদের জীবন নদী নির্ভর। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য তাদের নিত্য সঙ্গী। তাদের প্রতি এ অবহেলা-বঞ্চনা-অবজ্ঞা সমাজসৃষ্ট। নিম্নশ্রেণির এ-মানুষগুলো ঈশ্বরের সঙ্গ-সান্নিধ্য থেকেও একেবারেই বঞ্চিত। এদের এই বঞ্চনার চিত্রটি ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন এভাবে :

> জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কনকন। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকিবার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পঁচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।[১]

কেতুপুর গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই কম-বেশি কর্মজীবী। তাদের কেউ কেউ পদ্মায় মাছ ধরে আবার কেউবা যাত্রী ও মালবাহী নৌকা চালায়। আর এসব মানুষের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র কুবের। সে একজন গরিব ও সরল সোজা মনের মানুষ। তার নিজস্ব কোনো জাল নেই, নৌকা নেই। অন্যের নৌকায় সে মাছ ধরে। এজন্য সারারাত পরিশ্রম করে সে যে পরিমাণ মাছ ধরতে সক্ষম হয় তার অর্ধেক তাকে দিয়ে দিতে হয় জাল ও নৌকার মালিককে। সারা বছর তাকে পদ্মার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তাই বর্ষাকালে ইলিশের মৌসুমে শতকষ্টের মধ্যেও রাত জেগে মাছ ধরে। কারণ এ সময় এক রাত্রিও ঘরে বসে থাকলে চলে না কুবেরের। এই অসহায় অবস্থা শুধু তার একার নয়, এ অবস্থা কেতুপুরের সব জেলেদের। এরপরও রয়েছে ধনঞ্জয়ের মত নৌকার মালিকদের প্রভাব। একারণে তাদের আলো-বাতাসহীন অন্ধকার ঘরবাড়ির চিত্র একেবারেই দারিদ্র্যব্যঞ্জক। অন্তহীন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেই তাদের জীবনধারণ করতে হয়। জীবনের এই ধারা একেবারেই একপেশে ও গতানুগতিক। এ প্রসঙ্গে আবু হেনা মোস্তফা কামালের বক্তব্য স্মরণীয় :

> মাত্রাতিরিক্ত শ্রম ও দুর্বিষহ দারিদ্র্যের গতানুগতিকতায় এই জেলে সমাজের জীবনে প্রেম ভালোবাসার আগমন ও নিষ্ক্রমণ দুই-ই ঘটে নিঃশব্দে। মেয়েরা এগারোতেই বিবাহযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। স্বামীরবয়স

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫-১৯৬

বেশি হলেও আপত্তি নেই যদি তার সচ্ছলতা থাকে। কনের অবয়ব নিখুঁত হলে তার পিতা বরের কাছে চড়া দাম হাকে – তিন কুড়ি থেকে পাঁচ কুড়ি টাকা। তারপর তারা নিয়মিত রান্না করে। সংসার দেখাশোনা করে, সন্তান জন্ম দেয়।[১]

কেতুপুরের জেলেদের সকলের অবস্থা প্রায় একই রকমের। কুবের-গণেশের ঘরে খাবার থাকে না। খাবারের প্রয়োজনে ময়নাদ্বীপে পাড়ি জমায় রাসু। সিধুও গরিব। চুরি, ভিক্ষা ও প্রতারণা করে তার কায়ক্লেশে জীবন চলে। এদিকে কৃষকের মনেও শান্তি নেই। বর্ষায় কৃষকের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তাদেরও ধানের অভাব, টাকার অভাব। এদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামও বেড়ে যায়। ক্ষুধা নিবৃত্তিও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। চরম নিঃস্বতাই হয়ে ওঠে তাদের অবলম্বন। লেখক তাদের এ জীবনাচার তুলে ধরেছেন এভাবে :

কুবের গম্ভীর চিন্তিত মুখে ভাবিতে লাগিল, এবার কি করিবে। মাঝিগিরিই করিবে সন্দেহ নাই, তবু অন্য কিছু করা যায় কিনা ভাবিতে কুবের চিরদিন ভালোবাসে।...পরিপূর্ণভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি আর হইতেছে না। সময়টা পর্যন্ত পড়িয়াছে খারাপ। জিনিসপত্রের দাম চড়িয়া গিয়াছে। বর্ষায় একটা ফসল নষ্ট হইয়াছিল, পাটের কল্যাণে আমন ধানের ফসলও হইয়াছে কম। চাষিদের ঘরে ধান নাই, টাকাও নাই, আছে পাট – কুবেরের ঘরে কিছুই নাই। পাটের উপর চাষির মরণ-বাঁচন, কুবেরের জীবনধারণ সুনিশ্চিত মাঝিগিরিতে– সেটা ভালো মত জুটিতেছে না। একটা নৌকা যদি কুবেরের থাকিত! পদ্মার ঘাটে ঘাটে তবে সে কুড়াইয়া বেড়াইতে পারিত জীবিকা, পরের নৌকায় লগি ঠেলিতে পাইবার ভরসায় বসিয়া থাকিতে হইত না।[২]

কিন্তু কুবের বড় অসহায়। তাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। তার শ্বশুর বাড়ির অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল হলেও তারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে না। স্বগ্রামের লোকজন কিংবা আত্মীয়স্বজনেরকাছ থেকেও সে কোনো সহযোগিতা পায় না। তবে গণেশের ঘরে চাল থাকলে সে তাকে চাল ধার দেয়। কিন্তু হীরু বা যুগল দেয় না। এই তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপন।

কেতুপুরের জেলেদের ঘরগুলো বেশিরভাগই খড়ের তৈরি। এমন কি কোনো ঘরের ছাউনি এত অল্প ছন বা খড় দিয়ে তৈরি যে, অতি অল্প বৃষ্টিতেই ঘরের ভেতরে পানি পড়ে। তাদের ঘরে তেমন আসবাব-পত্রও নেই, আছে শুধু বাঁশের মাচা। এরই মধ্যে কুবেরের স্ত্রী মালার সন্তান হয়। সে সন্তান জন্মদানের সময় ছিন্ন মাদুর চট

১. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি', ভূঁইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ২৩

২. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

প্রভৃতির মাধ্যমে তৈরি আঁতুড়ঘরেঅবস্থান করে। লেখকের বর্ণনায় জেলেপাড়ার বাস্তব অবস্থা ফুটে উঠেছে এভাবে :

> এক) ... বেড়া দেওয়া ছোট একটি উঠানের দু'দিকে দু'খানা ঘর, কুবেরের বাড়ির এর বেশি পরিচয় নাই। এদিকের ঘরের সংকীর্ণ দাওয়ায় একটা ছেঁড়া মাদুর, চট প্রভৃতি দিয়া ঘেরিয়া লওয়া হইয়াছে। চাহিলেই বুঝিতে পারা যায় ওটি আঁতুড়ঘর।[১]
>
> দুই) ... পিসি দাওয়ার একদিকে ইলিশ মাছের তেলে ইলিশ মাছ ভাজিতেছে। অন্যপাশে মালার আঁতুড়। নিচু দাওয়ায় মাটি জল শুষিয়া শুষিয়া ওখানটা বাসের অযোগ্য করিয়া দিয়াছে, তবু ওইখানেই ভিজা স্যাঁতস্যাতে বিছানায় নবজাতক শিশুকে লইয়া মালা দিবারাত্রি যাপন করিবে উপায় কী? যে নোংরা মানুষের জন্মলাভের প্রক্রিয়া! বাড়তি ঘর থাকিলেও বরং একটা ঘর অপবিত্র করিয়া ফেলা চলিত। দু'খানা কুঁড়ে যার সম্বল তার স্ত্রী আর কোথায় সন্তান জন্ম দিবে?[২]

তাইতো নিয়তিচালিত কুবের দারিদ্র্যের কারণে মালার পুত্রসন্তান জন্মদানের সংবাদেও খুশি হতে পারেনি। কুবের মনে করে, অভাব যার নিত্য সঙ্গী, তার পুত্রসন্তান হলেই কি এমন সুবিধা! বরং তার ভোরণপোষণ নিয়েই সে বেশি চিন্তিত। কিন্তু কুবেরের পুত্রসন্তান হওয়ায় গণেশ আনন্দিত। আর এ কথা কুবের ও গণেশের কথোপকথন থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> গণেশ ভারি খুশি। বারবার সে বলিতে লাগিল, 'পোলা হইবো কই নাই কুবির? কই নাই ইবার তর পোলা না হইয়া যায় না?' শেষে বিরক্ত হইয়া কুবের বলিল, 'চুপ যা গণেশ। পোলা দিয়া করুম কী? নিজেগোর খাওন জোটে না, পোলা!' গণেশ ক্ষুণ্ন হইয়া বলিল, 'তুই নি গোসা করিস কুবির?' 'করুম না? মইরবার কস নাকি আমারে তুই?'[৩]

কুবেরের সাংসারিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, আঁতুড়ঘরে অবস্থানকালেও মালাকে চাহিদা মাফিক খাবারের যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আর্থিক দীনতার কারণে তাকে ভালোভাবে খাদ্য বা পথ্য দেবার সক্ষমতা কুবেরের নেই বলেই সে পুত্র সন্তান হওয়ার পরও খুশি হতে পারে না। এদিকে রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মালা ক্ষুধার জ্বালায় কুবেরকে বিষয়টি জানায়। মালা-কুবেরের কথোপকথন লক্ষণীয় :

---

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭
২. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
৩. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

মালা ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমারে দুগা মুড়ি চিড়া দিবা গো?' 'ক্যান ভাত খাস নাই?''খাইছি। ভাতে টান পড়ল, পেট ভইরা খাই নাই। অখন ক্ষিধায় পেট জ্বলে।''জ্বালাইয়া মারস বাপু তুই।' বলিয়া কুবের হাঁড়ি কলসি খুঁজিয়া পিসির নিজের জন্য লুকানো কতকগুলি চিড়া মালাকে আনিয়া দেয়।[১]

অন্ধকারের মধ্যেই মালা পরম তৃপ্তিতে চিড়াগুলো খায়। কুবের রাগ করলেও বুঝতে পারে প্রসূতি হিসেবে স্ত্রীর ক্ষুধার জ্বালা। এটাই জেলেপাড়ার রূঢ় বাস্তবতা।

অবিরাম বঞ্চনার কারণে জেলেপল্লির মানুষগুলো ধনিক শ্রেণির প্রতি প্রতিনিয়ত পোষণ করে চলে বিরাগ ও বিদ্বেষ। ধনিক শ্রেণির যে-কোনো শুভ উদ্যোগকেও তাই তারা দেখে সন্দেহেরদৃষ্টিতে। *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসের মেজবাবু অনন্ত জমিদারশ্রেণির প্রতিভূ চরিত্র। তিনি শিক্ষিত এবং অপেক্ষাকৃত সজ্জন দেশসেবক। তিনি কেতুপুরের ধীবরপল্লীর দরিদ্র শ্রেণির মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞানদানের জন্য সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করেন। কিন্তু কেতুপুরবাসীর জীবনধারা উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূর্ণ হয়নি। বরং সামাজিক অপবাদের তিলক তার কপালে অঙ্কিত হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় রটে যায় যে, কেতুপুরের মেজকর্তা জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে রমণী আস্বাদন করে বেড়াচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় কুবেরও অবলীলায় সন্দেহ করে মেজবাবুকে। সে মালাকে গালিগালাজ করে মেজবাবুকে জড়িয়ে।

কেতুপুরের ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের জীবন নিয়তিনির্ভর। কেবল ধনিকশ্রেণিই নয়, প্রকৃতিও তাদের জীবনধারায় রুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। উপন্যাসে দেখা যায়, আশ্বিনের ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয় জেলেপাড়ায়। তাদের ঘরদোর ঝড়ে উড়ে যায়, গাছ-গাছালি ভেঙে পড়ে, পথঘাট চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, অনেকেই আহত হয়, পদ্মায় সলিলসমাধি ঘটে কয়েকজনের। লেখকের ভাষায় :

একদিন প্রবল ঝড় হইয়া গেল। কালবৈশাখী কোথায় লাগে। সারাদিন টিপটিপ বৃষ্টি হইল, সন্ধ্যায় আকাশ ভরিয়া আসিল নিবিড় কালো মেঘ, মাঝরাতে শুরু হইল ঝড়। কী সে বেগ বাতাসের আর কী গর্জন! বড়ো বড়ো গাছ মড়মড় শব্দে মটকাইয়া গেল, জেলেপাড়ার অর্ধেক কুটিরের চালা খসিয়া আসিল, সমুদ্রের মতো বিপুল ঢেউ তুলিয়া পদ্মা আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তীরে। জেলেপাড়ার বৃদ্ধ ও রমণীরা হাহাকার করিয়া রাত কাটাইল, ছেলেমেয়েরা কেহ ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া রহিল, কেহ গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইলিশের মরসুম শেষ হইলে মোটা উপার্জনের সুযোগ দুদিন পরে ফুরাইয়া যাইবে, জেলেপাড়ার কোন ঘরে আজ বুঝি সমর্থদেহ পুরুষ নাই, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছে দূর-দূরান্তরে। কেহ ফিরিবে প্রভাতে,

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

> কেহ ফিরিবে না।...সকালে ঝড় কমিল কিন্তু একেবারে থামিল না। শাঁ শাঁ শব্দে বাতাস বহিতে লাগিল, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল গুঁড়িগুঁড়ি। জেলে পাড়ার দিকে তাকানো যায় না, ঘন– সন্নিবিষ্ট কুটিরগুলিকে কে যেন আবর্জনার মতো নাড়িয়া চাড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। কোনো ঘর কাত হইয়া পড়িয়াছে, কোনো ঘরের চালা নাই, কোনো চালার অর্ধেক খড় উড়িয়া গিয়া বাঁশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, উঠান ভরিয়া পথ জুড়িয়া জমিয়াছে গাছের ডালপালা।...আমিনুদ্দি কোথায় আছে কে জানে, হয়তো ডাঙ্গায়, নয় তো পদ্মার উত্তাল জলতলে, অতবড়ো মেয়েটা তাহার কারও সান্ত্বনা মানিতেছে না, হাউমাউ করিয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে। যে মেয়ের পর্দা রাখিবার জন্য গরিব আমিনুদ্দি কুটির ঘিরিয়া উঁচু বেড়া দিয়াছিল আজ যার খুশি তাকে দেখিয়া যাও।[১]

কেতুপুরের মানুষ দরিদ্র হলেও তারা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। ঝড়ে গ্রামের বহু ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়ায় অনন্ত বাবু কমিটি করে চাঁদা তুলেছেন। কিন্তু সমাজের দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের কারণে সে-সাহায্য জেলেরা পেয়েছে যৎসামান্য। এসময় জেলেপাড়া ঘিরে কেবল চোর-জুয়াড়িদের ভিড়। মানিকের তীক্ষ্ণ সমাজদৃষ্টিতে এই বিরূপ বাস্তবতার ছবিটি স্পষ্ট অবয়ব পেয়েছে। সমাজ-বাস্তবতা অঙ্কনের এ এক নতুন পথ, নতুন দৃষ্টান্ত। পদ্মানদীর মাঝি যে ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমাজ-পরিবেশের আলেখ্য হয়ে উঠেছে তা এসব ঘটনাংশের মাধ্যমে স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের মতামত উল্লেখযোগ্য :

> *পদ্মানদীর মাঝি* কখনোই ব্যক্তি জীবনের আধারমাত্র নয়। সেখানে একটি গ্রামের প্রকৃতি ও জনসমষ্টি আর সেই সমষ্টির উপাদানগুলোর বৈচিত্র্য ঔপন্যাসিকের কাহিনী বিবরণকে গড়ে তোলে। নিজের এই পুরনো লেখাগুলির ভিতর থেকে সমষ্টিচরিত্রের এই গঠনই হয়তো মানিকবাবুর নিজের কাছে সত্য হয়ে উঠেছিল।[২]

জেলেপাড়ার মানুষের জীবনযাত্রাও একেবারে স্বতন্ত্র। পদ্মাবিধৌত প্রকৃতি, নিসর্গ ও মৃত্তিকার সঙ্গে গভীর ঐক্যে মিশে আছে তাদের জীবনাচার। এখানে শহরের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের জীবনপ্রণালী অপরিচিত ও অভাবনীয়। এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে গ্রামীণ জেলেপল্লির সামূহিক জীবনবাস্তবতা। এ প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার শিকদারের বক্তব্য স্মরণযোগ্য :

> মাছধরার সংগ্রাম, পুত্র লাভের আনন্দ-বেদনা, রথের উৎসব, বর্ষার বন্যা, শরতের আগমন, আশ্বিনের ঝড়ের বিপর্যয়, শীতের পর বুনো হাঁসের ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাওয়া, বসন্তের দোল উৎসব...কেতুপুরে মালিন্যময় দরিদ্র-জীবনের বাস্তবতাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন লেখক।[১]

---

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২২৩
২. দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি-১৯৯১, পৃ. ১৮৭

কেতুপুর গ্রামের মানুষ রোগাক্রান্ত হলে নির্ভর করে গ্রামীণ কবিরাজের ওপর। খুব বড়ো ধরনের শারীরিক সমস্যা না হলে তারা হাসপাতালে যায় না। এ জন্য গোপীর পা ভেঙে যাওয়ার পর তার পায়ের ব্যথা উপশমের জন্য পায়ে চুন-হলুদ আর তামাক পাতা লাগানো হয়। কিন্তু তাতে গোপীর পায়ের ব্যথার উপশম তো হয়ই না বরং আরও বেড়ে যায়। অবস্থা এমন হয় যে, শেষাবধি তাকে আমিনবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এ জেলেপাড়া থেকে কোনো রোগীর হাসপাতালে যাওয়াকে লেখক প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে তুলনা করেছেন :

> একটা চওড়া কাঠের তক্তায় শোয়াইয়া ধরাধরি করিয়া গোপীকে নদীতীরে লওয়া হইল। কাঁথা বালিশ হাতে করিয়া কপিলা গেল সঙ্গে। ইতিমধ্যে জেলেপাড়ায় খবর রটিয়া গিয়াছিল। গ্রামের একটি মেয়েকে হাসপাতালে নেওয়া প্রতিমা বিসর্জনের চেয়ে কম গুরুতর ব্যাপার নয় জেলেপাড়াবাসীর কাছে– এই ভোরে নদীতীরে একটি ছোটখাটো ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে কুবের একেবারে হয়রান। কপিলা আগে নৌকায় উঠিয়া কাঁথাপত্র বিছাইয়া দিল, তারপর গোপীকে তুলিয়া শোয়ানো হইল। যন্ত্রণায় ও ভয়ে গোপীর মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। হাসপাতালে? না জানি কী ভয়ঙ্কর সেই স্থান। কে জানে কী হইবে তাহার। কপিলার একটা হাত গোপী সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল।[২]

গোপীকে বিলম্বে হাসপাতালে নেয়ার জন্য ডাক্তার কুবেরকে তিরস্কার করে। তাকে হাসপাতালে রেখে অস্ত্রোপচার করা হলে তার পা কিছুটা ভালো হয়। যন্ত্রণার উপশম না হলে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করা হয়। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এলেনিঃস্ব রাসু গোপীকে বিয়ে করতে চায়। কুবেরএ-নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে হোসেন মিয়ার তত্ত্বাবধানে গোপীর বিয়ে হয় সোনাখালী গ্রামের বঙ্কুর সঙ্গে।

উপন্যাসের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের যাপিত জীবনের বর্ণনায় সমৃদ্ধ হলেও পরবর্তী চারটি পরিচ্ছেদে মুখ্যত উপস্থাপিত হয়েছে কুবের-কপিলার প্রেমসম্পর্ক। কুবের-কপিলার এই প্রেম কেতুপুরের প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি ও বিধানমতেও গ্রহণীয় নয়। স্ত্রী মালার প্রতি কুবেরের বিরূপতা ছিল না। মালাকে নিয়ে কুবেরের জীবন জেলেপল্লির বাস্তবতায় ভালোই চলছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে স্বামীর সঙ্গে কল এবং সাময়িক বিচ্ছেদের কারণে কপিলা কেতুপুরে এলে কুবের তার প্রতি কৌতূহলী হয়ে পড়ে।

---

১. অশ্রুকুমার সিকদার, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আদি উপন্যাস', ভূঁইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫, পৃ. ২১৩

২. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

কপিলাও কুবেরকে নানা ছলাকলা বিস্তার করে তার প্রতি প্রলুব্ধ করতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে তাদের আচরণ ও পারস্পরিক উক্তি-প্রত্যুক্তি ঠাট্টা-রসিকতা মনে হলেও এক পর্যায়ে তা সীমা ছাড়িয়ে যায়। আমিনবাড়ি হাসপাতালে গোপীর চিকিৎসাসূত্রে এ-সম্পর্ক আরও বিকশিত হয়। কপিলা একপর্যায়ে আকুরটাকুরে স্বামী শ্যামাদাসের কাছে ফিরে গেলে লিবিডো তাড়িত কুবের মনের অবচেতনে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রাসঙ্গিক এলাকা লক্ষণীয় :

> গোপীকে আনিবার নাম করিয়া কুবের একদিন ভোর ভোর গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। শ্যামাদাসের বাড়ি আকুরটাকুর গ্রাম, হাঁটা-পথে বার-তের মাইল। ক্ষেতের আল দিয়া আঁকিয়া–বাকিয়া চলিতে চলিতে কতবার যে কুবের ভাবিল ফিরিয়া আসে, আকুরটাকুর পৌঁছাইয়া একটা পুকুরে মুখহাত ধুইতে নামিয়া কতবার সে পুকুর ঘাট হইতে সোজা আবার আমিনবাড়ির দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করা স্থির করিয়া ফেলিল তাহার হিসাব নাই। তবু শেষ পর্যন্ত শ্যামাদাসের বাড়ির দরজাতেই পথ শেষ হইলো তাহার।[১]

এরপর কপিলা চরডাঙায় গিয়েছে শুনে কুবের সেখানে যাবার জন্যও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেখানে গিয়ে দোল উৎসবে সে দরিদ্র জেলে–মাঝির সঙ্গে হোলিখেলায় মেতে ওঠে। এ-পর্যায়ে তাদের কথোপকথন লক্ষণীয় :

> কুবের বলে, 'তর লাইগা দিবারাত্র পরানড়া পোড়ায় কপিলা।'
> কপিলা চোখ বুজিয়া বলে, 'ক্যান মাঝি ক্যান? আমারে ভাব ক্যান? সোয়ামীর ঘরে না গেছি আমি? আমারে ভুইলো মাঝি–পুরুষের পরাণ পোড়ে কয়দিন? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দ্যাশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমারে।'[২]

'বাঁশের কঞ্চির মত অবাধ্য' কপিলা উপন্যাসের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত ঘিরে থাকে কুবেরকে। কুবের-কপিলার এই প্রেমসম্পর্ক প্রচলিত সকল সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলে অবশেষে বৃহত্তর সমাজবিচ্ছিন্ন ময়নাদ্বীপে গিয়ে পরিণতিপ্রাপ্ত হয়।

কেতুপুরের জেলেপল্লীর সমাজ পুরুষশাসিত। এখানে পুরুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয় নারীদের জীবন। নারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো মূল্যই নেই এ-সমাজে। এই জীবনের প্রতিনিধিত্বশীল নারীচরিত্র কুবেরের

---

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

২. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

স্ত্রী মালা। বঞ্চনা আর অন্তর্জ্বালাই যেন তার একমাত্র নিয়তি। তার জীবনজ্বালা কেউ অনুভব করে না। উপরন্তু সে কুবেরের দ্বারা পদে পদে অবহেলিত ও অত্যাচারের শিকার হয়েছে।

কুবের স্বয়ং কপিলার সঙ্গে অবৈধ প্রেমসম্পর্কে জড়িয়ে গেলেও মালার কাছ থেকে সে দাম্পত্যধর্মে প্রবল একনিষ্ঠতা প্রত্যাশা করে। এক্ষেত্রে সামান্য বিচ্যুতিও তার অসহ্য। জেলেপাড়ার নানাজনের কথা শুনে মেজবাবু-মালার সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করে সে। মালা তার পঙ্গুদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশার কুবেরের কাছে আমিনবাড়ির হাসপাতালে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই নিয়ে অনেক বাদানুবাদের পর কুবের সম্মত হলেও সে নানা অজুহাতে মালাকে আমিনবাড়িতে নিয়ে যায়নি। বরং সে হোসেন মিয়ার তাবেদারিতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। অগত্যা মালা মেজবাবুর নৌকাযোগে লখা ও রাসুকে সঙ্গে নিয়ে আমিনবাড়ি হাসপাতালে যায় এবং তিনদিন পর গ্রামে ফিরে আসে। ডাক্তারের কথা শুনে সে বুঝতে পারে পঙ্গুত্ব থেকে তার মুক্তি নেই। এই পর্যায়ে মালা পরমানন্দে তার সদ্যলব্ধ উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার কথা কুবেরকে বলতে চাইলে কুবের নিস্পৃহতা প্রদর্শন করে এবং অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকে। মালা তখন রেগে গিয়ে কুবেরকে বলে :

> ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান ? কবে কই নিছিলা আমারে, চিরডা কাল ঘরের মধ্যি থাইকা আইলাম, এউক্কা দিনের লাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করবা ক্যান ?[১]

মালার এ কথায় কুবের মেজবাবুকে জড়িয়ে মালাকে গালাগাল করলে তীব্র কলহের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে কুবের ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে এবং রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এভাবে :

> শেষে রাগের মাথায় কুবের হঠাৎ কলিকাটা মালার গায়ে ছুড়িয়া মারিল। কলিকার আগুনে মালা ও তাহার কোলের শিশুটির গা স্থানে স্থানে পুড়িয়া গেল, কাপড়েও আগুন ধরিয়া গেল মালার। সিধুর বোন ছুটিয়া আসিয়া কাপড়খানা খুলিয়া লইল, নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়া লজ্জা নিবারণ করিল মালার। দুঃখিনী সে, বড় ছেঁড়া তাহার কাপড়খানা।[২]

---

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

২. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

এভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসহায়তার করুণ চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন পুরুষ বিত্তবান অথবা বিত্তহীন যা-ই হোক না কেন, নারীর প্রতি তার আচরণ যে কতো বেশি আধিপত্যকামী ও নির্মম হতে পারে তা মালার প্রতি কুবেরের আচরণসূত্রে স্পষ্ট।

পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের জীবনযাত্রা একেবারেই গতানুগতিক, বৈচিত্র্যহীন। বংশানুক্রমিকভাবে তারা বয়ে চলে এক নিশ্চল জীবনধারা। তাদের গতানুগতিক জীবনবাস্তবাতর চিত্র লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধসিয়া থাকে, পদ্মার বুকে জল করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না।[১]

পদ্মা তীরবর্তী জেলে ও চাষিদের জীবন ভাবনা অসাম্প্রদায়িক। এখানে হিন্দু–মুসলমানে কোনো বিরোধ নেই। তারা পাশাপাশি বাস করে। তাদের ধর্ম আলাদা কিন্তু জীবনের রং একই। 'দারিদ্র্য'ই তাদের ধর্ম। এ-কারণেই তারা জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরের সমব্যথী। উপন্যাসে আমিনুদ্দির সঙ্গে জহরের যে কারণে বিবাদ হয়, একই কারণে কুবের ও আমিনুদ্দির মধ্যে বিবাদ হয়। আবার অল্পতে মীমাংসাও হয়ে যায়। মুসলমান হোসেন মিয়া নির্বিঘ্নে কুবেরের ঘরে উঠতে পারে। তার ঘটিতে পানিও খেতে পারে। আবার ঘটিতে পানি খাওয়ার পর সেটি বৃষ্টি জলে ধৌতও করে। এ প্রসঙ্গে লেখকের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য :

> এরা (হিন্দু) এবং জেলেপাড়ার অ-মুসলমান অধিবাসীরা সদ্ভাবেই দিন কাটায়। ধর্ম যতই পৃথক হোক দিনযাপনের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এব বড়ো অধর্ম পালন করে-দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনো বাধে সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অল্পেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে বিবাদ হয়, আমিনুদ্দির সঙ্গে জহরের যে বিবাদ হয়, কুবের আমিনুদ্দির বিবাদও হয় সেই কারণেই। খুব খানিকটা গালাগালি ও কিছু হাতাহাতি হইয়া মীমাংসা হইয়া যায়।[২]

কেতুপুরের মুসলমান পরিবারের মেয়েরা অনেকটা রক্ষণশীল। তাদের পর্দার মধ্যে রাখার জন্য অভিভাবকরা বাড়ির চতুর্দিকে ছেঁড়া চট কিংবা সুপারি গাছের পাতা দিয়ে বেড়া তৈরি করে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে কিছুটা স্বতন্ত্র তাদের জীবন–যাপন। তবে পর্দাপ্রথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও তারা মান্য করে সহনীয় মাত্রায় :

---

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

২. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

জেলেপাড়ার পূর্বদিকে এদের একত্র সন্নিবেশিত বাড়িগুলিতে বেড়ার বাহুল্য দেখিয়া সহজেই চিনিতে পারা যায়। যতই জীর্ণ হইয়া আসুক, ছেঁড়া চট দিয়া সুপারি গাছের পাতা দিয়া মেরামত করিয়া বেড়াগুলিকে এরা খাড়া করিয়া রাখে। অথচ খুব যে কঠোরভাবে পর্দাপ্রথা মানিয়া চলে তা বলা যায় না। মেয়েদের বাহিরে না আসিলে চলে না। নদীতে জল আনিতে যাইতে হয়, পুরুষেরা কেহ বাড়ি না থাকিলে দোকানে সওদা আনিতে যাইতে হয়, বাড়ির আনাচে-কানাচে লাউ কুমড়া ফলিলে, মুর্গিতে ডিম পাড়িলে, গ্রামে গিয়া বেচিয়া আসিতে হয়। বেড়াগুলি পর্দা রাখে শুধু অন্দরের আর এমন বউ-ঝি বাড়ির যদি কেহ থাকে যাহার বয়স খুব কাঁচা– তাহার।[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলে উদ্‌যাপিত বিবিধ অনুষ্ঠান ও পূজা-পার্বণের বর্ণনা প্রদান করেছেন। উপন্যাসে কেতুপুর ও সোনাখালিসহ এতদ্‌ঞ্চলের রথের মেলা ও রাস উৎসবের বর্ণনা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ও মনোগ্রাহী। এসব উৎসব ও পূজাপার্বণের বর্ণনায় লেখকের বাস্তবতাবোধ প্রশংসনীয়। যেহেতু এ-অঞ্চলের জেলে-মাঝি-চাষা-ভূষারা হতদরিদ্র সেহেতু তাদের উৎসব-অনুষ্ঠানের রীতি-প্রক্রিয়া কিংবা উপায়-উপকরণও অন্য এলাকার তুলনায় স্বতন্ত্র। এখানে দোল উৎসবে রঙের পরিবর্তে এরা কাদামাখা মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে একটি ছোট ঘোড়ার উপর বসে থাকে দোলের রাজা। এরই মধ্যে নাচ-গান, ছোটাছুটি, হৈচৈ, পুকুরে পাঁক তুলে উৎসবে মত্ত হয়ে ওঠে এরা। অন্যদিকে, দুঃখ–দৈন্যপীড়িত ধীবরপল্লির জনমানুষের কাছে সোনাখালির রথের মেলাও এক অনাবিল আনন্দ বয়ে আনে। লেখকের বর্ণনায় :

যাহারা রথের মেলায় গিয়াছিল একে একে তাহারা ফিরিয়া আসিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যাটি নামে সানন্দে। বৌরা হাসিমুখে লাল পাছাপাড় শাড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, নূতন কাচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাচ ও কাঠের পুঁতির মালা সযত্নে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে। আহ্লাদ বহন করিয়া এই তুচ্ছ উপকরণও যে-কুটিরে আসে না, সেখানে যে বিষাদ জমাট বাঁধিয়া থাকে তা নয়, কোনো না কোনো রূপে সোনাখালির মেলার আনন্দের ঢেউ সে কুটিরেও পৌঁছিয়াছে। একটি কাঁঠাল, দু'টি আনারস, আধ-সের বাতাসা– এই দরিদ্রের উপনিবেশেও যে দরিদ্রতম পরিবার শুধু নুন আর অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া ধরা পুঁটির তেলে ভাজা পুঁটি মাছ

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

দিয়া দিনের পর দিন আধপেটা ভাত খাইয়া থাকে– খুশি হইয়া উঠিতে আর তাহাদের অধিক প্রয়োজন কিসের?[১]

অর্থাভাবে কেতুপুরের দরিদ্র জেলেদের পক্ষে দুর্গাপূজার আয়োজন সম্ভব হয় না। তবে জমিদার বাড়িতে জেলেপাড়ার প্রায় সকলেই দুর্গাপুজা দেখতে যায়। সেখানে তারা প্রাণভরে পুজার ঢাক–ঢোলের বাজনা শোনে, ছেলেবুড়োরা দু-বেলা ঠাকুর দেখে। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ 'তাড়ি' গিলে মাতলামি করে। আমিনবাড়ির বাজারে অনেকেই ভাসান-যাত্রা শুনতে যায়। এটুকুই জেলেপাড়ার মানুষদের চিত্তবিনোদনের সুযোগ, এর বাইরে সুযোগ থাকলেও দারিদ্র্য জর্জরিত জীবনে তা উপভোগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।
আবার রথের মেলা নিয়েও এ অঞ্চলে এক কিংবদন্তি চালু রয়েছে দীর্ঘকাল। এর মাধ্যমে লেখক এতদঞ্চলের সামাজিক কুসংস্কারের চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে :

অনেকদিন আগে এ অঞ্চলে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময়ে কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া এই মাঠে আস্তানা গাড়েন এবং একটি বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া দেন। নিজের বলিতে সন্ন্যাসীর এক কানাকড়ি সম্বলও ছিল না। শোনা যায়, এমনই আশ্বর্য ছিল মানুষের উপর তাঁহার প্রভাব যে সামনে দাঁড়াইয়া চোখে চোখে চাহিয়া তিনি হুকুম দিতেন আর বড়ো বড়ো জমিদার-মহাজনেরা মণে মণে চাল ডাল পাঠাইয়া দিত এই মাঠে। শত শত ভদ্র গৃহস্থ নিজেরাই কোমর বাঁধিয়া তাহা রান্না করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীদের বিতরণ করিত অন্ন।[২]

এদিকে কেতুপুরের মানুষের মধ্যে ধর্মভীতিও প্রবল। তারা পূজা করে বিভিন্ন দেবতার : 'ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেবতা', 'হাসি কান্নার দেবতা', 'অন্ধকার আত্মার দেবতা'– এরকম অনেক দেবতাই তাদের আরাধ্য। নানা রোগ- শোক, আধি-ব্যাধিতে তারা এরকম অসংখ্য দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। ঝড়ের দিনে জেলে পাড়ার মেয়েরা ঝড়ের দেবতার আনুকূল্য লাভের আশায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। লেখকের ভাষায় :

ঝড় শুরু হইলে ঘরে ঘরে মেয়েরা উঠানে পিঁড়ি পাতিয়া দিয়াছে– ঝড়ের দেবতা বসিবেন, শান্ত হইবেন।ঘরে ঘরে মেয়েরা কপাল কুটিয়া মধুসূদনকে ডাকিয়াছে। এ কী রোষ দেবতার? কেন এই প্রলয়?[৩]

---

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
২. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮
৩. *পদ্মানদীর মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ-২২৩

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস রচনায় লেখকের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা অন্তরালে কাজ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ–লেখকের সমাজতান্ত্রিক মানসিকতারই পরিচায়ক। সেই সঙ্গে এ ময়নাদ্বীপের বর্ণনার মাধ্যমে ত্রিশের দশকের বেকার, দারিদ্র্যের কোষাঘাতে জর্জরিত নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের নর-নারীর মানসিকতার বিকল্প জীবনাদর্শেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে শোষক ও শোষিত দুই শ্রেণির চরিত্রই বিদ্যমান। যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তার বিত্তহীন নিম্ন শ্রেণির মানুষদের নিষ্পেষণ করার চেষ্টা করে। শীতল সুযোগ পেয়ে যেমন কুবেরকে শোষণ করে তেমনি ধনঞ্জয় মহাজনও কুবের–গণেশের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে আনন্দবোধ করে। পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস সম্পর্কে পিয়ের ফালোঁ এস. জে. বলেছেন :

> মানিকের সঙ্গে মোপাসাঁর সুনিপুণ শৈলী ও বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কন প্রণালী তুলনীয় বটে। বাস্তবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও সাধারণ মানুষের চরিত্র রূপায়ণে দু'জনে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবুও তফাৎ অনেকখানি। মোপাসাঁর মধ্যে কি একটা উপেক্ষাপূর্ণ আভিজাত্যের ভাব রয়েছে, তিনি সাধারণ মানুষকে হয়তো চিনতেন কিন্তু ভালোবাসতেন না। তাঁর বর্ণনা কতকটা নিষ্ঠুর, নিজেকে তিনি তাঁর চরিত্রগুলির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে বোধ করতেন না। মানিকের সেই নিষ্ঠুরতম লেশমাত্র নেই। অন্ততপক্ষে পদ্মানদীর মাঝি বইখানির মধ্যে নেই-ই। রুশ লেখক গর্কির মতো তাঁর বাস্তবধর্মী মনে মমতার অন্ত নেই। মানিক সত্যই কুবের ও গণেশ, মালা কপিলাকে ভালোবেসেছিলেন।[১]

এদিকে রাসুও তার স্ত্রী-সন্তানদের ময়না দ্বীপে ফেলে এসে সে গোপীকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কেতুপুরের এ সমাজে নর-নারীর বিবাহে পণ আর যৌতুকও প্রচলিত বিধান। এ প্রসঙ্গে নাহিদ হকের মতামত স্মরণীয় :

> শ্যামাদাস কপিলার কলহের শাস্তি স্বরূপ দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। বউ মরে গেলে কপিলাকে নিতে এসেছে। শ্বশুরালয়ে কপিলার অবস্থা এ সমাজ ব্যবস্থারই বাস্তব রূপ। কুবের সম্মত হয়েছে বলেই কপিলা ময়নাদ্বীপে গেছে। এমনিভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান নির্ণীত হয়। এ সমাজে বাল্য বিবাহ আছে, বহুবিবাহ আছে। গোপীর বিয়ের প্রসঙ্গসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে রয়েছে এর প্রমাণ। যুগলের সঙ্গে গোপীর যে বিয়ের সম্বন্ধ হয় তাতে বয়সের ব্যবধান বিস্তর, যুগলের বয়স তখন বত্রিশ আর গোপীর এগার।[২]

---

১. পিয়ের ফালোঁ এস. জে, 'বিদেশীর শ্রদ্ধানিবেদন', সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (সম্পা.), *উত্তরাধিকার* (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা), বাংলা একাডেমি, ৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮, পৃ. ৪৯৫।

২. নাহিদ হক, *মানিক উপন্যাসে নারীরা*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ৯৯

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের একটি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে হোসেন মিয়া ও ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গ। সুদূর নোয়াখালী থেকে ভাগ্যান্বেষণে কেতুপর গ্রামে আসে হোসেন মিয়া। প্রথমাবস্থায় তার আত্মপ্রকাশ ছিল দারিদ্র্যব্যঞ্জক; পরনে ছিল ছেঁড়া লুঙ্গি, মাথায় ছিল রুক্ষ চুল। কয়েক বছর আগেও সে এ গ্রামের জহর মাঝির নৌকায় বৈঠা বাইত, জাহাজে খালাসির কাজ করত। বর্তমানে তার অবস্থা ভিন্ন। সে সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান। তার অর্থ আয় এবং পরিবর্তিত জীবনযাত্রার উৎসওগ্রামবাসীর অজ্ঞাত। সে তার চাতুর্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা দিয়ে গ্রামের সকলের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠে। কেতুপুরবাসী যখন একেবারেই নিঃস্ব, আশ্রয়হীন ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে তখন হোসেন মিয়াই তাদের একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> আজ সে তার বেঁটেখাটো তৈলচিক্কণ শরীরটি আজানুলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবিতে ঢাকিয়া রাখে, নিজের পানসিতে পদ্মায় পাড়ি দেয়। জমি-জায়গা কিনিয়া, ঘরবাড়ি তুলিয়া পরম সুখেই সে দিন কাটাইতেছে। গত বছর নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে দু নম্বর স্ত্রীকে। এই সব সুখের ব্যবস্থা সে কি উপায়ে করিয়াছে গ্রামের লোক ঠিক অনুমান করিয়া উঠিতে পারে না। নিত্য নতুন উপায়ে সে অর্থ উপার্জন করে। নৌকা লইয়া হয়তো সে পদ্মায় মাছ ধরিতে গেল – গেল সে সত্যই, কারণ যাওয়াটি সকলেই দেখিতে পাইল, কিন্তু পদ্মার কোনখানে সে মাছ ধরিল, মাছ বিক্রিই বা করিল কোন বন্দরে, কারো তাহা চোখে পড়িল না। তাহার নৌকার মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিয়া একটা মাত্র গল্প শোনা গেল যে, যে বন্দরে তাহার মাছ বিক্রয় করিয়াছে সেখানে নৌকায় যাতায়াত করিতে নাকি সাত-আট দিন সময় লাগে। তারপর কয়েকদিন হয়তো হোসেন গ্রামেই বসিয়া থাকে, একেবারে কিছুই করে না। হঠাৎ একদিন সে উধাও হইয়া যায়। পনের দিন, এক মাস আর তাহার দেখা মেলে না। আবির্ভাব তাহার ঘটে হঠাৎ এবং কিছুদিন পর দু শ গরু ছাগল চালান হইয়া যায় কলিকাতায়।[১]

এক পর্যায়ে হোসেন মিয়াই কেতুপুরবাসীর আর্থিক নির্ভরতার কাণ্ডারিতে পরিণত হয়। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে কেতুপুরের খেটেখাওয়া মানুষের জীবন। সে ময়নাদ্বীপে তার স্বপ্নের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তবে কেতুপুর গ্রামের মানুষের কাছে হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ এক আতঙ্কের নাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই গ্রামের রাসু তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ময়নাদ্বীপ গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের ব্যবধানে সবাইকে ফেলে সে পালিয়ে এসেছে কেতুপুরে এবং অতঃপর সে ময়নাদ্বীপের যে বর্ণনা দিয়েছে তা

---

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০২

ভয়ংকর। রাসুর এই সর্বনাশের জন্য গ্রামের সবাই হোসেন মিয়ার প্রতি অখুশি হয়। তাদের মধ্যে ক্রোধ ঘনীভূত হয়। এ নিয়ে জেলেপাড়ায় একটি বিচারসভাও বসে। কিন্তু সেখানে অভিযুক্ত হোসেন মিয়াই যেন বিচারক। সভা শেষে হোসেন মিয়াই বরং রাসুকে বলে :

> পয়সাকড়ি পাইবা মালুম হয়, নিকাশ নিয়া খারিজ দিমু। ময়নাদ্বীপের জমিন না নিলি জঙ্গল কাটানোর মজুরি দিই–খাওন-পরন বাদ।...লালচে দাড়ির ফাঁকে হোসেন মিয়া মৃদ্ হাসে, বলে, 'মনে করতিছ, হোসেন মিয়া ঠক। তোমারে ঠকাইয়া হোসেন মিয়ার ফায়দা কিসির? কোন হালারে আমি জবরদস্ত ময়নাদ্বীপি নিছি? আপন খুশিতে গেছিলা, ঝুট না কলি মানবা রাসু বাই। ফিরা আইবার মন ছিল, আমারে কইবার পারলা না? একসাথে আইতাম?[১]

কেতুপুরবাসীর সঙ্গে হোসেন মিয়ার আচরণ পরমাত্মীয়ের মতো। সে নিজেকে তাদের একজনই মনে করে। সে যে বিশ বছর আগে নিজ গ্রাম থেকে চলে এসে এখানে মাঝির কাজ করেছে তা সে ভুলতে পারে না। সে প্রায়ই কেতুপুরের গরিব জেলে-মাঝিদের বাড়িতেই রাত কাটায়। জেলেপাড়ার এই মাঝিদের প্রতি তার মমতাও অপরিসীম। সে কুবেরের ঘরের চালের দৈন্যদশা দেখে ঘর মেরামতের জন্যে ছন কিনে দেয়। এদিকে আশ্বিনের ঝড়ে জেলেপাড়ার অর্ধেক কুটিরের চালা ভেঙে পড়লে হোসেন মিয়া তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সে নিজে ঘর তোলার জন্যে চাঁদা তোলে এবং বলে :

> 'না টাকা কর্জ দিমু না, ছন দিমু, বাঁশ দিমু, নিজে খাড়াইয়া তোমাগো ঘর তুইল্যা দিমু–শ্যাষে নিকাশ নিয়া খত লিখুম, একটা কইরা টিপ দিবা।' কুবেরকে উদ্দেশ্য করে হোসেন মিয়া বলে– '...টিপসই দিয়া রাখ, যখন পারবা দিব– না দিলি মামলা করুম না বাই! ...জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, খত কিসির? লিখা থুইলাম তোমার হিসাব থাকব– না-ত কিসির কাম খত দিয়া।'[২]

হোসেন মিয়ার স্বপ্নভূমি ময়নাদ্বীপ। মনুষ্যবসতি পত্তনের প্রত্যাশায় সে এ-দ্বীপটি ক্রয় করেছে। লেখকের ভাষায় :

---

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

২. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬

> নিলামে দ্বীপটি কিনিবার পর ওখানে জনপদ বসানোর স্বপ্ন দেখিতেছে সে, জীবনে আর তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নাই, কামনা নাই–হাজার দেড়েক মানুষ ওখানে চলাফেরা করিতেছে, এক বিঘা জমিও দ্বীপের কোনখানে অকর্ষিত নাই, মরিবার আগে শুধু সে দেখিয়া যাইতে চায়।[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ময়নাদ্বীপকে কেন্দ্র করে তাঁর অসাম্প্রদায়িক ধর্মচিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। হোসেন মিয়ার মাধ্যমে তাঁর সে চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। হোসেন মিয়া মুসলমান হলেও ধর্মান্ধ নয়, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী। ময়নাদ্বীপে সে মুসলমান বা হিন্দু কাউকেই অতিরিক্ত সুবিধা দেয়নি। এ জন্য ময়নাদ্বীপে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সে তাই তার অসম্মতি জ্ঞাপন করেছে। আমিনুদ্দির উদ্দেশ্যে বলা হোসেন মিয়ার কথায়ই তা স্পষ্ট :

> ময়নাদ্বীপি মোল্লা পামু কই? রাজবাড়ির আজিজ ছাহাব কন, ময়নাদ্বীপি শওজনা মানুষ হলি আর মসজিদ দিলি আর হিঁদুরে জমিন না দিলি গিয়া থাকতি পারেন। তা পারুম না মিয়া। হিঁদু না নিলি মানুষ পামু কই? হিঁদু নিলি মসজিদ দিমু না। ক্যামনে দিমু কও? মুসলমানে মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব ঠাহুর ঘর– না মিয়া, আমার দ্বীপির মদ্যি ও কাম চলবো না।[২]

তার এ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষ-এর মর্যাদাই উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হোসেন মিয়া চায় সেখানে ধর্ম বা শ্রেণিগত কোন ভেদাভেদ থাকবে না। সমতা ও মানবতাই হবে সেই সমাজের প্রধানভিত্তি। এজন্য সে আমিনুদ্দির অপরিশোধ্য ঋণ পরিশোধ করতে নছিবনের মতো একজন স্ত্রী জুটিয়ে দেয়, রসুলকে জেলের দরজা থেকে ছিনিয়ে আনে। আর এ সব কিছুর বিনিময়ে হোসেন শুধু চায়– 'তাহারা শুধু এখানে বাস করুক', আর হোসেন মিয়ার স্বপ্ন সফল হোক। এ জন্য জঙ্গল কেটে সেখানে একদিকে ঘর তোলা শুরু করে, অন্যদিকে শুরু হয় চাষাবাদ– ফসল উৎপাদন। এরপরও যতদিন তারা পুরোপুরি তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারবে না, ততদিন হোসেন মিয়াই জীবিকার সংস্থান করে দেবে। তাদের কাজ শুধু পরিশ্রম করা আর সন্তান উৎপাদন করা।

এ-স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে হোসেন মিয়া দ্বিধাহীনচিত্তে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। আর এ অর্থ উপার্জনের পথ হিসেবে সে অনৈতিক পথ বেছে নেয়; আফিমের ব্যবসা, গরু-ছাগল চালান ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থোর্জনের

---

১. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

২. *পদ্মানদীর মাঝি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

প্রয়াস পায়। ময়নাদ্বীপ পত্তন ও হোসেন মিয়ার রহস্যময় ভূমিকা প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচকগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। ক্ষেত্র গুপ্তের মতে :

> ময়নাদ্বীপ হোসেন মিয়ার জমিদারি – একটি ছোটখাটো রাজত্ব যেখানে সে-ই একচ্ছত্র অধিপতি–শাসক এবং বিচারক। ময়না দ্বীপ যেন সেই আদিম পৃথিবীর একটি কুমারী ভূখণ্ড, তাকে বাসযোগ্য উর্বরা করে তোলার দায় নিয়েছে একদল আদিম-প্রায় মানুষ। মাঠে মাঠে জন্মাতে হবে ফসল, আর ঘরে ঘরে মানুষ। এই স্বপ্ন হোসেনের। চোরা কারবারি মাদকব্যবসায়ী হোসেনের।[১]

সরোজমোহন মিত্রের মতে :

> আমরা এখানে ময়না দ্বীপকে দেখতে পাই একটা 'মিশন' হিসেবে। এই মিশনটা কোন অর্থ উপার্জনের নতুন পথ সৃষ্টি নয়। সারা জীবনের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও যখন মানুষ পদাঘাতে জর্জরিত হয়, তখন তার মনে একটা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। সে কল্পনা করে এমন এক জীবন, যেখানে শ্রমের অধিকার আছে, কিন্তু কোন বঞ্চনা বা প্রতারণা নেই। শ্রমের অধিকারে কেউ ভাগ বসাবে না। অর্জিত ফসলে শুকুনের দৃষ্টি পড়বে না। হোসেনের মিশনের এই একটিই অর্থ ধরা পড়ে।[২]

উপন্যাসের হোসেন মিয়া এবং তার ময়নাদ্বীপ শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে অস্পষ্ট ও রহস্যময়ই রয়ে গেছে। হোসেন মিয়া এক সময় শঠ, একসময় উদার ও সাধারণের কাছে জনহিতৈষী বলে মনে হলেও আবার অন্য সময় তাকে রহস্যময়ই মনে হয়েছে। তার সৃষ্ট ময়নাদ্বীপ কেতুপুরবাসীর জন্য স্বর্গরাজ্যই যদি হবে তাহলে কুবের-কপিলাকে কৌশলে কেন ময়নাদ্বীপে নেয়া হবে? উপন্যাসের শেষ অবধি এ প্রশ্নে উত্তর এবং কুবের-কপিলার সম্পর্ক রহস্যময়ই রয়ে গেছে। এক পর্যায়ে কুবের বাধ্য হয়েছে সামাজিক সকল বন্ধন ছিন্ন করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ফেলে কপিলাকে নিয়ে ময়নাদ্বীপে পাড়ি জমাতে। তবে দীর্ঘদিনের শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্ত করে হোসেন মিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে এক নতুন দিগন্তে উপনীত করতে লেখক যে ছবি অঙ্কন করেছেন তা ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের নিখুঁত উপস্থাপন। এ প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তীর বক্তব্য স্মরণীয় :

> 'ধনতন্ত্রবাদী অর্থনীতি এভাবেই লোভের হাত বাড়ায় সমস্ত কিছুর দিকে– হোক সে মানুষ অথবা প্রকৃতি, হোক সে কুবের, রাসু, আমিনুদ্দির জীবন অথবা ময়না দ্বীপের মাটি।...সামন্ততন্ত্র থেকে যে ধনতন্ত্রবাদী অর্থনীতির দিকে পৃথিবী সরে আসছে তার বিকৃতি উপলব্ধি করতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এতটুকুও দেরিহয়নি। তাঁর পক্ষে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ক্রমে ঝুঁকে পড়া বেশ স্বাভাবিকই ছিল। তাই ঘটেছিল তার

---

১. ক্ষেত্র গুপ্ত, *ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

২. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

জীবনে। কিন্তু বিধিবদ্ধভাবে সাম্যবাদে দীক্ষা নেবার আগেই, ১৯৩০-৩৪-এর মধ্যেই সামন্ততন্ত্র ও নব্য ধনতন্ত্র তথা আধুনিক পুঁজিবাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো কতখানি স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে তারই নিদর্শন হোসেন মিয়ার চরিত্রচিত্রণ আর ময়নাদ্বীপের রূপক।'[১]

মূলত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে একজন শোষণবিরোধী সমাজ-দর্শনের শিল্পীতা এ-উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রপাত্রের জীবনগতির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানিকের মানবতাবাদী চেতনারই উপস্থাপন ঘটেছে। এ-পর্যায়ে তিনি কোনো বিশিষ্ট তত্ত্বদ্বারা চালিত ছিলেন না; বরং তাঁর অন্তর্সত্তায় সক্রিয় ছিল মানবতাকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দের বক্তব্য স্মরণযোগ্য :

> *পদ্মানদীর মাঝি* এমন একটি উপন্যাস, যেখানে চিত্রিত হয়েছে নিম্নবিত্তের জীবন, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সংকীর্ণতাকে আক্রমণও করা হয়েছে। তখনো মানিক মার্কসবাদে দীক্ষা নেননি। *পদ্মানদীর মাঝি* বহির্জীবনের গাথা–কিন্তু অন্তর্জীবনেরও। কমিউনিজম গ্রহণের অনেকে আগে রচিত এই উপন্যাস প্রমাণ করে মানিকের মনোজীবন দ্বিধাবিভক্ত ছিল না, সাধারণ মানুষের প্রতি প্রথম থেকেই তাঁর ছিল ঐকান্তিক ভালোবাসা, আগ্রহ ও সহানুভূতি।[২]

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক সমকালীন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় চিত্র সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি অন্ত্যজ ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনাচারকে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা দান করেছে এ-উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর বক্তব্য প্রণিধাণযোগ্য :

> এ উপন্যাসে পদ্মানদীর তীরভূমিকে ছুঁয়ে যে জীবনকথা বিন্যস্ত হয়েছে, তা একাধারে গোষ্ঠী ও ব্যক্তি উভয়েরই। উপন্যাসের প্রথম দিকে তা মুখ্যত গোষ্ঠীজীবনাশ্রিত, পরে ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে ব্যক্তির গূঢ় জীবনরহস্য– তার প্রবল কামনা ও তজ্জনিত নৈতিক চেতনায় আক্রান্ত দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ সত্তা।'[৩]

এ উপন্যাস প্রসঙ্গে নারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

---

১. সুমিতা চক্রবর্তী, 'হোসেন মিয়া, ময়না দ্বীপ ও লেখকের ইঙ্গিত', সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, *উত্তরাধিকার* (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় – অন্তর্বাস্তবতা-বহির্বাস্তবতা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ১২২

৩. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৮০

তাঁর সকল মনোযোগ গিয়ে পড়েছে কেতুপুর গাঁয়ের জেলেপাড়ার চূড়ান্ত দারিদ্র্যপীড়িত মানুষগুলির উপর। তাদের জীর্ণ ঘরের চালা বর্ষার জল ঠেকাতে পারে না, একটু ঝড় তুফান হলেই মেঝে জলে একাকার, স্যাঁতসেতে খড় বিছিয়ে– তাও সব সময় জোটে না–সকলের একত্র গাদাগাদি কওে শোওয়া উঠোনে কাদা ও আগাছার জঙ্গল, তুফান বিষম হলে কখনো কখনো ঘরচাপা পড়ে মরে কিংবা জন্মের মত খোড়া হয়ে যাওয়া, পান্তাভাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি, ছেড়া ত্যানা পরে কাটানো, ঋণ ও সুদের পীড়ন, নৌকোর অভাবে পরের নৌকোয় মাঝিগিরি করা–এই হলো কেতুপুর আর আশপাশের দশটা গ্রামের জেলে জীবনের চিরন্তন চিত্র। এই চিত্রটিকেই লেখক তার সমস্ত দরদ দিয়ে এঁকেছেন।[১]

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের বিশাল অংশ জুড়ে কুবের-কপিলার প্রণয় এবং হোসেন মিয়া ও ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হলেও প্রকৃতপক্ষে পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের দরিদ্র ধীবরশ্রেণির সংগ্রামশীল জীবনযাপনের চিত্রাঙ্কনেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। উপন্যাসের প্রধান প্রতিপাদ্যই জেলে ও মাঝি-জীবনকেন্দ্রিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুবের-কপিলার লিবিডো প্রভাবিত জীবন চিত্রাঙ্কনে উৎসাহিত বোধ করলেও প্রায় পুরো উপন্যাস জুড়ে তিনি পদ্মাতীরবর্তী ধীবর সম্প্রদায়ের রহস্যময় ভূগোলে পরিভ্রমণ করেছেন নৈষ্ঠিক পরিব্রাজকের মতো। তাঁর অসাধারণত্ব এখানে যে, তিনি একবারও পাঠককে বিচ্ছিন্ন হতে দেননি পদ্মাতীরবর্তী জনজীবন থেকে। *পদ্মানদীর মাঝির* জীবনসমস্যা পদ্মা এবং পদ্মাবিধৌত প্রকৃতি, নিসর্গ ও মৃত্তিকার সঙ্গে গভীরতর ঐক্যে সম্পর্কিত। বাংলা উপন্যাসের বহমান ধারায় এ উপন্যাসের অভিনবত্বের একমাত্র কারণ এর পট-পরিপ্রেক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনাভিজ্ঞতা-বহির্ভূত দূরবর্তী অঞ্চলের জনজমিনে প্রসারিত।'[২] এককথায় পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে কেতুপুরের জেলেজীবনের জীবনসত্য সামগ্রিক অবয়বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

জীবনের জটিলতা

আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে রচিত মানিকের *জীবনের জটিলতা* (১৯৩৬)[৩] উপন্যাসে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত জীবনের জটিল প্রেম ও দারিদ্র্যের অন্তর্জ্বালা। 'এই উপন্যাসের ফর্ম বা রূপবন্ধন এর নিজস্ব এবং এই

১. নারায়ণ চৌধুরী, 'মানিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য', ঘনশ্যাম চৌধুরী (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় – সমগ্রতার সন্ধানে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৪০

২. গিয়াস শামীম, বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩. 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চম উপন্যাস এবং ষষ্ঠ গ্রন্থ 'জীবনের জটিলতা'র প্রকাশক ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা। ... গ্রন্থে প্রকাশকালের কোনো উল্লেখ নেই। সজনীকান্ত দাস প্রদত্ত তথ্যানুসারে (পরিচয়, পৌষ ১৩৬৩) এই

উপন্যাসের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য। মূল কাহিনীর সঙ্গে অসংযুক্ত প্রথম পরিচ্ছেদটিতে এই উপন্যাসের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র বিমল ও প্রমীলার বাল্যকালের একটি ছবি আছে। কিন্তু এ ছবি ঠিক ছবি নয়; এ যেন আসলে পরবর্তী সমগ্র উপন্যাসের মর্মগ্রাহী দর্পণ।[১] উপন্যাসের দুই উল্লেখযোগ্য চরিত্র বিমল ও প্রমীলা। এরা ভাই-বোন। প্রবল অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে তাদর জীবন-যাপন ও বেড়ে ওঠা। উপন্যাসের প্রথমেই দারিদ্র্যপীড়িত এ পরিবারের বাস্তব চিত্র লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> ছেলেমেয়েদের জলখাবারের জন্য আজ সকালে আলুভাতে রাঁধিবার সময় অনুরূপার ছিল না। বিমল ও প্রমীলার হাতে একটি করিয়া পয়সা দিয়া সে তাই বলিল, মুড়ি কিনে খাবি যা বাপু আজ, ভাত হয়নি। পয়সাটা হাতে পাওয়া মাত্র বিমল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। গেল সে বিড়ির দোকানে, কিনিল এক পয়সার বিড়ি।
>
> মুড়ি খাইলে পেট ভরে কিন্তু বিমলের নেশা নূতন – ক্ষুধার চেয়ে জোরালো। কাল সন্ধ্যা হইতে সে বিড়ি খাইতে পায় নাই। পুকুরপাড়ে দাঁড়াইয়া পরপর তিনটা বিড়ি শেষ করিয়া সে পড়িতে বসিল।
>
> আর ছাতিটি মাথায় দিয়া প্রমীলা গেল মুড়ি কিনিতে। যাইতে যাইতে দ্যাখে, ওমা এ কী! গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তায় যে সরু নদী সৃষ্ট হইয়াছে তারই একটার তীরে চকচক করিতেছে রুপার একটা সিকি।
>
> সিকিটা কুড়াইয়া নিয়া উত্তেজনায় প্রমীলার ছোটো বুকখানি কাঁপিতে লাগিল। সকালে ঘুম ভাঙিয়া বালিশের তলে কোনোদিনই সোনার মোহর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু পথে রুপার সিকি কুড়াইয়া পাওয়া কি তার চেয়ে কম? হঠাৎ লাখ টাকা পাইলে আমার যেমন অশান্তি হয়, চার আনা পয়সা পাইয়া মেয়েটার মন তেমনি আশ্চর্য সুখকর অশান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। [২]

বিমল বিএ পাশ বেকার যুবক। তেইশ বছর বয়সে সে প্রতিবেশী অধরের স্ত্রী শান্তার প্রেমে পড়ে। শান্তাও তার প্রতি নিবেদিতচিত্ত, প্রেম-প্রার্থনায় ব্যাকুল। বিমল কবিতা লেখে। তার কাব্যচর্চা সমাজে প্রশংসনীয় না হলেও, শান্তা ছিল এসব কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক । বিমলকে সে একজন দুঃখবাদী কবি হিসেবে চিনতো। বেকার হলেও বিমল আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। বিমলকে শান্তা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে চাইলে সে অগ্রাহ্য করে। এর ফলে শান্তার কাছে তার প্রেম বিশ্বস্ততা অর্জন করে।

গ্রন্থ ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে প্রকাশিত হয়।' ((দ্রষ্টব্য : সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪)

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২. *জীবনের জটিলতা*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, *উপন্যাস সমগ্র*, *প্রথম খণ্ড*, সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭

অধর ছিল মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত। তার সঙ্গে বিমলের সম্পর্ক ছিল বিরোধপূর্ণ। বিকৃতমস্তিষ্ক অধরের সঙ্গে শান্তার বিয়ে হলেও বিমলই হয়ে ওঠে তার আরাধ্য পুরুষ। বিমলের চালচলন, গতিবিধি তার অন্তরজুড়ে আলোড়ন তোলে। দিশেহারা হয়ে যায় শান্তা। বিমলের প্রতি তার এই আকর্ষণের কার্যকারণসূত্র মেলাতে সে বারবার ব্যর্থ হয়। ঔপন্যাসিক তার অন্তর্জগতের এই টানাপড়েনের চিত্রটি উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> আজ বিমলের ঘরে আলো নিবিয়া গেলেও শান্তা ঘুমাইতে পারিল না। কিছুদিন হইতে তার মনে হইতেছিল তারই চারিদিকে কী যেন একটা চক্রান্ত গড়িয়া উঠিতেছে, জীবনে এমন কতগুলি ছোটো-বড়ো ঘটনা জমা হইয়াছে, যার মানে বোঝা যায় না। বিমলের আকর্ষণটা সে খানিক খানিক বুঝতে পারে এবং বিশ্বাস করে ও তার নিজের রচনা, কিন্তু বিমলের দিকে তাহাকে এমন করিয়া ঠেলিয়া দিতেছে কীসে? যেখানে সে থামিতে চাহিয়াছিল সেখানে থামিতে পারে নাই, যেখানে আসিলে ভয়ের কথা সেখানে আগাইয়া আসিয়াছে, – বিপদের মধ্যে, অনিশ্চয়তার মধ্যে, যে কোনো সাংঘাতিক সম্ভাবনার মধ্যে। বিমলের চোখের ভাষা যে কোনোদিন মুখর হইয়া উঠিতে পারে।...
>
> কিন্তু যে অদৃশ্য শত্রু তাহাকি বিমলের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে তার সঙ্গে রফা করিবে কেমন করিয়া! কতদিন সে বিমলের কাছে ছুটিয়া গিয়াছে – কেন গিয়াছেনা জানিয়া। ইহার সঙ্গে লড়াই চলে না।
>
> একেবারে খেলা ছাড়িয়া দিবে কি না এত রাত্রে ছাদে দাঁড়াইয়া শান্তা তাহাই ভাবিতে লাগিল।[১]

যে-চক্রান্ত 'বিমলের দিকে তাহাকে এমন করিয়া ঠেলিয়া দিতেছে', সেই 'অদৃশ্য শত্রু' নিঃসন্দেহে লিবিডো। যে-বিমলের জন্য শান্তার এই মনোদৈহিক অস্থিরতা, সেই বিমল তাকে শরীরী সান্নিধ্যে পেতে চাইলেও শান্তা প্রত্যাখ্যান করে। বিমলের সঙ্গে তার প্রেমময় সম্পর্ক সমাজ-সংস্কারের কারণে পরিণতিপ্রাপ্ত হয় না। বিমল তাকে অধরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইলেও সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সমালোচকের মতে, 'স্বামীর দখলদারি মনোভাবের ফলে তার দাম্পত্যপ্রণয় নিষ্ঠুর পীড়নে বিধ্বস্ত হওয়ায় শান্তা অবচেতন মনে স্বামীবিমুখ। সন্দেহ নেই, অবচেতন মনে প্রণয়বাসনার অতৃপ্তিই তাকে করেছে বিমলমুখী। অচেতন-অবচেতনে সে বিমলকেই স্বামী হিসেবে শেষ পর্যন্ত বরণ করলেও তার আহবানে গৃহত্যাগের পক্ষে অনুকূল সাড়া দিতে

১. *জীবনের জটিলতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২-৪৩৩

ডারেনি। এক্ষেত্রে হিন্দুনারীর বিবাহসংক্রান্ত কুসংস্কার এবং অধরের প্রতিশোধপরায়ণতার ভয় এই দুইয়ে মিলে সে হয়ে পড়ে সিদ্ধান্তহীন।'[১]

স্বামী-সংসারের বন্ধন ছিন্ন করতে শান্তার কষ্ট হয়। তার দ্বিধাদ্বন্দ্বময় জীবনযাপনের একপর্যায়ে একদিন অধর পাশের বাড়ি থেকে শান্তা-বিমলের নিবিড় আলিঙ্গনের দৃশ্য দেখতে পায়। স্ত্রীর এই অনাচার সে মানতে পারে না। তাই শান্তাকে সে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করে। শান্তাও ছাদ থেকে উঠানে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। শান্তার এ মৃত্যুর জন্য অবশ্য বিমলকেও দায়ী মনে করে তার বোন প্রমীলা :

> শান্তার মৃত্যুর জন্য প্রমীলা মনে মনে বিমলকে অনেকখানি দায়ী করিয়াছিল। শান্তা যে খেলা করিতেছিল সেটা সে পছন্দ করে নাই, শান্তাকে সে একেবারে নির্দোষ মনে করে না, কিন্তু খেলা করার অপরাধে বিমল ওকে অতবড় শাস্তি কি করিয়া দিল, বিমল দৈত্য না দানব ?[২]

এ উপন্যাসে বিমল-প্রমীলাদের সাংসারিক অভাব-অনটনের চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি তাদের প্রণয়সম্পর্কের তথ্যও প্রদর্শন করেছেন মানিক। অভাব-অনটন, অসুস্থতাই এদের প্রতিদিনকার বিষয়। এদের পিতা সামান্য চাকরি করে, মা অনুরূপাও অসুস্থ। পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা নিয়ে প্রমীলা সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকে। তাদের সংসারের চালচিত্র লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে :

> আজকাল আর সকালে আলুভাতে ভাত হয় না, পাঁচুর আর তার পেটের বোন অনিলার জন্য দু পয়সার মুড়ি বরাদ্দ আছে– কিংবা সকলের জন্য রাত্রে যে আটার রুটি হয় বাড়িতে থাকিলে তারা তাই খায়। বিমলের জন্য বাড়িতে জলখাবারের কোনো ব্যবস্থা নাই কিন্তু বাড়ির বড়ো ছেলে বলিয়া মাসের প্রথমে জলখাবারের দরুন তাকে তিনটি টাকা দেওয়া হয়। প্রমথ নিকটস্থ চায়ের দোকানে খবরের কাগজ পড়িতে গিয়া কিছু খাইয়া আসে কি আসে না সে খবর কেহ পায় না।
>
> প্রমীলার জন্য কোনো ব্যবস্থা নাই। বিকালে ভাইবোনদের সঙ্গে সে পাউরুটি ভাগ পায়, কিন্তু সকালে তার ক্ষুধার সম্ভাবনাকে কেহ স্বীকার করে না।[৩]

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক, কথাশিল্পী মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

২. *জীবনের জটিলতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩

৩. *জীবনের জটিলতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭

শান্তার মৃত্যুর পর বিপত্নীক অধর প্রমীলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এতে সকলে রাজি হলেও বিমল রাজি হতে পারেনি। কারণ, বিমল জানে, নগেনের সঙ্গে প্রমীলার রয়েছে প্রেমসম্পর্ক। কিন্তু নগেন প্রমীলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে; তার অজান্তে লাবণ্যের সঙ্গে প্রেমসম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, এবং একসঙ্গে লক্ষ্ণৌ ভ্রমণে যায়। এজন্য প্রমীলা নগেনের মুখোমুখি হতে তার বাড়ি যেতে চায়। তবে বিমল বোনকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য স্টেশনের ওয়েটিং রুমে নগেন-প্রমীলার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। নগেনের প্রতারণা ও বোনের করুণ পরিণতিতে বিমল বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এ-পর্যায়ে প্রমীলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় অধর। প্রমীলা প্রথমে আপত্তি করলেও অভাবী সংসার থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এবং মায়ের পরামর্শে সম্মতি জ্ঞাপন করে। যদিও অধর এই প্রস্তাব দিয়েছে মূলত বিমলের প্রতি প্রতিশোধের মানসিকতা থেকে। এদিকে নগেনের প্রতারণা এবং জীবনের নানা জটিল সমীকরণে ক্ষুব্ধ প্রমীলা যখন আত্মহত্যার চিন্তায় জাগ্রত, তখন তাকে বাঁচাতে আসে ভাই বিমল। শান্তার স্মৃতি ভুলতে সে প্রমীলাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রত্যয়ী হয়।

অধর সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়; বিকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন। অধরের সঙ্গে বিমলের ট্রামে প্রথম পরিচয়। তখন থেকে অধরকে সে একজন জীবনযোদ্ধা হিসেবে অনুমান করেছিল। তবে বিমলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই অধর তাকে শত্রু ভেবেছে। বিমলকে অপমান করতেও সে ছাড়েনি।

লাবণ্য শিক্ষিত ও আধুনিক নারী। বিমলের প্রতি লাবণ্য প্রেমাকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হলেও বিমল তাতে আগ্রহ দেখায়নি। বিমলের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে নগেনের প্রণয়সঙ্গী হয়। তবে বিমলের কাছ থেকে নগেনের বহুগামী স্বভাবের কথা জানতে পেরে সে লজ্জিত হয়, এবং বলে :

> প্রমীলার কথা আমি জানি। কিন্তু আমার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ না গেলে নগেন বিভার সঙ্গে দার্জিলিং যেত। বিভাটা বোকা, ছ মাস পরে আর কার সঙ্গে নগেন কোথায় যেত কে জানে। আমি এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছি। অনেকগুলি মেয়েকে বাঁচাচ্ছি, নিজের জীবনযাত্রাকে সহজ করছি।[১]

জীবনের জটিলতা উপন্যাসের তিনটি প্রধান পুরুষ চরিত্র ব্যর্থ ও অসুখী। উপন্যাসে বিমল শান্তাকে ভালোবেসেও তাকে পায়নি। অধরও তার স্ত্রীর ভালোবাসা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। নগেন এক নারী থেকে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছে। অপরদিকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় তিন নারীচরিত্রও ব্যর্থজীবনের ঘানি টেনেছে। তারা জীবনে কোনো শান্তি পায়নি। লাবণ্য বিমলকে ভালোবেসে নগেনের সঙ্গে জীবনযাপন করেছে।

---

১. *জীবনের জটিলতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩

বিমলকে কেন্দ্র করে শান্তা যে স্বপ্ন দেখেছিল তাও পূর্ণ হয়নি। প্রমীলাও তার কাঙ্ক্ষিত জীবনের স্বাদ উপভোগ করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের উদ্ধৃতি স্মরণীয় :

> ব্যক্তির মনের ও ব্যক্তিত্বের জটিল রহস্যের উন্মোচন ঘটেছে *জীবনের জটিলতা* উপন্যাসে। এই উপন্যাসের মানুষগুলো বর্তমান সময়ের আত্মখণ্ডিত মানুষ; অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে তারা উত্তরণ চায় ঠিকই; কিন্তু এই চাওয়াটা নাটকীয় কায়দায় ঘটে নি, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছে। জীবনের কোনকিছুই রাতারাতি ঘটে না। এই উপন্যাসেও চরিত্রগুলোর চাওয়াটা সেভাবে ধীরে ধীরে ঘটেছে। ...মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি আর তাঁর গভীর জীবনবোধের কারণে – মানুষের এই হয়ে-ওঠা, গড়ে ওঠার ব্যাপারটি – কোনো পরিকল্পিত 'ছকে'র চাহিদাকে উপেক্ষা করে এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।[১]

জীবনের জটিলতা উপন্যাসটি সমকালীন কলকাতার প্রতিবেশে রচিত। মানিকের ইতঃপূর্বে রচিত উপন্যাসের চরিত্রের ওপরে যেভাবে রহস্য বা রূপকের প্রলেপ থাকে *জীবনের জটিলতা*তে তা নেই। একটি কঠিন বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে এ উপন্যাসের ভিত্তিভূমি চিত্রিত হয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে ও বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত বিমল প্রমীলার মাকড়ি ধার নেয়, ট্রামের ভাড়া ফাঁকি দিয়ে সে ভাবে চার পয়সা আয় করেছে। বিমল বিভিন্ন অফিসে ঘুরে বেড়ালেও কোনো চাকরি পায় না। অবশেষে একটি পত্রিকায় প্রুফ রিডারের চাকরি নিয়ে বাড়ি ফেরে। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ যথার্থই বলেছেন :

> এই উপন্যাসে অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা কখনো বিশ্বাস্যতা বা সম্ভাব্যতা অতিক্রম করে না। *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে বা অতসী মামী গল্পে চরিত্র, ঘটনা ও পটভূমির উপরে যে-স্বপ্রাঞ্জন লেগে ছিল, *জীবনের জটিলতা* তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বহির্বাস্তব ও অন্তর্বাস্তব – দুদিক থেকেই তা দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সাবলীল ও শক্ত, সুস্থ ও পরিণত মনের রচনা। সেদিক থেকে *জীবনের জটিলতা* মানিকের প্রথম পর্যায়ের একটি প্রতিভূ-উপন্যাসও বটে।[২]

অবশ্য একথা মানতেই হবে যে, *জীবনের জটিলতা* উপন্যাসের প্রতিপাদ্য নিরূপণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটাই দ্বিধাবিচলিত। সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, "বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের চিত্র থাকা সত্ত্বেও মানিকবাবু এখানেও 'ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাতে' বিপর্যস্ত।"[৩]

---

১. সৌভিক রেজা, 'জীবনের জটিলতা : মানুষের হয়ে ওঠার কথন-ক্রিয়া', ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবর্ষ স্মরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪

৩. সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 'ফ্রয়েড থেকে মার্ক্স, নারায়ণ চৌধুরী (সম্পা.), মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

অমৃতস্য পুত্রাঃ

অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮)[১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজচেতনাবাহিত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। এ-উপন্যাসে সমাজ-অন্তর্গত ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান-চিত্র গুরুত্বের সঙ্গে অঙ্কন করেছেন ঔপন্যাসিক। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সংকটও এ উপন্যাসে ভাষারূপ পেয়েছে। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বীরেশ্বর। তিনি বিত্তবান ও ভোগবাদী প্রকৃতির। প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এজন্য প্রথম স্ত্রী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পুত্র শ্যামলালকে নিয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেন। বীরেশ্বরের দ্বিতীয় বিয়ে, সংসারে মায়ের অপদশা ও গৃহত্যাগের জন্য শ্যামলাল পিতা বীরেশ্বরকে কখনোই ক্ষমা করতে পারেনি।

বীরেশ্বরের জীবনযাপন জৌলুশময়; আরাম-আয়েশের পূর্ণ। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতিনি নিয়ে তাঁর সংসার পরিপূর্ণ। গৃহের সর্বত্রই আভিজাত্যের ছাপ। কেজো-অকেজো মানুষের আনাগোনায় তাঁর সংসার পরিপূর্ণ। যে-এলাকায় তাঁর বসবাস, সেটিও আভিজাত্যময়, স্বতন্ত্র। অনুপমের দৃষ্টিকোণ-উৎসারিত উপন্যাসের একটি বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> বড়ো তিন তলা বাড়ি, সামনে ছোটো একটা বাগান। শহরের এই অংশ নির্জন ও গম্ভীর, কারণ, একটা বাড়িও বাগানবাড়ি নয়, পথের দুদিকের প্রায় সবগুলিই সামনে বাগানওয়ালা বাড়ি। বাড়িগুলি যেমনই হোক, বাগানগুলি যেন বেঁটে বেঁটে উদ্ভিদের সাজানো গোছানো দোকান, অল্প একটু জায়গায় যতগুলি সম্ভব অরণ্যানীর প্রতিনিধিকে ঠাঁই দেওয়া হইয়াছে।... দোতলার অন্দরে, যেটা আসবাবে ঠাসা প্রকাণ্ড একটা ঘর এবং যেখানে দুপুরবেলা বাড়ির মেয়েরা খেলে তাস এবং পাড়ার মেয়েরা বেড়াইতে আসিলে বসে মজলিশ।[২]

অন্যদিকে বীরেশ্বরের প্রথম স্ত্রী তার শ্যামলালকে নিয়ে যাপন করেছেন দারিদ্র্যব্যঞ্জক জীবন। সুযোগ থাকলেও তিনি বীরেশ্বরের অর্থ কিংবা অনুগ্রহ নিয়ে বাঁচতে চাননি। পুত্র শ্যামলালকে কায়ক্লেশে মানুষ করে তুলেছেন তিনি। শ্যামলালের পুত্র অনুপমই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। শ্যামলালের অকালমৃত্যুর পর

---

১. "অমৃতস্য পুত্রাঃ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে।... প্রকাশক ছিলেন কাত্যায়নী বুক স্টল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি বঙ্গশ্রী পত্রিকায় মাঘ, ১৩৪৩ থেকে পৌষ, ১৩৪৪ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।" (দ্রষ্টব্য : সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১)

২. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩

তার স্ত্রী সাধনা পুত্র অনুপমকে নিয়ে যাপন করেন ছিমছাম অথচ গোছানো একটি জীবন। উপন্যাসে তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি, অনুপমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শঙ্করের দৃষ্টিকোণ-উদ্ভূত বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া শঙ্কর একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। মনেমনে সে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, নোংরা স্যাঁতসেঁতে একটা বাড়ির, যেখানে বাতাসে মেশানো থাকে ভোঁতা দুর্গন্ধ, মানুষের মুখে থাকে ব্যর্থ লোভের ছাপ, চারিদিকে ছড়ানো থাকে ভাঙা জীবনকে জোড়াতালি দিয়া দিন কাটানোর আয়োজন। এ বাড়ির ইঠান ভিজা কিন্তু স্যাঁতসেঁতে নয়, এবাড়ির বাতাসে গন্ধ শুধু রান্নার, এ বাড়ির মানুষের মুখে ছাপ শুধু অভাবের, এ বাড়িতে দিন কাটানোর আয়োজন শুধু কম দামি।
>
> তা ছাড়া এত ছোট একটা বাড়িতে এত তুচ্ছ সব আসবাব ও জিনিসপত্রগুলিকে কেহ যে এত যত্নে গুছাইয়া রাখিতে পারে, শঙ্করের সে ধারণা ছিল না। মেঝের যেখানে যে জিনিসটি থাকার কথা সেইখানে সেই জিনিসটি রাখা হইয়াছে, একচুল এদিক ওদিক নয়। জানালার জিনিস আছে জানালায়, তাকের জিনিস আছে তাকে, দেয়ালের জিনিস আছে দেয়ালে, – দেখিলেই বুঝা যায় সর্বদাই একটি সতর্ক দৃষ্টি এই ছোটোবড়ো স্থাবর পদার্থগুলিকে পাহারা দেয়, জানালায় পানের ডাবরের ডানদিকে রাখা কুচানো সুপারির ছোট পিতলের বাটিটি যেন বাঁ দিকে কখনো না আসেতাই দেখিবার জন্য।
>
> বসিতে দেওয়ার জন্য মাদুর বিছানোর সময় প্রমাণ পাওয়া গেল, এ সতর্ক দৃষ্টি কার।[১]

বোঝা যায়, অনুপমের সংসারনিষ্ঠ মা সাধনাই তাঁর ছোটোখাটো সংসারকে পরম প্রযত্নে আগলে রেখেছেন। সর্বত্রই তার হাতের নন্দিত ছাপ। সংসারে অর্থকষ্ট আছে, কিন্তু রুচি তার দারিদ্র্যব্যঞ্জক নয়। স্বামী শ্যামলালও তাঁর যাপিত জীবনে ছিলেন নির্লোভ, চিন্তা- চেতনায় স্বচ্ছ ও আদর্শনিষ্ঠ। অনুপমকে তারা তাদের আদর্শে বড়ো করে তুলতে চেয়েছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর এই পরিবারটি তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে, বীরেশ্বরের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রেখেছে। পঁচিশ বছরের ব্যবধানে শ্যামলালের পুত্র অনুপমের সঙ্গে পিতামহ বীরেশ্বরের দেখা হয়। তিনি অনুপমকে বাসায় নিয়ে যান এবং প্রসঙ্গক্রমে পুত্র শ্যামলালের মৃত্যুসংবাদ জানতে পারেন। শ্যামলালের অকাল মৃত্যুতে বীরেশ্বর ভীষণভাবে মর্মাহত হন। এরপর তিনি অনুপমদের বাড়ি আসেন এবং পুত্রবধূ সাধনার সঙ্গে কথা বলেন। সন্তানের মৃত্যুসংবাদ না জানানোর জন্য তিনি সাধনাকে দায়ী করেন। সাধনাও এ-প্রসঙ্গে তার সীমাবদ্ধতার কথা ব্যক্ত করে। মূলত তাদের পরিবারে বীরেশ্বর ছিলেন 'চিরদিন বর্জনীয়'। তার সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন কিংবা যোগাযোগের ব্যাপারে শ্যামলালের সুস্পষ্ট বারণ ছিলো। সাধনার প্রতি তার নির্দেশ ছিল –

---

১. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮

'আমি যদি হঠাৎ মরে যাই সাধনা, আর তোমার টাকার দরকার হয়, বাবার কাছে হাত পাতার বদলে তুমি অসতী হয়ে যেয়ো, তোমার রূপ আছে, কলকাতা শহরে বড়লোকও আছে অনেক। ... তা ছাড়া, কী হইবে বেশি টাকা দিয়া? এ তাদের নিজের বাড়ি, সুতরাং থাকার ভাবনা নাই। যে টাকা হাতে আছে, সে টাকা শেষ হওয়ার আগেই অনুপম টাকা আনিতে পারিবে।'[১]

স্বামীর এই আদেশের প্রতি বরাবরই একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করেছে সাধনা। যার পরিপ্রেক্ষিতে পুত্র শ্যামলালের মৃত্যুসংবাদ বীরেশ্বরকে জানানো হয়নি। অবশেষে অনুপমের মধ্যস্থতায় এবং বীরেশ্বরের ইচ্ছানুক্রমে দু-পরিবারের দূরত্ব কমে আসে এবং তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি; যদিও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে দু-পরিবারের ব্যবধান কখনো ঘোচেনি; কিংবা সেই সুযোগও তৈরি হয়নি। বিত্তই হয়ে উঠেছে দুই পরিবারের মিলনের প্রতিবন্ধক :

এমনিভাবে একই বংশের দুটি শাখা কাছাকাছি আসিল, কিন্তু মিলিত হইল না। বীরেশ্বরের একটি পুত্রবধূ স্টোভ ধরাইতে হিসাব করিয়া স্পিরিটের উত্তাপটুকুর অপচয় পর্যন্ত বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন এবং একটি পুত্রবধূ বিষাদের বেহিসাবি প্ররোচনায় মুখে খাবলা খাবলা মাখিতে লাগিলেন দশ বোতল স্পিরিটের দামের এক কৌটা ক্রিম। বীরেশ্বরের একটি নাতির বাজেটে এক পয়সার পান খাওয়া হইয়া রহিল বিলাসিতার খরচ এবং একটি নাতি একটার পর একটা পুড়াইয়া চলিল দশটা পানের দামের সিগারেট।[২]

এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনুপম। আজন্ম দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা অনুপমের মধ্যে হীনম্মন্যতা তৈরি হয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সে রাত জেগে অধ্যয়ন করে। কিন্তু শেষাবধি সে পিতার আদর্শে স্থিত হতে পারেনি। শেষপর্যন্ত সে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরিচয়ের প্রথম থেকেই সে বীরেশ্বরের অর্থ ও ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। বীরেশ্বরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন সে গাড়িতে চড়ে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়িতে গেছে। তার মনে হয়েছে, এ বাড়ির যে কোনো একটি আসবাব-পত্র বিক্রয় করলেই পিতার চিকিৎসা সম্ভব হতো। যদিও এখানকার প্রত্যেকের ব্যবহার তার কাছে মনে হয়েছে কৃত্রিম। তাই ঘণ্টা তিনেক কোনো রকমে কাটিয়ে সে এই পরিবেশ থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির জন্য বেরিয়ে পড়েছে। তার কেবলই মনে হয়েছে :

---

১. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪

২. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩

> এ বাড়িতে অকারণে মানুষের মনে বড়ো কষ্ট। কোনো অভাব না থাকায় সকলের স্বভাব গিয়াছে বিগড়াইয়া, জীবনে রসকষ যা আছে সব শক্ত, জমজমাট, যেমন তেমন উত্তাপে গলিয়া জীবনকে রসালো করিতে চায় না। কোন দৃষ্টিতে ইহাদের দেখিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া অনুপম শেষ পর্যন্ত অপরিচয়ের সংকোচ কাটাইয়া উঠিতে পারে না।[১]

অবশ্য অনুপমের এই প্রতিক্রিয়া সাময়িক। শেষপর্যন্ত সে এই জীবনকেই কাম্য বলে মনে করেছে। অর্থ-বিত্ত ও প্রতিষ্ঠার মোহে হারিয়ে গেছে তার পিতামাতার আরাধ্য আদর্শনিষ্ঠ জীবন।

ছাত্রাবস্থায় মায়ের আত্মীয়া তরঙ্গের সঙ্গে অনুপমের হার্দ্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়। বেকার অনুপমকে সীমিত সাধ্য থেকে প্রায়ইসাহায্য করে তরঙ্গ; তার পকেটে লুকিয়ে টাকা রাখে। একরাতে তরঙ্গ অনুপমকে নিয়ে রাস্তায় বের যেতে চাইলে সাধনা বাধা দেয়। তরঙ্গ এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পরদিন শঙ্করদের বাড়ি যায়। দুমাস পর সে অনুপমের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ চিঠি লিখে আত্মহত্যা করে। তরঙ্গের আকস্মিক মৃত্যুতে অনুপম কিছুটা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক মিলনোৎসবে। এখানে সে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কটূক্তি করায় সকলে তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়। এসময়ে তার সঙ্গে আশালতার পরিচয় হয়, এবং তাদের সম্পর্ক বিয়েতে রূপ নেয়।

এ উপন্যাসে সাধনা এক সংগ্রামী নারী চরিত্র। স্বামী শ্যামলালের প্রতি তার আনুগত্য সীমাহীন। স্বামীর অসহায়ত্বের সুযোগ সে কাউকেই দেয়নি, এমনকি তার শ্বশুরকেও নয়। স্বামীর আদেশ শিরোধার্য জেনে সে শ্বশুরের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। অনুপম বীরেশ্বরের কাছ থেকে বিলেত যাওয়ার টাকা চেয়েছে জেনে সে ভীষণ কষ্ট পায়। পুত্রের আদর্শচ্যুতির জন্য সে স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়িতে চলে যায়। সাধনা চরিত্রের মধ্যে সাংসারিক দায়িত্ববোধের পাশাপাশি মানবিকবোধের প্রতিফলন লক্ষণীয়। সে অনুপমকে মাতৃস্নেহে বড়ো করেছে, তরঙ্গকে আশ্রয় প্রদান করেছে এবং সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছে। সাধনার মধ্যে রয়েছে বাঙালির আজন্ম সংস্কারবোধ। এজন্য সে তরঙ্গের সঙ্গে অনুপমের ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। আবার তরঙ্গের আত্মহত্যার পর সে সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় শ্বশুরের সহযোগিতা প্রার্থনা করে। পুত্রবধূ আশালতার প্রতি ছিল তার সদা সজাগদৃষ্টি। অল্পদিনের মধ্যে আশালতা বুঝতে পারে –

---

১. *অমৃত্রস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৬

কিছুদিন সাধনার মনের মতো হইবার চেষ্টা করিয়া আশালতা দেখিল, কাজটা বড়ো কঠিন। সাধনার কাছে ফাঁকি চলে না। মানুষটা সহজ, শান্ত ও মমতাময়ী বটে, কিন্তু গোঁজামিলের ব্যাপারে বড়ো কড়া। খারাপ লোককে খারাপ লোক হিসাবে যদি বা খানিক কাছে ঘেঁষিতে দেন, ভালোমানুষ সাজিয়া আপন হইবার চেষ্টা করিলে খারাপ লোক তাঁর কাছে একেবারেই প্রশ্রয় পায় না।

মানুষ বশ করিবার যত উপায় জানা ছিল, তার সবগুলিই আশালতা খাটাইবার চেষ্টা করিয়া দিখিল। কিন্তু দেখা গেল, ফলটা আরো খারাপ হইয়াছে। কোনো চেষ্টা না করিলেই বরং ভালো হইত; সাধনার মনের মতো হইতে গিয়াই সাধনার কাছে নিজের পরিচয়টা আরো বেশি পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে।[১]

সাধনার কাছে প্রতারণার কোনো স্থান নেই। মূলত ছেলের এ বিয়ে সে মেনে নিতে পারেনি। তার এতদিনের শ্রম, ত্যাগ, একাগ্রতা – সবই আশালতার কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শ্বশুরের আর্থিক প্রলোভন সাধনা জয় করলেও আশালতার প্ররোচনায় অনুপম বীরেশ্বরের অর্থের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। এ ঘটনা শুনে তাই 'সাধনা মড়ার মতো বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। পরদিন সকালে ছোটো একটি বাক্স সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন দেশে। একা।'[২]

উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলির মধ্যে তরঙ্গ উল্লেখযোগ্য। সে সাধনার ঠাকুরপো বিজনের কন্যা। তরঙ্গের বাবা ও স্বামী দুজনই অধ্যাপক। এঁদের কাছ থেকে সে অনেক কিছুই শিখতে পেরেছে। যদিও এই শিক্ষাগ্রহণ ব্যক্তিগত জীবনে কোনো কাজে আসেনি। তার পরিণতি প্রদর্শনে লেখক বাঙালি নারীর সমাজবাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে :

দুজন প্রফেসরের কাছে কতকিছুই তরঙ্গ শিখিয়াছে। তবে বাঙালির মেয়ে-বউ যা কিছু শেখে শুধু কল্পনা করার জন্যই শেখে – এবং কল্পনা করিতে করিতে কারো কারো কল্পনা আকাশপাতাল ছাড়াইয়া ও ছড়াইয়া যায়। যন্ত্রের মতো এটা করিয়া গেলে কেউ বিশেষ কিছু মনে করে না, বড়ো জোর আনমনা উড়ুউড়ু স্বভাবের জন্য একটু নিন্দা রটে। লোকে বলাবলি করে যে, এর বড়ো আনমনা উড়ুউড়ু স্বভাব, এ যদি সর্বনাশ না করে ছাড়ে তো আমার কান কেটে নিয়ো! কিন্তু এমন উদভ্রান্ত যদি কারো কল্পনা হয় যে, লোকের বলাবলির ভয় না করিয়া কল্পনাটা পরিণত করিতে যায় কাজে, তখন বাধে সাংঘাতিক গোলমাল। এমন গোলমাল বাধে

১. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭

২. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২

যে, তরঙ্গের স্বামীর মতো পুরাপুরি আধুনিক স্বর্গীয় স্বামীর আধা-আধুনিক আত্মীয় স্বজনের আশ্রয়ে সে টিকিতে পারে না।[১]

সংসারজীবন শুরুর দুবছরের মধ্যে তরঙ্গের স্বামীর মৃত্যু হয়। এরপর সে শ্বশুরালয় ছেড়ে অনাত্মীয় অথচ অতি ঘনিষ্ঠ সাধনার বাড়িতে নিজ খরচে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তার আগমনে সাধনা আশ্চর্য ও আহত হয়। তরঙ্গ তার সংস্কারমুক্ত চিন্তাচেতনা সম্পর্কে সাধনাকে অবহিত করে :

অনেকক্ষণ ধরিয়া সাধনাকে বুঝাইতেছিল – তার জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সাধনার কথা। স্তরে স্তরে জীবনকে সে ভোগ করিয়া ফেলিবে, এখন তো উনিশ বছর বয়স তার, চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ঘরের কোণে সে দেহমনকে বশ করিবার শক্তি অর্জনের জন্য তপস্যা করিবে, ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি শুধু অন্তঃপুরে ঘুরিয়া মেয়েদের বাঁচিয়া থাকিতে শিখাইবে, আর সেই সঙ্গে নিজেও শিখিয়া লইবে কী করিয়া অজানা-অচেনা মেয়েদের নানা কথা শিখাইতে হয়, তারপর আরম্ভ করিবে আসল কাজ – প্রবল প্রকাশ্য আন্দোলন, দেশকে যা ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, ঘরে ঘরে হইচই বাধাইয়া দিবে।[২]

তরঙ্গ বৈচিত্র্যময় চরিত্র; ব্যতিক্রমধর্মী। সে শঙ্কর ও অনুপম – কারো প্রেমই অস্বীকার করেনি। তবে অনুপমের প্রতি তার দুর্বলতা তুলনামূলক বেশি। সাধনার সঙ্গে মনোমালিন্যের পরিপ্রেক্ষিতে সে এ-গৃহ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। সেখানে অনুপম তার সাথে দেখা করতে গেলে সে অসন্তুষ্ট হয়। সে অনুপমকে ভুলতে চায় এবং এজন্য সে তাকে দুমাস তার বাড়িতে আসতে নিষেধ করে। তার ধারণা :

দু মাস অনুপমকে না দেখিলেই মনের অসুখটা সারাইয়া ফেলিতে পারিবে, এ রকম আশা পোষণ করা তরঙ্গের মতো অহঙ্কারী মেয়ের পক্ষে আশ্চর্য নয়। এদিকে অনুপমও বোকা নয়। দু মাসের মধ্যে কতবার সে যে তরঙ্গের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। কিন্তু তরঙ্গ না দিল তাকে এতটুকু আমল, না বলিতে চাহিল তার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা। তারপর একদিন নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চড়া মেজাজে এমন কড়া ধমকই সে দিল অনুপমকে যে, তারপর মাস দুই আর সে এমুখো হইল না।[৩]

কিন্তু দুমাস পরে অনুপম তরঙ্গদের বাড়িতে গেলে সে দেখতে পায় তরঙ্গের মৃতদেহ :

---

১. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫
২. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬
৩. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬

> তরঙ্গ তখন নিজের ঘরে কড়িকাঠে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতেছে, পুলিশ আসিবার প্রতীক্ষায় তাকে নামানো পর্যন্ত হয় নাই। অনুপমের নামে চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে কিন্তু সে ভোলে নাই। অনুপমের নাম লেখা খামখানা সীতার জিম্মায় ছিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে খামখানা অনুপমের হাতে দিল। মোটা ভারী খাম। হাতে করিলেই বুঝা যায়, তরঙ্গ অনুপমের নামে শুধু চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যায় নাই, মস্ত চিঠি রাখিয়া গিয়াছে।[১]

মূলত অধ্যাপক বাবা ও স্বামীর আদর্শকে মিলিয়ে তরঙ্গ নিজের জীবনে একটা পৃথক দর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু একদিকে শঙ্করের প্রতি ভালোবাসা অন্যদিকে অনুপমের জন্য প্রগাঢ় অনুভূতির দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হয় এবং শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে সে মুক্তির পথ খোঁজে। ঘরে ঘরে আলোড়ন তোলার যে প্রতিজ্ঞায় সে প্রদীপ্ত ছিল তা শেষাবধি অসম্পূর্ণই থেকে গেল।

উপন্যাসে বীরেশ্বর-পুত্র রামলাল পৈতৃকসূত্রে বিত্তশালী। সে আদালতে আইনি পেশায় যুক্ত। বাড়ির লোকের সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার স্বতন্ত্র। জীবনের সকল বিষয়েই সে নির্বিকার। এমনকি প্রচুর মদ্যপানেও তার নেশা হয় না। রামলাল নিজে মদ্যপান করলেও পুত্র শঙ্করের মদ্যপান সে মানতে পারে না। অবশ্য এজন্য শঙ্করকে সে দোষারোপও করে না। এক পর্যায়ে রামলাল তাঁর খাপছাড়া জীবন থেকে বেরিয়ে এসে সকলের সঙ্গে মিশতে চায়, যা উপন্যাসের ঘটনাধারার পরিপ্রেক্ষিতে অস্বাভাবিক ও খাপছাড়া বলে প্রতীয়মান হয়।

রামলালের পুত্র শঙ্কর। আভিজাত্য ও ধনগৌরবের মধ্যে তার বেড়ে-ওঠা। সে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বপ্নবিলাসী। দারিদ্র্যকে সে ভীষণ তাচ্ছিল্য করে। তাই সে দরিদ্র অনুপমের বাড়িতে গিয়ে অস্বস্তিবোধ করে :

> রঙ-চটা সদর দরজা, খড়ি দিয়া নম্বর লেখা, তাও কাঁচা হাতের। বাড়ির বাহির হওয়ার সময় হইতে শঙ্কর অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, বড়ো রাস্তায় গাড়ি রাখিয়া গলিতে প্রবেশ করার পর সে অস্বস্তি হু হু করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নোংরা গলি বলিয়া নয়, গরীব আত্মীয়ের বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া।'[২]

অনুপমদের বাড়িতে তরঙ্গকে দেখার পর শঙ্করের মধ্যে প্রণয়ভাবনা জাগ্রত হয়। তরঙ্গের কাছে সে নিজের ভালোবাসা ব্যক্ত করে এবং একদিন নিলর্জ্জভাবে তরঙ্গের হাত চেপে ধরে। তরঙ্গের কাছ থেকে এ উন্মাদনার প্রশ্রয় না পেয়ে শঙ্কর রাস্তায় বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফেরার পথে শঙ্কর পার্কের জনসভায় উপস্থিত নেতাদের

---

১. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬

২. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭

মুখোশ উন্মোচন করে। সেখানে প্রতারক নেতা লীলাময় ঘোষালের বক্তব্য শেষে তাকেই উদ্দেশ্য করে বিনা ভূমিকায় বক্তব্য শুরু করে –

> 'বন্ধুগণ, অনাহূতভাবে আমি আপনাদের একটা সুপরামর্শ দিচ্ছি, আপনারা ন্যাকামি ছাড়ুন। আপনারা সকলেই ন্যাকা। কেন জানেন? আপনারা সকলে একের জন্য, দুয়ের জন্য, তিনের জন্য কাঁদেন, দশের জন্য কাঁদেন না। আপনারা অমানুষ, পশু, অসভ্য, বর্বর। আপনাদের লজ্জা করছে না এখানে বসে থাকতে?[১]

আবার বক্তৃতা শেষে সে লীলাময়ের সঙ্গেই হোটেলে গিয়ে মদপান করে এবং নানা স্থানে পিকেটিং করে। এ কারণে তার জেল হয়। একুশ দিনের জেলজীবন শেষে সে আবার পড়ালেখায় মন দেয়। এরপর সে তার মাকে নিয়ে তাদের গ্রামে বেড়াতে যায়। এসময় সে গ্রামের মানুষের প্রকট দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। একটি চিত্র :

> গোয়াল ঘরে আজ যে অনেক কাল ধরিয়া গোরু বাস করে না, সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। এ বাড়ির লোক দুধ খায় না। এমন কি, গোয়ালঘরের সম্মুখে বয়স্কা রমণীর কোলে পাঁচ-ছমাসের যে কাঠির মতো ক্ষীণ খোকাটি ক্ষীণস্বরে কাঁদিতেছে, সেও খায় না। কোথায় পাইবে? গোয়াল ঘরের দড়িতে তার সে কঙ্কালসার জননী ঝুলিতেছে, তার শুষ্ক, আলগা চামড়ার মতো স্তন দুটিতে দুধ থাকা সম্ভব নয়।[২]

গ্রামে এসে শঙ্কর শহরের প্রকৃত স্বরূপ শনাক্ত করতে পারে। তার মনে হয় –

> শহর একটা বিরাট আশ্রম, তাপসদের আড্ডাখানা। ধ্বংসের তপস্যা করিতে মানুষ শহরে যায়, ছোটোবড়ো অপমৃত্যুর লোভে মানুষ শহরে বাস করিতে ভালবাসে। জীবন বিস্বাদ হইলে মানুষের আসে বৈরাগ্য, জীবন বিষাক্ত হইলে মানুষের আসে শহুরে জীবনের লোভ।
>
> শহরে যারা যাইতে পারে না, গ্রামে যাদের বঞ্চিত বন্দি জীবনযাপন করিতে হয়, নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া তারা গ্রাম্য জীবনেও আনিবার চেষ্টা করে যতখানি পারে শহুরে ভাব।... না জানিয়া বুঝিয়া মূর্খের মতো নিজেকে, নিজের ভবিষ্যৎ বংশধরকে তিল তিল করিয়া বিনাশ করিয়া ভাবে জীবনযাপন করিতেছি – যথানিয়মে, যুগধর্ম অনুসারে – সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক বিধানের জোড়াতালি দেওয়া ফাঁদে পড়িয়া থাকার প্রয়োজন মিটানোর গভীর নিরানন্দে

---

১. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০০-৫০১

২. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৫

শহর ও গ্রাম কোথাও মানুষের জীবনযুদ্ধের নিয়ম, সংকেত ও কৌশলগুলি জানিবার বা শিখিবার ইচ্ছা নাই, জীবনের আসল উদ্দেশ্যের কথা ভুলিয়া গিয়া সকলে নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গে একটা উদ্ভট খাপছাড়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছে।'[১]

বলা বাহুল্য, শঙ্করের এই জীবনভাবনা তার আজন্মপরিচিত জীবনাচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত; একেবারেই প্রক্ষিপ্ত। হঠাৎ মনে হতে পারে, শঙ্করের মাধ্যমে মানিক সমাজপরিবর্তনের একটা ইতিবাচক জীবনার্থ প্রতিপাদন করতে চান। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, উপন্যাসের কোথাও এই পরিবর্তিত জীবনভাবনার আঁচই পড়েনি। ' লেখক মানিকই হয়ত এর কারণ। হয়ত মানিকের মধ্যেই এরূপ চিন্তার কোনো মীমাংসিত পরিপক্ব রূপ তখন পর্যন্ত স্থিত হতে পারেনি; কেবল অঙ্কুরিত হতে চলেছে বা দানা বাঁধতে শুরু করেছে।[২]

বীরেশ্বরের কন্যা সীতা এ উপন্যাসে অসুস্থ ও বিকারগ্রস্থ চরিত্র। বিধবা হওয়ার পর বাবার আশ্রয়েই তার বসবাস। মধ্যবয়সী সীতার ছিল বই পড়ার অভ্যাস। দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব ছাড়া সব ধরনের বই-ই সে পড়ে। তরঙ্গের আত্মহত্যার পর সীতার মনোবিকার স্পষ্ট হয়। অনুপমকে লেখা তরঙ্গের চিঠির কিছু অংশ সে নিজের কাছে রেখে দেয়। অনুপম ক্ষুব্ধ হলেও সে এগুলো ফেরত দেয়নি। অনুপমের সুস্থ ও সুন্দর জীবন সীতার গাত্রদাহের কারণ হয়। তার ধারণা তরঙ্গের জন্য অনুপম গভীর বেদনা অনুভব করবে এবং তরঙ্গের মতো সেও দেহত্যাগ করবে। কিন্তু অনুপমের তা হয়নি।

সীতার মধ্যে অর্থনৈতিক ভাবনা প্রকট। নিজের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকার পরও অধিক প্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিল তার। বীরেশ্বর তার নামে অর্থ লিখে দিলেও সীতা বলে– 'তুমি বুড়ো হয়েছ, আজ বাদে কাল চোখ বুজবে। দাদা তখন আমায় দূর দূর করে খেদিয়ে দেবে না? ...আমার নামে কটা টাকা লিখে দিয়েছ বলে কথা শুনতে দাদার এখন গায়ে জ্বর আসে। কটা টাকাই বা তুমি আমাকে দিয়েছ। তাও দাদার সইছে না। আমি এখানে থাকব না বাবা।'[৩]

আশালতা এ উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। সে শিক্ষিতা; জীবনযাপনে কৌশলী। সংস্কারহীন অবাধ স্বাধীন জীবনযাপনে সে আগ্রহী। অনুপমকে সে-ই প্রথম তার ভালোলাগার কথা ব্যক্ত করে। তরঙ্গের মৃত্যুর পর অনুপমের মনোলোকে যে শূন্যতা তৈরি হয় তা থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সে

---

১. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৫

২. সৈয়দ আজিজুল হক, কথাশিল্পী মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৩. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১

আশালতার প্রেমপ্রস্তাবে সাড়া দেয় এবং শেষাবধি বিয়ে করে। বিয়ের পর আশালতা স্ব-স্বভাবে পরিবর্তন আনতে প্রয়াস পায় বটে; কিন্তু আজন্মলালিত হীনতাবোধ থেকে তার মুক্তি ঘটে না। তার আত্মভাবনা লক্ষ করা যাক –

> তার বয়স একটু বেশি, চাল-চলন সাধনার মনের মতো নয়, কিন্তু সে জন্য দায়ী কি সে? নিজে দেখিয়া, নিজে পছন্দ করিয়া, নিজে ভালবাসিয়া, নিজে প্রস্তাব করিয়া অনুপম তাকে বিবাহ করে নাই?
>
> তা ছাড়া ধরিতে গেলে সেই তো অনুপমকে অনুগ্রহ করিয়াছে। যেমন অবস্থা বাড়ির, তেমনই অবস্থা অনুপমের নিজের, জানিয়া-শুনিয়া সে অনুপমকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিল, এটাই কি তার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় নয়, তার উদার প্রেমের পরিচয় নয় – যে প্রেম মানবীকে দেবীতে পরিণত করে?
>
> কিন্তু যতই রাগ হোক, যতই গা জ্বালা করুক, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার মতো বোকা আশালতা নয়। সাধনাকে জয় করিবার চেষ্টা সে ছাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু কোনোরকম বিরোধ সৃষ্টি করে না। ছেলের কীর্তিতে মর্মাহত সাধনার সমস্ত উপেক্ষা ও অবহেলা নীরবে সহ্য করিয়া যায়, মনের গোপন কোণে বিদ্বেষ জমাইয়া রাখে।[১]

বিবাহের প্রাক-পর্যায়ে এবং অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে আশালতার ব্যবহারে অনুপম ও সাধনা ছিল তুষ্ট। এরপর ক্রমশ সে সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার প্রয়াস পায়, নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাত ব্যস্ত হয়ে ওঠে; এবং স্বার্থঘনিষ্ঠ ভাবনা- চেতনায় আক্রান্ত হয়। আশালতা নিজে বিলেত যাবার ইচ্ছে থেকেই অনুপমকে বিলেতে যাবার জন্য প্ররোচিত করে, এবং পিতামহ বীরেশ্বরের কাছ থেকে অর্থপ্রার্থনার জন্য তাকে উপর্যুপরি তাগিদ দিতে থাকে। আশালতার প্ররোচনায় অনুপমও ঠাকুরদার কাছে বিলেত যাওয়ার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করে। তার এই পরিবর্তিত জীবনাদর্শ প্রত্যক্ষ করে স্বয়ং বীরেশ্বরও বিস্ময় প্রকাশ করেন। বীরেশ্বর ও অনুপমের প্রাসঙ্গিক কথোপকথন :

> তুই তোর বাবার টাকা দাবি করছিস, না অনু? রাগ করে আমায় ত্যাগ না করলে শঙ্করের বাবার মতো তোর বাবার জন্যে আমাকে যে টাকাটা খরচ করতে হত সেই টাকাটা, না? ...
>
> অনুপম ব্যাকুল হইয়া বলিল, না ঠাকুরদা, না। সত্যি তা নয়, আপনার কাছে সাহায্য চাইছি।
>
> তোর মার কথা ভেবেছিস অনু?...
>
> কিন্তু মার জন্যে আমার ফিউচারটা তো নষ্ট করতে পারি না। –

---

১. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭

বীরেশ্বর হঠাৎ রাগিয়া আগুন হইয়া বলিলেন, নিজের মাকে বাদ দিয়ে মানুষের ফিউচার কী রে বাঁদর? মার জন্য একদিন তোর বাবা আমার টাকার লোভ ত্যাগ করেছিল, সেই টাকার লোভে আজ তুই তোর মাকে ত্যাগ করছিস। বউমা তোকে মানুষ করতে পারেন নি অনু। ...রাগটা কমিতে কিছুটা সময় লাগিল বীরেশ্বরের। তারপর ঠিক যেন সাধনার মতো শ্রান্ত ও অসহায়ভাবে বলিলেন, চাইছিস যখন, টাকা আমি দেব অনু। না দিলেই বা বউমার কী লাভ হবে, যেভাবেই হোক বউমাকে তোরা মেরে ফেলবিই।[১]

এতৎসত্ত্বেও অর্থ-বিত্ত ও প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও ভোগবাদী জীবনের মোহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি অনুপম। মা সাধনার স্নেহ-ভালোবাসাও তার কাছে হয়ে গেছে গৌণ। তিরিশোত্তর কালপর্বে বাঙালি মধ্যবিত্তের পরিবর্তিত মূল্যবোধ, ধনতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার ক্রমবিস্তার্য স্বরূপই *অমৃতস্য পুত্রাঃ* উপন্যাসে মানিক প্রদর্শন করেছেন। আদর্শনিষ্ঠ শ্যামলালের পুত্র অনুপমের আদর্শচ্যুতিই এ-উপন্যাসে অর্জন করেছে শিল্পমূল্য।

অহিংসা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অহিংসা* (১৯৪১)[২] উপন্যাস বিপিন ও সদানন্দের আশ্রমিক ব্যবসার কাহিনি অবলম্বনে রচিত। রাধাই নদী তীরবর্তী শতবিঘার আশ্রমকে কেন্দ্র করেই এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এটি সমকালীন পরিসরে মানিকের একটি বিতর্কিত উপন্যাস। 'বিতর্ক কেবল নামকরণে নয়, এর প্রকৃতি বিচারে ও সমালোচনায় নানা বিতর্ক আছে।'[৩] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ-উপন্যাসকে অসফল ও দুর্বোধ্য বলে চিহ্নিত করে বলেছেন :

'অহিংসা' ... অবিমিশ্র অসাফল্যের উদাহরণ। (উপন্যাসটিতে) আশ্রমের ইতিহাসটি ভণ্ডামি, ধর্মান্ধতা এবং কখনও গোপন, কখনও প্রকাশ্য যৌন লালসার উদ্ভট লীলাক্ষেত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুর্বোধ্য আখ্যানে লেখকের কোন স্থির লক্ষ্য বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণচেষ্টা ও গ্রন্থাকারের নিজের জবানীতে উক্তি গ্রন্থের ঘোরালো আবহাওয়াকে আরও দুর্ভেদ্য করিয়াছে। মহেশ চৌধুরী, সদানন্দ, বিপিন, মাধবী, বিভূতি প্রভৃতি কোন চরিত্রই ঠিক বোধগম্যতার স্তরে পৌঁছায় নাই – ইহারা যেন অন্ধকার

---

১. *অমৃতস্য পুত্রাঃ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১-৫৪২

২. 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় "অহিংসা" উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে ... ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা থেকে। দু বৎসর ধরে প্রকাশের পর সমাপ্ত হয় ১৩৪৭-এর পৌষ সংখ্যায়।

ডি. এম. লাইব্রেরী "অহিংসা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন১৯৪১ সালে, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে।' (দ্রষ্টব্য : হায়াত মামুদ সম্পাদিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৫)

৩. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

কুয়াশার মধ্যে পরস্পরের সহিত ঠেলাঠেলি-সংঘর্ষ বাঁধাইয়া ও ক্ষণস্থায়ী, মূল্যহীন সম্বন্ধে জড়িত হইয়া এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে।[১]

উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে সমকালে নানা আলোচনা-সমালোচনা ছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনকে সমালোচনা করেই এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু ছিলেন বাম-ঘরানার লেখক, সেহেতু অনেকেই উপন্যাসের নামকরণ ও বিষয়বস্তুর মধ্যে গান্ধীবিরোধী প্রতীকী বক্তব্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। এসব ব্যস্ততা ও বিতর্কের অবসান ঘটাতে মানিক *অহিংসা* প্রকাশের দু-বছর পর *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩) উপন্যাসের ভূমিকায় লেখেন :

আমার 'অহিংসা' বইখানা নিয়ে এরকম অভিযোগ উঠেছিল। দেশে অহিংস নীতিতে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। বইখানার নাম 'অহিংসা'। সুতরাং যদিও বইখানাতে রাজনৈতিক কোন ব্যাপার নেই, তবু ধরে নিতে হবে অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে কাহিনীর সংস্রব আছে। সোজাসুজি যোগসূত্র খুঁজে না পাওয়া যাক, কাহিনীকে সিম্বলিক ধরে নিয়ে –

কি বলতে চাচ্ছেন ঠিক ধরতে পারছি না মানিকবাবু।

যা বলিনি তা ধরতে চাইছেন কেন?

প্রশ্নকারী তিন ঘণ্টা ধরে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আমার লেখা বইয়ে আমি কি বলেছি আর কি বলি নি! নীতি বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করেও সাধারণ মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে, হিংসার সঙ্গে অহিংসাও যে মানুষের মধ্যে থাকে এবং এই সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে যে উপন্যাস লেখা যায়, এটি তাঁকে কোনমতেই বুঝিয়ে দিতে পারলাম না।[২]

মানিকের ভাষ্য অনুযায়ী বলা যায়, *অহিংসা* রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এ উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গে গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন সম্পর্কযুক্ত নয়। এটি সাধারণ মানুষের অহিংসা নিয়ে লেখা। 'ধর্মের ছদ্মাবরণে অবদমিত কামনা-বাসনা, স্বার্থবুদ্ধি, অর্থলিপ্সা এবং যৌনবিকৃতির বাস্তব চিত্রের সমান্তরালে এই উপন্যাসে আছে জটিল এবং দুরূহ মনোবিশ্লেষণ। আমাদের সমাজজীবনে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে অনাচার এবং ভণ্ডামি সংঘটিত হয় *অহিংসা* উপন্যাসে তার চমৎকার প্রতিফলন ঘটেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ধর্মব্যবসার এই ক্লেদাক্ত-পঙ্কিল দিকটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

---

১. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ : ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫১৯

২. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

প্রকৃতপক্ষে সমাজের সনাতনধর্মী সাধু সন্ন্যাসীরা স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনের বিপরীত স্রোতে জীবন নির্বাহ করে বলে তাদের জৈবিক বৃত্তিকে অনেক বেশি অবদমিত করে রাখতে হয়। হতে পারে সেজন্য তাদের মনোবিকৃতির পাশাপাশি যৌন বিকৃতি অনেক বেশি। নিরীহ সরল গ্রামীণ জনতার ভক্তিপরায়ণতার এমন নির্মম বাস্তবতা ও ধর্মব্যবসার এমন নিখুঁত চিত্র মানিকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল অনুপস্থিত।'[১] তাই অহিংসাকে রাজনৈতিক উপন্যাস না বলে সমাজে বিদ্যমান ভণ্ডামির কথাচিত্ররূপেই আখ্যায়িত করা যায়। "এ সত্যি 'সাধারণ অহিংসাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ নিয়ে' লেখা একটি উপন্যাস। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে এই উপন্যাসের কোন সম্পর্ক নেই।"[২]

অহিংসা উপন্যাসের কাহিনি এরকম : সদানন্দ সাধুর আশ্রমটি তপোবনের মতো তিনদিক ঘেরা, বাকি অংশে রাধাই নদী। আশ্রমটি যে একটি লাভজনক ব্যবসা তা শুরু থেকেই স্পষ্ট। এ ব্যবসায়ের যৌথ মালিক সদানন্দ ও বিপিন। দুজনের মধ্যে অধিকারের সংঘাত উপন্যাসে বিস্তৃতভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। তার মধ্যে মহেশ চৌধুরী বাইরে থেকে এসে নতুন জটিলতা সৃষ্টি করে। সৎ সাধু ও পরম ভক্ত বলে তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এ-সূত্রে সে আশ্রম দখলে মরিয়া হয়ে ওঠে। পরিশেষে সদানন্দ আশ্রম ছেড়ে চলে যায় এবং নতুন গুরুরূপে অধিষ্ঠিত হয় মহেশ চৌধুরী। এ-পর্যায়ে মহেশের প্রধান পরামর্শক হিসেবে নিযুক্ত হয় বিপিন।

মূলত সদানন্দকে কেন্দ্র করে বিপিন আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর অহিংসা ও প্রেমের কথা বলে সদানন্দ ভক্তচিত্তে সঞ্চারিত করে আবেগময় অনুভূতি :

> দেবতার মতই তার মূর্তি, বটতলার ছবির মহাদেবের ছাঁচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে। আসন করিয়া বসায়, ভুঁড়ি গিয়া প্রায় ঠেকিয়াছে পায়ে এবং তাতেই যেন মানাইয়াছে ভাল। নয় তো এই বৃষস্কন্ধ বিশাল দেহ পুরুষের চওড়া বুক আর পেশীবহুল সুডৌল বাহু দেখিয়া মনে হইত, দেহের শক্তি ভিন্ন আর বুঝি তার কিছু নাই। কথায় তাহা হইলে মানুষ মুগ্ধ হইত কিনা, কারও ভক্তি জাগিত কিনা সন্দেহ। মাথায় জটা নাই বলিয়া ভক্তেরা অনেকে মনে মনে আফসোস করে। যার সৌম্য, প্রশান্ত মূর্তি স্থৈর্যের নিখুঁত প্রতীক, জটা ছাড়া কি তাকে মানায় ?[৩]

---

১. জান্নাত আরা সোহেলী, 'ফাদার সিয়েৰ্গি, অহিংসা ও লালসালু : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা', বিশ্বজিৎ ঘোষ ও গিয়াস শামীম (সম্পা.), *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ : ৫৪, সংখ্যা : ৩, জুন ২০১৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৫৬

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৩. *অহিংসা*, সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

উপন্যাসের শুরু থেকেই সদানন্দকে কখনো সন্ন্যাসী মনে হয়নি। 'কামে, ক্রোধে, ঈর্ষায়, হিংসায়' সে ছিল সাধারণ মানুষের মতোই। সন্ন্যাসব্রত তার মুখোশ মাত্র। একদিন গৃহত্যাগী নারায়ণের স্ত্রী মাধবী তার আশ্রমে আশ্রয় নেয়। মেয়েটিকে দেখে সদানন্দ প্রলুব্ধ হয়। বিপিনের সঙ্গে ওর মেলামেশা সে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। মাধবীর প্রতি সদানন্দের অবচেতন সত্তায় সংক্রমিত হয় রূপজ মোহ ও আসক্তি। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> পাকা চুল বাছিয়া দিবার সময় তার কোলে মাথা রাখিয়া সদানন্দ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল সমস্তক্ষণ। মাধবী চলিয়া যাওয়ার পর মনে হইল, অসময়ে আজ যেন ঘুম আসিয়াছে। উঠিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। রাধাই নদীর বুক আরো ভরিয়া উঠিয়াছে। কালের মতো আজো নামি নামি করিয়া আকাশে আটকাইয়া রহিয়াছে বৃষ্টি। স্তিমিতদৃষ্টিতে বিকালের মত সদানন্দ চাহিয়া থাকে। এত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সদানন্দের, এত তেজ ও সংযম, জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে কি তীক্ষ্ণ হইয়াছে তার বিচারবুদ্ধি, এখন যেন জানিবার বুঝিবার ক্ষমতাটুকুও আর নাই।[১]

মাধবীকে কেন্দ্র করে বিপিনের সঙ্গে সদানন্দের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে বিপিন তাকে আশ্রমচ্যুত করতে চায়। সদানন্দকে সে স্পষ্টভাবে বলে :

> 'তিনদিনের মধ্যে তুই আশ্রম ছেড়ে চলে যাবি। আমি যা-ই হই, আশ্রমের কুটোটি পর্যন্ত আমার, তা মনে রাখিস। তুই সত্যি আমার চাকর – তোকে থাকবার কোয়ার্টার দিয়েছি, খেতে পরতে দিয়েছি। চাইলে মাইনে বাবদ কিছু টাকা পাবি, ব্যস। আর কোনো কিছুর অধিকার তোর নাই।...
>
> আমার আশ্রম ছেড়ে তুই চলে যা ভাই, দোহাই তোর। গোলমাল তুই করতে পারিস্, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না, যেতে তোকে হবেই। গোলমাল না করে যদি চলে যাস, আশ্রমের লাভের একটা ভাগ বরং তোকে দেব, যতই হোক, এতদিন তো তুই আশ্রমের উন্নতিতে সাহায্য করেছিস, কিছু দাবি তোর আছে। ওই টাকায় যেখানে খুশি নিজের একটা ছোটখাটো আশ্রম তুই খুলতে পারবি।'[২]

বিপিনের আচরণে সদানন্দ কষ্ট পায়। সঙ্গত কারণেই সে চলে যায় গ্রামের প্রতাপশালী মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে। মহেশ তাকে সাদরে গ্রহণ করে এবং 'শ্রী শ্রী সদানন্দ স্বামীর আশ্রম' নামে নতুন একটি আশ্রম

---

১. *অহিংসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

২. *অহিংসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

প্রতিষ্ঠা করে। এ আশ্রমে সে ম্যানেজারের দায়িত্ব দেয় ছেলে বিভূতিকে। নতুন এই আশ্রমে সদানন্দ স্বস্তি পায় না। সে বুঝতে পারে :

> তার নামে আশ্রম করা হইয়াছে, সে-ই একরকম ভিত্তি এই আশ্রমের, অথচ খাতির যেন লোকে তার চেয়ে মহেশ চৌধুরীকেই করে বেশি। লোকের কাছে নিজের দামটা আগের চেয়ে যে কমিয়া গিয়াছে, এটা সদানন্দ স্পষ্টই অনুভব করিতে পারে। সকলের মুখে আর যেন আগের সেই ভক্তির ছাপটা খুঁজিয়া মেলে না, সকলের কথায় ও ব্যবহারে মানুষের বদলে নিজেকে আর দেবতা হিসাবে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না। মহেশ চৌধুরীর উপরে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে দিন দিন। এত যে ন্যাকামি মহেশ চৌধুরী করে, সকলের কাছে সব সময় মোসাহেবের মতো নত হইয়া থাকে – তবু![১]

পরিবের্তিত প্রেক্ষাপটে সদানন্দের মনে হয় মহেশের চেয়ে বিপিনই ভালো ছিলো। অন্যদিকে বিপিন ভাবে – সদানন্দের চেয়ে গ্রামবাসী মহেশকেই বেশি ভলোবাসে। কাজেই সদানন্দের চেয়ে মহেশকেই তার প্রয়োজন। তারপরও সদানন্দ-বিপিনের মধ্যে পুনরায় যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এতে মহেশের আশ্রমে লোকজন কমতে থাকে। সদানন্দরা এবার মহেশের ক্ষতির চেষ্টা চালায় এবং পুলিশ দিয়ে তার আশ্রমে তল্লাশি চালায়। এরপর তারা প্রচার করে – মহেশ চৌধুরী মন্দ বলে সদানন্দ তাকে ত্যাগ করেছে। ফলে গ্রামের মানুষ অহিংসার বাণী শুনতে আবার বিপিনের আশ্রমে ভিড় জমাতে শুরু করে।

অহিংসা উপন্যাসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুরতার শিকার মাধবীলতা। সদানন্দ ও বিপিনের কামনার বলি হয়েছে সে। মহেশ চৌধুরীর আশ্রমেও সে বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছে। মহেশ তার পুত্র বিভূতির সঙ্গে মাধবীর বিয়ের প্রস্তাব দিলে সদানন্দ তাতে বাধা দেয়। এজন্য বিভূতির হাতে সে লাঞ্ছিত হয়, এবং তার সম্মুখেই বিভূতির সঙ্গে মাধবীর বিয়ে হয়।

অহিংসা উপন্যাসে মহেশ-পুত্র বিভূতি প্রতিবাদী চরিত্র। সে ভয়-ভক্তির ঊর্ধ্বে। সে শরীরচর্চা করে, ক্লাব গড়ে তোলে, সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হয়। একসময় বিপ্লবী সন্দেহে সে জেল খাটে। গ্রামে পল্লি সমিতি গঠন করে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করে; ভণ্ড সাধুর প্রতি প্রকাশ করে ঘৃণা। সদানন্দের ভণ্ডামি সে সহ্য করতে পারে না। তার বুদ্ধির সীমা সীমিত হলেও পিতার বিপরীতে অবস্থান নেওয়ায় তার চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উপন্যাসে বিভূতি আশ্রমের দাঙ্গায় মারা যায়। মাধবীর ধারণা– সদানন্দ বিভূতিকে

---

১. *অহিংসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

বাঁচাতে পারতো, কিন্তু মাধবীর ওপর তার একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সে তা করেনি। মহেশ চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে সদানন্দের এ দুরভিসন্ধির কথা জানিয়েছে মাধবী :

> 'ওঁকে খুন করাই ওই লোকটার উদ্দেশ্য ছিল। জেলে দেবার জন্যে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিল মনে নেই? ওঁকে জেলে পাঠালে আমার পেছনে লাগার সুবিধে হত। জেলে পাঠাতে পারল না, তাই একেবারে মেরে ফেলল।'...
>
> বুঝতে পারছেন না? আমার বিয়ে হবার পর থেকে দিনরাত ভাবত ওঁকে কি করে সরানো যায়, সেদিন সুযোগ পাওয়ামাত্র – যেই বুঝতে পারল যে সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিলেই সকলে মিলে ওঁকে মেরে ফেলবে, অমনি সকলকে ক্ষেপিয়ে দিল।[১]

প্রকৃতপক্ষে ভক্তিমূলক ধর্মভাবের বিপরীতে আশ্রম গুরুদের কদর্য ও হীন মানসিকতাই মানিক চিত্রিত করেছেন। আশ্রমিক অনাচার ও প্রতারণার প্রতিবাদ করতে গিয়েই প্রাণ হারিয়েছে মহেশ-পুত্র বিভূতি। 'সমাজের এই ধর্মান্ধতা এতই শক্তিশালী যে, পিতাও আর পুত্রের পক্ষে দাঁড়ায় না। এই সত্য উন্মোচনেও মানিকের সুগভীর সমাজচেতনার পরিচয় মেলে।[২] অবশ্য মহেশ তার পুত্রের মৃত্যুর জন্য মাধবীকেই সন্দেহ করে। একপর্যায়ে মহেশের পরিকল্পনায় সদানন্দের সঙ্গে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে হয় মাধবীকে :

> মহেশ যে দুজনকে একসঙ্গে সরাইয়া দিবার মতলব করিয়াছে, বিপিন সেটা কল্পনাও করিতে পারে নাই।
>
> সদানন্দ অথবা মাধবীলতাও কল্পনা করিতে পারে নাই।
>
> রাত্রি প্রায় দশটার সময় মাধবীলতাকে সঙ্গে লইয়া মহেশ চৌধুরী আশ্রমে আসিল, তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার আসল উদ্দেশ্য তিনজনের কাছেই পরিষ্কার হইয়া গেল। মাঝরাত্রে আশ্রমের পিছনের ঘাটে বাঁধা নৌকায় উঠিয়া সদানন্দ আর মাধবীলতা চলিয়া গেল। মাধবীলতা প্রথমদিন রাত্রে আশ্রমে আসিবার সময় নৌকা হইতে এই ঘাটেই নামিয়াছিল।[৩]

অহিংসা উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বসহযোগে সদানন্দ-মাধবীলতার সম্পর্ক, শশধর-রত্নাবলীর সম্পর্ক কিংবা বিপিনের কামনাকে যেমন ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি শেষ পর্যায়ে শ্রেণিগত ব্যবধানের কারণে সৃষ্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। লেখক এ উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের

---

১. *অহিংসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

২. সৈয়দ আজিজুল হক, কথাশিল্পী মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

৩. *অহিংসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অসংলগ্নতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি এখানে সমাজের অসুস্থ ও ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। হায়াৎ মামুদের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রযোজ্য :

> 'অহিংসা'র মতো হিংস্র নিষ্করুণ অব্যাখ্যেয় কাহিনী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভবত আর একটিও নেই। ধর্মব্যবসায়ী মানুষ যে প্রবঞ্চক, স্বার্থপর, হৃদয়হীন ও দুশ্চরিত্র হয় বা হয়ে থাকে বা হতে পারে এই বাস্তব সামাজিক সত্য প্রচার এই উপন্যাসের গোপন লক্ষ্য বলে মনে হয় না। আমার বিবেচনায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য – কী ঘটে তা দেখানো নয়; তিনি দেখাতে চান – কেন ঘটে, কীভাবে ঘটে। মনুষ্য চরিত্রে বহুমাত্রিকতা, মানবমনের গোপন অন্ধকার ইত্যাদি উন্মোচনের এই অস্বস্তিকর উপাখ্যান মানিক-সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অহিংসা* ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচনের শৈল্পিক প্রতিচিত্র। 'মূলত, পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় মানুষের চিরায়ত অনেক ধর্মবিশ্বাস এবং ধ্যানধারণা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। পুরনো মূল্যবোধ, সংস্কার সবই বিপর্যস্ত হয়ে সেখানে দেখা দেয় শুধু লোভ, মুনাফা আর নারীমেধযজ্ঞ। আলোচ্য উপন্যাসের পরতে পরতে সমাজের সেই ভাঙনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে নিরেট বাস্তবতায়।[২] সমকালীন অস্থির ও অনৈতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মানিক যেন সর্বকালিক সমাজব্যবস্থায় বিরাজিত ধর্মধ্বজীদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার স্বরূপই উন্মোচন করেছেন।

ধরাবাঁধা জীবন

মানিকের *ধরাবাঁধা জীবন* (১৯৪১)[৩] উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবন বাস্তবতার প্রতিফলন রয়েছে। 'মানিকের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে *পদ্মানদীর মাঝি* ও *পুতুলনাচের ইতিকথায়* গ্রামীণ জীবন রূপায়িত হয়েছে; প্রথমটি নিম্নবিত্তের জীবন কাহিনী; দ্বিতীয়টির নায়ক শশী অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হলেও তার চারপাশে মূলত নিম্নবিত্তেরাই, আর শশীর সমস্যার সঙ্গে মধ্যবিত্তের সমস্যার কোন সম্পর্ক নেই। *দিবারাত্রির কাব্যে*ও কাহিনির পটভূমি জনপদ থেকে অনেক দূরে, তার নায়ক-নায়িকার সম্পর্কও প্রেমে যৌনতায় রোমান্টিকতায়

---

১. হায়াৎ মামুদ (সম্পা.), 'ভূমিকা'(২), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, প্রাগুক্ত

২ . জান্নাত আরা সোহেলী, 'ফাদার সিয়ের্গি, অহিংসা ও লালসালু : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৩. *ধরাবাঁধা জীবন* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবম উপন্যাস। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে; প্রকাশক ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। উপন্যাসে প্রকাশকালের উল্লেখ ছিল না। তবে উপন্যাসের কিছু অংশ পরিবর্তন করে 'ধরা-বাঁধা জীবন' নামে গল্পাকারে *নর-নারী* পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর ১৯৪১) প্রকাশিত হয়। (দ্রষ্টব্য : সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭)

আবর্তিত, মধ্যবিত্তশ্রেণির সংকট ও সমস্যা সেখানে কিছুমাত্র ভূমিকা পালন করেনি। সেদিক থেকে 'ধরাবাঁধা জীবন' পূর্ণত ও মর্মত মধ্যবিত্ত জীবনেরই আখ্যান।'[১]

ধরাবাঁধা জীবন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভূপেন। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তার সুখের সংসার। এই সংসারে হঠাৎ নেমে আসে দুর্যোগ। টাইফয়েডে আক্রান্ত হয় তার দু-বছর বয়সী ছেলে নন্তু। দিনরাত ছেলের শুশ্রূষা ও দুশ্চিন্তায় তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী সরমাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবশেষে একটি মৃতকন্যা প্রসবকালে সে মৃত্যুবরণ করে। এর দুই ঘন্টার ব্যবধানে নন্তুও মারা যায়। স্ত্রী এবং নন্তুর আকস্মিক এই মৃত্যুতে ভূপেন হয়ে গেছে আনমনা; একেবারেই অস্বাভাবিক। এত শোকেও সে কাঁদে না।

> দেহ দুটিকে শ্মশানে নেওয়ার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, ভূপেন কাঁদিল না। না কাঁদিলে যেসব পাগলামি করার রীতি আছে এ অবস্থায় সে রকম কোনো পাগলামিও করিল না। কেবল মুখখানা তার দেখাইতে লাগিল অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ। ... সকলে তাই আরো বেশি অস্বস্তির সঙ্গে ভাবিতে লাগিল, মুখে যার গভীর মর্মান্তিক শোকের এমন স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে সে কাঁদে না কেন?[২]

স্ত্রী-সন্তানের অকালমৃত্যুর জন্য প্রসন্নকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কেঁদেছে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, হিতাকাঙ্ক্ষী সবাই। কেঁদেছে শহরের অন্যপ্রান্ত থেকে আসা বন্ধু প্রসন্ন এবং তার বোন প্রভা। প্রভা এই পরিবারের চিকিৎসক; এবং প্রসন্নের সঙ্গে হার্দ্যসম্পর্কে সম্পর্কিত। স্ত্রী-পুত্রের জন্য প্রভার কান্না দেখে ভূপেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে :

> কেঁদো না প্রভা। শোক পাওয়া সংসারের রীতি, কী করবে বলো। মানুষের তো কোনো হাত নেই![৩]

স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভূপেন একাকী হয়ে যায়। এই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির জন্য সে প্রভাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চায়। স্ত্রী থাকাকালেই প্রভার সঙ্গে তার গড়ে ওঠে প্রণয়সম্পর্ক। সরমার মৃত্যুতে এ পথ আরো প্রসারিত হয়। একদিন প্রভাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বেরিয়ে সে অবচেতনে প্রবেশ করে সিনেমা হলে। সেখানে সে অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত স্ত্রী ও পুত্রের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে উপলব্ধি করে স্ত্রী-সন্তানের প্রতি তার ভালোবাসা বৈচিত্র্যহীন জীবনের একটি নির্দিষ্ট অভ্যাসমাত্র নয়; এই সম্পর্ক অনেকবেশি যেমন হৃদয়িক তেমনি সামাজিক। সে উপলব্ধি করে –

---

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অর্ন্তবাস্তবতা বহির্বাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

২. *ধরাবাঁধা জীবন*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৬৫

৩. *ধরাবাঁধা জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

> চেনা মানুষ কেউ তাকে এখানে দেখিলে কী মনে করিবে কে জানে! কেবল তাই নয়, ভূপেনের মনে হইতে থাকে, আজ সিনেমায় আসিয়া সে যেন সরমা আর নন্তুর স্মৃতিকে কেমন অপমান করিতেছে। ওরা দুজন যে সত্যই নাই, এ চিন্তায় ভূপেন এখনো অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। ওদের যে পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এ কথাটা সব সময়েই মনে থাকে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ওদের এতকালের অস্তিত্বের অনুভূতিও যেন আগের মতোই জোরালো হইয়া আছে।[১]

একদিকে প্রভার প্রকাশ্য উপস্থিতি, অন্যদিকে সরমার স্মৃতি ভূপেনকে দোলাচলে নিক্ষিপ্ত করে। ক্রমশ প্রভাই তার জীবনে সত্যস্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে প্রভাকে কিছুই জানায় না।

> তারপর প্রভার সঙ্গে দু-একদিন অন্তর দেখা হইতে থাকে, দিন কাটিতে কাটিতে মাস কাটিয়া যায়। ভূপেন স্পষ্ট করিয়া প্রভাকে কিছু বলে না। ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। ভাবে, কিছুদিন চুপ করিয়া থাকাই উচিত। ছেলে-বউ মারা যাওয়ার পর সময় কাটিতে না দিয়া প্রভাকে বলা সঙ্গত হইবেনা যে, এবার তুমি আমার বউ হও প্রভা।[২]

অবশ্য অবিলম্বে সে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে, এবং প্রভার একান্ত সান্নিধ্য কামনা করে। ভূপেনের এ সিদ্ধান্তে প্রভা অসন্তুষ্ট হয়। তার মতে, বিয়ে একটি জটিল বিষয়, বিয়ে করে সে ধরাবাঁধা জীবনে আবদ্ধ হতে চায় না। তবে সে জানায় –

> 'আজ থেকে আমি তোমার হয়ে রইলাম। যেদিন খুশি, যখন খুশি, আমাকে চাইলেই পাবে। রাত দুটোর সময় তুমি যদি আমার ফোন করে ডাকো, ট্যাক্সি না পাই পায়ে হেঁটে আমি তোমার কাছে চলে যাব। তুমি কিন্তু শান্ত হয়ে থাকবে, নিজেকে ধ্বংস করতে পারবে না।'[৩]

প্রভার সঙ্গে ভূপেনের বিয়ের প্রস্তাবে অবশ্য কোনো পরিবারেরই সম্মতি ছিল না। ভূপেনের বৌদি স্বর্ণ নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় গোপনে এই বিয়ের চরম বিরোধিতা করে; প্রভার দাদা প্রসন্নও এ বিয়েতে তার অসম্মতি জ্ঞাপন করে। স্বর্ণ একটি শান্তশিষ্ট মেয়ের সঙ্গে ভূপেনের বিয়ে দিতে চেয়েছে, যেন পরিবারে তার কর্তৃত্ব বজায় থাকে। অপরদিকে সামান্য বেতনের চাকরিজীবী প্রসন্নও এ বিয়েকে কেন্দ্র করে নতুন ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। ভূপেনকে এ বিয়েতে নিরুৎসাহিত করতে সে বোন সম্পর্কে নানা অশোভন উক্তি করে। এমনকি বোনকে দুশ্চরিত্রা বলতেও তার বাধে না –

---

১. *ধরাবাঁধা জীবন*, প্রাগুক্ত,

২. *ধরাবাঁধা জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

৩. *ধরাবাঁধা জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

> প্রসন্ন ধীরে ধীরে কামানো চিবুকে হাত বুলায়, বিষণ্ন চিন্তিত মুখে অনেকটা স্বগোতোক্তির মতো বলে, ভাবি আর আফসোস হয়, সময়মতো বিয়ে দিয়ে ওকে যদি সংসার পেতে সুখী হবার সুযোগ দিতাম! এসব বিকার জন্মে জীবনটাও ওর মাটি হয়ে যেত না। ধীরেন মিত্রের সঙ্গে কী সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে আবার। একটা মাতাল গুণ্ডা লোক, আত্মীয়স্বজন যাকে বাড়ি ঢুকতে দেয় না, তার সঙ্গে মাখামাখি শুরু করলে দশজনে বলবে না দশকথা! তোমায় বলব কী ভাই, মানুষকে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করে।[১]

ধরাবাঁধা জীবন উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ভূপেন ও প্রভা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি হলেও তাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যা তাদের মিলনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ভূপেন লক্ষ করে মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে প্রত্যেকের সম্পর্ক মূলত স্বার্থকেন্দ্রিক। প্রয়োজন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সকলে মিলেমিশে জীবনযাপন করে মাত্র, এর বেশি নয়। ভূপেন তার জীবনে অস্তিত্বের সন্ধান করতে গিয়ে অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে সে প্রভার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি জানার জন্য তাদের বাড়িতে যায়। সাক্ষাতের প্রাকপর্যায়ে প্রভার উচ্ছ্বসিত হাসি শুনে সে হকচকিয়ে যায়। এ হাসির শব্দে ভূপেনের মনোলোকে ভাবান্তর তৈরি হয়। কিন্তু –

> ভূপেন ঈর্ষা বোধ করে না, সে শুধু আশ্চর্য হইয়া যায়। প্রভার জীবনেও হাসি ও আনন্দ আজ এত সুলভ! নিজে সে তবে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে কেন? এ দোষ তো তার নিজের। প্রেমকে এত বড়ো করিয়া তুলিবার কোনো প্রয়োজন তো তার ছিল না, ব্যর্থতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে কেউ তো তাকে অনুরোধ করে নাই। সরমা আর নন্তুর জন্য শোক যদি তার হইয়া থাকে, হোক, প্রভা যদি স্বপ্ন আর কল্পনার জগৎকে অনুর্বর মরুভূমি করিয়া দিয়া থাকে, দিক। আরো তো অনেক কিছু আছে জীবনে, সেসব অস্বীকার করিবার কোনো কারণ তো নাই। হাতের খেলনা কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে বলিয়া অবোধ শিশু ঘরের আসবাব ভাঙিতে আরম্ভ করে। সে তো শিশু নয়।[২]

মুহূর্তে ভূপেন উপলব্ধি করে স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু ও প্রেমে ব্যর্থতার চেয়ে জীবনের বিস্তৃতি অনেক বেশি। 'প্রভার জীবনে চিন্তা ও কর্মের দ্বন্দ্ব না থাকায় যে আনন্দময় পরিবেশ রচিত হয়েছে তা লক্ষ করে পরিণামে ভূপেনের ধরাবাঁধা জীবনভাবনায় আসে পরিবর্তন। সে উন্নীত হয় প্রথাগত জীবনবোধ থেকে নতুনতর উপলব্ধির জগতে যা তার মনে আনে শৃঙ্খলমুক্তির আনন্দ।'[৩]

---

১. *ধরাবাঁধা জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

২. *ধরাবাঁধা জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

৩. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

প্রকৃতপক্ষে ধরাবাঁধা জীবন নয়, মুক্ত আনন্দলোকে বিহার করার মধ্যেই যে জীবনের স্বস্তি ও সার্থকতা তা এ-উপন্যাসে মানিক প্রতিপাদন করেছেন। প্রভার সঙ্গে প্রেমকে বড়ো করে দেখে ভূপেন তার জীবনে ব্যর্থতাকে প্রত্যক্ষ করেছে। প্রেম ছাড়াও যে জীবনকে অনেকবেশি উপভোগ্য করে তোলা যায় তা ভূপেনকে তার জীবনাচরণসূত্রে দেখিয়ে দিয়েছে প্রভা। "মানিকের মহত্ত্ব এইখানে যে তাঁর প্রায় সব উপন্যাসের শেষেই একটি মুক্তির আভাস দ্যোতিত হয়। এই মুক্তি উপন্যাসে আসে বিরাট ও চলিষ্ণু জীবনের প্রতিরূপ হিশেবেই।'[১] *ধরাবাঁধা জীবন* উপন্যাসেও এ-সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চতুষ্কোণ

চতুষ্কোণ (১৯৪২)[২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যতিক্রমী উপন্যাস। দেহ-মন-যৌনতা এর উপজীব্য বিষয়।যৌনতত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক থেকে উপন্যাসটির উৎকর্ষতা সর্বজনস্বীকৃত। উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে নর-নারীর বৈচিত্র্যময় প্রবৃত্তি বিশ্লেষিত হয়েছে। উপন্যাসের 'ভূমিকা'য় কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজকুমার প্রসঙ্গে মানিক বলেছেন :

> রাজকুমারের মত অসংখ্য ছেলে দেখেছি। তারা নানা রকম, কিন্তু আসলে এক। রাজকুমারকে 'টাইপ' বলে ধরলে ভুল করা হবে। একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এই 'অনেক' যারা, তাদের মধ্যে মূলগত মিল আছে, তাই এটা সম্ভব হল। রাজকুমার একটু বেলুনের মতো ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু তাতে কিছু আসবে যাবে কি? আমার উদ্দেশ্যও তাই ছিল।[৩]

মানিক বলতে চান, রাজকুমার বিশেষ হয়েও নির্বিশেষ। সমাজ-পরিসরে রাজকুমারের মতো অসংখ্য চরিত্র অস্তিত্বমান। রাজকুমারের মাধ্যমে মূলত তাদের মনোদৈহিক প্রবৃত্তিকে তিনি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। সাধারণ যুবকের তুলনায় রাজকুমারের আচরণে হয়তো কিছুটা বাড়াবাড়ি রয়েছে, কিন্তু তাতে কিছুই যায়-আসে না। কারণ সামাজিক মানুষের এ-প্রবৃত্তি একান্তই স্বাভাবিক।

---

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অর্ন্তবাস্তবতা বহির্বাস্তবতা*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯৭

২. '*চতুষ্কোণ* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশম উপন্যাস। এর প্রকাশকাল ১৫ মে ১৯৪২ (১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ); প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৪২ সালের মার্চ পর্যন্ত 'নর-নারী' পত্রিকায় তেরো কিস্তিতে মুদ্রিত হয়।

৩. হায়াত মামুদ (সম্পা.), 'গ্রন্থ পরিচয়', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৬

রাজকুমার ধনীর নন্দন। তার মনের গড়ন অন্যদের থেকে পৃথক। সে স্বাধীনচেতা, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক যুবক। আত্মীয়-পরিজনহীন পরিবেশে আসবাব-পত্র পরিবেষ্টিত একটি চারকোণা ঘরের আবেষ্টনীতে অতিবাহিত হয় তার নিঃসঙ্গ জীবন। এই জীবনে মনোদৈহিক অস্বস্তিই হয়ে উঠেছে তার নিত্যদিনের সঙ্গী। উপন্যাসের শুরুর বর্ণনাংশ লক্ষ করা যাক :

> বেলা তিনটার সময় রাজকুমার টের পাইল, তার মাথা ধরিয়াছে। এটা নতুন অভিজ্ঞতা নয়, মাঝে মাঝে তার ধরে। কেন ধরে সে নিজেও জানে না, তার ডাক্তার বন্ধু অজিতও জানে না। তার চোখ ঠিক আছে, দাঁত ঠিক আছে, ব্লাডপ্রেসার ঠিক আছে, হজমশক্তি ঠিক আছে – শরীরের সমস্ত কলকব্জাগুলিই মোটামুটি এতখানি ঠিক আছে যে, মাঝে মাঝে মাথাধরার জন্য তাদের কোনোটিকেই দায়ী করা যায় না। তবু মাঝে মাঝে মাথা ধরে।
>
> ...
>
> আজ গোড়াতেই মাঝে মাঝে সাধারণ মাথাধরার সঙ্গে আজকের মাথাধরার তফাতটা রাজকুমার টের পাইয়া গেল। দু-চার মাস অন্তর তার এরকম খাপছাড়া মাছধরার আবির্ভাব ঘটে। নদীতে জোয়ার আসার মতো একটা ভোঁতা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার সঞ্চার সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারে, তারপর বাড়িতে বাড়িতে পরিপূর্ণ জোয়ারের মতো যন্ত্রণাটা মাথার মধ্যে থমথম করিতে থাকে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে না। মাথাধরা কমানোর ওষুধে শুধু যন্ত্রণার তীব্রতা বাড়ে, ঘুমের ওষুধে যন্ত্রণাটা যেন আরো বেশি ভোঁতা আর ভারি হইয়া দম আটকাইয়া দিতে চায়।[১]

নিঃসঙ্গতা রাজকুমারের দেহমনের ওপর যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে তা উপর্যুক্ত বর্ণনাংশে স্পষ্ট। নিঃসঙ্গতামুক্তির প্রয়োজনে সে রসিকবাবুর কন্যা গিরি, স্যার কে.এল-এর কন্যা রিণি, অবনীবাবুর কন্যা মালতী ও কেদারবাবুর কন্যা সরসীর সঙ্গে চেতন কিংবা অবচেতনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। এরা ছাড়াও তার মনোজগতে বিচরণ করেছে মনোরমা, তার দুঃসম্পর্কের বোন কালী ও রুক্মিণী। এদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আকর্ষণ অনুভব করেছে রাজকুমার। তার বাড়ির আশপাশেই এদের অস্তিত্ব ও অবস্থান:

> গিরি, মালতী, রিণি আর সরসী – চার জনের বাড়িই তার বাড়ির খুব কাছে, একরকম পাশের বাড়িই বলা যায়। পশ্চিমে বড় রাস্তার ধারে স্যার কে. এল-এর প্রকাণ্ড বাড়ির পিছনে তার বাড়িটা আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে, স্যার কে. এল-এর বাড়ির পাশের গলি দিয়া ঢুকিয়া তার বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছিতে হয়। উত্তরে গলির মধ্যে তার বাড়ির আর দিকে কেদারবাবুর বাড়ি। পুবে গলির মধ্যে আর একটু আগাইয়া গেলে ডান দিকে যে আরো ছেট গলিটা আছে তার মধ্যে ঢুকিলেই বাঁ দিকে অবনীবাবুর বাড়ি। দক্ষিণে ছোট

১. *চতুষ্কোণ*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

গলিটা ধরিয়া খানিক আগাইয়া ডান দিকে হঠাৎ মোড় ঘুরিবার পর রসিকবাবুর বাড়ি এবং গলিটারও সেইখানেই সমাপ্তি।[১]

প্রকৃতপক্ষে এই কয়টি বাড়ি এবং এই বাড়িগুলোর চারটি মেয়েকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে রাজকুমারের পৃথিবী। একপর্যায়ে গিরিদের পরিবার রাজকুমারের বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করতে শুরু করে। গিরির মা মনোরমা রাজকুমারের দূরসম্পর্কীয় দিদি। সেইসূত্রে গিরির সঙ্গে রাজকুমারের গড়ে ওঠে সহজ সম্পর্ক। 'রোগা লম্বা পনের-ষোল বছরের মেয়ে' গিরি নিজেকে পরিণত যুবতীর রূপ দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। গিরিকে নির্জনে পেয়ে রাজকুমারের মনোলোকে উদ্ভট চিন্তা জেগে ওঠে। সে তার বুকে হাত রেখে তার নাড়ির স্পন্দন বোঝার প্রয়াস পায় :

ডুরে শাড়ির নিচে যেখানে গিরির দুর্বল হার্ট স্পন্দিত হইতেছিল, সেখানে হাত রাখিয়া রাজকুমার স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করিতে লাগিল। গিরির মুখের বাদামি রং প্রথমে হইয়া গেল পাঁশুটে, তারপর হইয়া গেল কালোটে। একে আজ তার গায়ে সেমিজ নাই, তারপর চারিদিকে নাই মানুষ। কি সর্বনাশ![২]

ক্ষুব্ধ মায়ের অশ্রাব্য গাল শুনে রাজকুমার সেখান থেকে বেরিয়ে আসে; এবং স্যার কে. এল-এর কন্যা রিনিকে নিয়ে একই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চায়। তার কেবলই মনে হচ্ছিল –

একবার রিণিদের বাড়িতে গিয়া খেলার ছলে রিণির হাত ধরিয়া টানিয়া আর ব্লাউজের একটা বোতাম পরীক্ষা করিয়া সে যদি আজ প্রমাণ না করে যে ভদ্র মানুষ সব সময় সব কাজের কদর্য মানে করিবার জন্যই উদগ্রীব হইয়া থাকে না, তবে তার মাথাটা ধীরে ধীরে বোমায় পরিণত হইয়া ফাটিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।[৩]

রিণিদের বাড়িতে গিয়ে সঙ্গীতচর্চারত রিণিকে দেখে মুগ্ধ হয় রাজকুমার। রিণিও রাজকুমারকে দেখে তার সঙ্গপ্রত্যাশী হয় –

ধীরে ধীরে রাজকুমারের হাত ধরিয়া রিণি তাকে আরেকটু কাছে টানিয়া আনিল, নিজের মুখখানা আরো উঁচু করিয়া ধরিল তার মুখের কাছে। গান গাহিয়া সে সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। রাজকুমারের কাছে আর কোনোদিন সে এভাবে আত্মহারা হইয়া পড়ে নাই।

---

১. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০০

২. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

৩. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

প্রথমটা রাজকুমার বুঝিতে পারে নাই, তবে রিণির চোখ ও মুখের আহ্বান এত স্পষ্ট যে বুঝিতে বেশিক্ষণ সময় লাগা রাজকুমারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। বুঝিতে পারিয়াই সে বিবর্ণ হইয়া গেল।[১]

রিণির আবেদনে সাড়া না দিয়ে রাজকুমার সরে পড়ে। রিণিও একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়ায়। তার চোখে আবেশের ছাপ নেই, মুখে উত্তেজনার রং নেই। চোখের পলকে সে যেন পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু রাজকুমার ধাঁধায় পড়ে যায়। সে বুঝতে পারে না, গিরির মতো নারীকে স্পর্শ করা যদি 'অসভ্যতা' হয়, তাহলে রিণির মতো নারীর চুম্বনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা কেন 'অসভ্যতা' হবে! রাজকুমার উপলব্ধি করে :

এমন একটা বিকৃত আবেষ্টনীর মধ্যে তারা মানুষ হইয়াছে যে, অস্বাভাবিক মিথ্যা অসংযমকেই তারা স্বাভাবিক সত্য বলিয়া জানিতে শিখিয়াছে। মানুষ কেবল পরের নয়, নিজেরও সংযমে বিশ্বাস করে না। অসংযমের চেয়ে সংযম যে মানুষের কাছে বেশি স্বাভাবিক, এ যেন কেউ কল্পনাও করিতে পারে না।[২]

একদিন টেনিস কোর্টে 'সর্ট আর শার্ট পরা' রিণিকে নতুন রূপে প্রত্যক্ষ করে রাজকুমার। রাজকুমারের বিস্মিতভাব দেখে রিণি ভাবে সে বুঝি তাকে প্রেম নিবেদন করবে; কিন্তু তৎপরিবর্তে রাজকুমার এক অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য প্রস্তাব করে : 'তোমার নাওয়া দেখব। তুমি নাইবে, আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকব চুপ করে।' অতঃপর সে এর পক্ষে নানা যুক্তি উত্থাপন করে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

গানের আবেশে বিহ্বলা রিণির বাড়ানো মুখের আমন্ত্রণ যেদিন সে গ্রহণ করে নাই সেদিনও রিণির নাক এমনি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছিল রাগের মাথায় হঠাৎ বুঝি কামড়াইয়া দিবে – দুরন্ত ছোট মেয়েরা যেমন দেয়।

ম্লান মুখে রাজকুমার একটু হাসিল।

'জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, তুমি রাজি নও বুঝতে পারছি।'

'বুঝবে বৈকি। তুমি তো বোকা নও।'...

'আমি তবে যাই।'

'যাও। আর এসো না।'

'আচ্ছা।'

---

১. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

২. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল।

'কথাটা তুমি আর একটু উদারভাবে নেবে ভেবেছিলাম, রিণি।'

রিণিও উঠিয়া দাঁড়াইল।

'তোমায় বোকা ভাবতে পারলে তাই নিতাম। তুমি তো বোকা নও।...একটা উপদেশ নিয়ে যাও। আরেকটি মেয়েকে যখন কথাটা বলবে, মালতীকেই বলবে বোধ হয়, কিছু বুঝিয়ে বলতে যেও না। শুধু বোলো যে তোমার এ সাধটা না মেটালে তুমি পাগল হয়ে যাবে, সায়ারাইড খাবে। হয়তো রাজি হতে পারে।[১]

কেবল গিরি আর রিণি নয়, মালতী, সরসী ও গিরিকে নিয়েও এ-অদ্ভুত খেলায় মেতে ওঠে রাজকুমার। মালতী রাজকুমারের ছাত্রী। একদিন বৃষ্টির অজুহাতে রাজকুমার মালতীদের বাড়িতে আসে। মালতীও রিণির মতো রাজকুমারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এসময় রাজকুমারের মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ঔপন্যাসিক অঙ্কন করেছেন এভাবে :

তখন এক কোমল অনুভূতির বন্যায় রাজকুমারের চিন্তা আর অনুভূতির জগৎ ভাসিয়া গেল, মনে হইল শুধু মমতায় এবার তার মরণ হইবে। মালতীর একটি চুলের জন্য তার এ কি মায়া জাগিয়াছে! এক মুহূর্তের বেশি সহ্য করাও কঠিন এমন এক আত্মবিলোপ। মালতীকে বিশ্বজগতের রানী করিয়া দিলে তার সাধ মিটিবে না, ফুলের দুর্গে লুকাইয়া রাখিলে ভয় কমিবে না, তাই শুধু মালতী ছাড়া কিছুই সে রাখিতে চায় না, নিজেকে পর্যন্ত নয়।[২]

এসময় মালতীর প্রেমিক শ্যামল এই দৃশ্য দেখে গিরির সঙ্গে রাজকুমারের অসভ্য আচরণের বিষয়টি সকলের সামনে উপস্থাপন করে। ফলে রাজকুমারকে কেন্দ্র করে মেয়েরা বিচিত্রমাত্রিক ভাবনায় সমর্পিত হয়। সেও নিজের অবস্থান উপলব্ধি করতে পারে। রাজকুমারের দৃষ্টিকোণ-আশ্রিত বর্ণনাংশ লক্ষ করা যাক :

যে রাজকুমারের এতকাল দেখা পাওয়াই কঠিন ছিল, হঠাৎ তার ঘন ঘন আবির্ভাব ঘটিতে থাকায় এবং তার শান্ত নির্বিকার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠায় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের বাড়ির মেয়েদের চমক লাগিয়া যায়। রাজকুমারের ব্যগ্র উৎসুক চাহনি সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছে দেখিয়া কেউ দারুণ অস্বস্তি বোধ করে, কেউ মনে মনে রাগিয়া যায়, কেউ অনুভব করে রোমাঞ্চ। প্রত্যেকে তারা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবিতে থাকে, এতকাল পরে আমার মধ্যে হঠাৎ কি দেখল যেএমন করে তাকিয়ে থাকে? কেউ তার সামনে আসাই বন্ধ

১. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬
২. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

করিয়া দেয়, কেউ কথা ও ব্যবহারে কঠিনতা আনিয়া দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করে, কেউ আরো কাছে সরিয়া আসিতে চায়।[১]

একদিন মালতীকে নিয়ে হোটেলে যায় রাজকুমার। মালতীও যৌবনের স্বাভাবিক প্রেরণা থেকেই তাকে সঙ্গ দিতে চায়। কিন্তু মালতীকে হোটেলে রেখে রাজকুমার দীর্ঘসময় বাইরে কাটিয়ে দেয়; তখন সে বুঝতে পারে রাজকুমারকে দিয়ে তার স্বাভাবিক ইচ্ছার পরিতৃপ্তি সাধন সম্ভব নয়। ফলে মালতী আত্মগোপন করে, এবং হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সরসীর সঙ্গেও রাজকুমারের আচরণ ছিল একইরকম। সরসী সংস্কারহীন, বুদ্ধিমতী, কৌশলী, বাস্তববাদী অথচ সহজ সরল প্রকৃতির মেয়ে। সে একজন দক্ষ সংগঠকও বটে। 'সমিতি গড়িতে আর মিটিং করিতে সরসী বড় ভালোবাসে। ঘরে তার মন বসে না, সারাদিন এইসব ব্যাপার নিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কখনো ব্যস্ত হয় না। সব সময় তাকে ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া মনে হয়।'[২] একমাত্র সরসীই রাজকুমারের চারিত্র্যপ্রকৃতি উপলব্ধিতে সক্ষম হয়। সে বোঝে রাজকুমারের মতো যারা অন্তর্গত জীবনানুসন্ধানী, তাদের অসঙ্গতিময় জীবনের বিস্তৃতি ব্যাপক। রাজকুমারের মতো 'যারা নিজের মধ্যে বাঁচে', তারা যেমন অন্যকে ভালোবাসতে জানে না, তেমনি নিজেকেও না। আর এ কথা সরসীও জেনেছে রিণির কাছ থেকে।

সরসী জানে, মেয়েদের নিয়ে রাজকুমার যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চায়, তা গবেষণা নয়, মনোবিকার। এমতাবস্থায় রাজকুমারকে তৃপ্ত করাই তার মুক্তির একমাত্র পথ। তাই সে কাউকে ভালোবাসে না জেনেও সরসী উপযাচক হয়ে তার সামনে নিজের শরীর উন্মোচন করে। বিনিময়ে রাজকুমারের কাছ থেকে সরসী কিছুই প্রত্যাশা করে না। রাজকুমার মনোবিকার থেকে সুস্থজীবনে ফিরে আসুক এটিই সে চায়।

যে বিকারগ্রস্ততার জন্য রাজকুমারের মনোবিশ্ব ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল, সরসী এভাবে তার অবসান ঘটায়। তাই রাজকুমারের অসঙ্কোচ স্বীকারোক্তি – 'তুমি আমার বিকারকে কাটিয়ে দিয়েছো সরসী।' বলাবাহুল্য, রাজকুমার নিজের সম্পর্কে নিজেই ক্রমশ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে অবদমিত মনস্তাত্ত্বিক কামনা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরসীর সঙ্গে কথোপকথনে তার এই অসহায়ত্ব প্রকাশ পায় :

---

১. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

২. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

> ... আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কেন। কারো সঙ্গে আমার বনে না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। অন্য সবাইকে দেখি, খুব যার সঙ্কীর্ণ জীবন, তারও কয়েকজনের সঙ্গে সাধারণ সহজ সম্পর্ক আছে, আত্মীয়তার, বন্ধুত্বের, ঘৃণা বিদ্বেষের সম্পর্ক। কারো সঙ্গে আমার সে যোগাযোগ নেই। কি যেন বিকার আমার মধ্যে আছে সরসী, আর দশজন স্বাভাবিক মানুষ যে জগতে সুখে বিচরণ করে আমি সেখানে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে পারি না। আমার যেন সব খাপছাড়া, উদ্ভট। নাড়ি দেখব বলে আমি গিরির সঙ্গে কেলেঙ্কারি করি, শুধু খেয়ালের বশে রিণি মুখ বাড়িয়ে দিলে আমার কাছে সেটা বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সৌন্দর্যের বদলে মেয়েদের দেহে আমি খুঁজি আমার থিয়োরীর সমর্থন। আমার যেন সব বাঁকা, সব জটিল।[১]

নিজের সম্পর্কে ব্যাখ্যাসূত্রে রাজকুমারকে 'যৌনবিকারগ্রস্ত ভেবে ভুল করার যথেষ্ট কারণ আছে; কিন্তু তার চিন্তাজগতের দিকে লক্ষ্য রাখলে, এমন-কি নিজের সম্পর্কে যা সে ভেবেছে ও বলেছে তাতে দৃষ্টি দিলে বুঝতে পারা যায় – সে আধুনিক ও সমকালীন। যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ এই চরিত্রের ভিত্তি।'[২]

রাজকুমার জীবনবাস্তবতায় পরিচিত পৃথিবীর হলেও মনোদৃষ্টিভঙ্গিতে অপরিচিতলোকের বাসিন্দা। সরসী, রিণি, মালতী, মনোরমার সাংসারিক-সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হলেও তাদের রাজকুমারকেন্দ্রিক মনোদৈহিক চেতনা সরল নয়। উদ্ভট আচরণের কারণে তাকে আত্মীয়-পরিজনও পছন্দ করে না। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও দার্শনিক বহু প্রশ্ন তার একাকীত্বের অনুভূতিকে সতেজ রাখলেও কারো সঙ্গেই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ফলে রাজকুমার ক্রমশ নিঃসঙ্গ সত্তায় রূপান্তরিত হয়। ডাক্তার-বন্ধু পরেশও তার কতাবার্তায় বিরক্ত হয়। ক্লাবের আড্ডায় নিঃসঙ্গতা থেকে সে মুক্তি পায়না। উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, রাজকুমার তার বিকারের জগৎ থেকে মুক্তি পেতে চায়। এই মুক্তির কথা সরাসরি লেখা না থাকলেও তার অর্ন্তজ্জ্বালা ও আচরণের মধ্যে তা স্পষ্ট। প্রথম থেকে বিকারগ্রস্ততাকে তুচ্ছ আত্মতৃপ্তির বাহন হিসেবে গ্রহণ করলেও উপন্যাসশেষে রাজকুমারকে অন্তর্দাহে দগ্ধ হতে দেখা যায়। আর এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবন সম্পর্কে মানিকের ক্রমিক উত্তরণের গোপন ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন :

> চতুষ্কোণ উপন্যাস যৌনতাময় – তবে কখনও যৌনসর্বস্ব নয়, বরং মনস্তত্ত্ব ও সমাজসম্মত। যৌনতা 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে জীবনার্থ সন্ধানের একটি উপায় – জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ যৌনতা, কিন্তু সে কোনো গন্তব্য নয় কখনো। শেষ পর্যন্ত মানিক যৌনতাউর্ধ্ব, জীবন-শিল্পী।[১]

---

১. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

২. চঞ্চল আশরাফ, *চতুষ্কোণ : পুনর্বিবেচনা*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, *লেখকের কথা*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, *উত্তরাধিকার*, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮, পৃ-৮০

বলা যায়, 'সবক্ষেত্রেই শিল্প-সাফল্যের কথা তিনি মাথায় রাখেন নি, নতুন দিনের নতুন প্রজন্মের কাছে নতুন জীবনের আগমনী ধ্বনিকেই শোনাতে চেয়েছিলেন তিনি।'[২]

গিরি, মালতী, সরসী, কালী প্রভৃতি চরিত্র রাজকুমারের বিকারগ্রস্ততাসূত্রে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিংবা পরিস্থিতির চাপে তার জীবন থেকে সরে পড়লেও রিণি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। রাজকুমারকে সে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করলেও সে যে তার মানসলোকে তাকেই ধ্যান করেছে, তা তার পরবর্তীকালের অস্বাভাবিক আচরণসূত্রে স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে রাজকুমারকে সে কেবল বন্ধু হিসেবেই গণ্য করেনি; বন্ধুর অতিরিক্ত কিছু ভেবেছে। বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় মালতীর প্রতি তার ঈর্ষাসূত্রে। সে প্রবলভাবে চেয়েছে – রাজকুমার অন্য কারো নয়, কেবল তারই হবে। ফলে রাজকুমারকে উপরিতলে প্রত্যাখ্যানের পর তার ধ্যানেই সে মনোব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। এই ব্যাধি থেকে তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্যে সরসীর পরামর্শে সে রিণিকেন্দ্রিক জীবনভাবনায় সমর্পিত হয়। অতঃপর –

> স্যার কে. এল-এর বাড়িতেই রাজকুমারের বেশিরভাগ সময় কাটে – রিণির কাছে। রাজকুমার না থাকিলে রিণি অস্থির হইয়া উঠে, কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের চুল ছেঁড়ে, রাগ করিয়া আলমারির কাচ, চীনামাটির বাসন ভাঙে, বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে, ধরিতে গেলে মানুষকে কামড়াইয়া দেয়, জামাকাপড় খুলিয়া ফেলিয়া নগ্ন দেহে রাজকুমারের খোঁজে বাহির হইয়া যাইতে চায় পথে। রাজকুমারকে দেখিলেই সে শান্ত হইয়া যায়, আশ্চর্যরকম শান্ত হইয়া যায়। প্রায় স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতো কথা বলে ও শোনে, চলাফেরা করে, আবার খায়, ঘুমায়।[৩]

এই পর্যায়ে ইনস্যানিটি-আক্রান্ত রিণিকে কেন্দ্র করে পরিবর্তিত জীবনস্রোতে আন্দোলিত হয় রাজকুমার। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে স্যার কে. এল-কে উদ্দেশ্য করে সে বলে :

> আপনি যদি ভালো মনে করেন, রিণিকে আমি বিয়ে করতে রাজি আছি। ... আপনি তো বুঝতে পারছেন, প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মতোই আমাদের দিনরাত একত্রে থাকতে হবে – কতকাল ঠিক নেই।[৪]

---

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা*, পূর্বোক্ত, পৃ-২১৩

২. যুথিকা বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ব্যক্তি ও কথাসাহিত্যিক*, জয়গোপাল মণ্ডল সম্পাদিত, *প্রসঙ্গ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল-২০০৯, পৃ-২১৪

৩. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

৪. *চতুষ্কোণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

পরিশেষে 'অবিশ্বাস্য এই গল্পটিকে তিনি (মানিক) অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেন যখন কাহিনীর শেষে সর্বশেষ বাক্যে তিনি নিরুদ্বিগ্ন বিশ্বাসে আমাদের জানিয়ে দেন, 'জীবনতো খেলার জিনিস নয় মানুষের'। এতক্ষণ ধরে এই উপন্যাসে সব কিছুইতো বানানো গল্পই মনে হচ্ছিল এবং জীবন নিয়ে নিছক হাস্যকর অবিশ্বাস্য এক খেলা। কিন্তু ... খেলা হলেও তার একটি ব্যাকরণ আছে। সেই ব্যাকরণটি তিনি বলে দিয়ে যান শেষ বাক্যে।[১] এভাবেই চতুষ্কোণ উপন্যাসে মানিক রাজকুমারের মনোব্যাধির চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে পরিশেষে তার সুস্থ জীবনধারায় প্রত্যাবর্তনের কথাই বলেছেন। সমাজজীবনে আদ্যন্ত সুস্থতাই যে তাঁর প্রত্যাশিত ছিল তা এ-উপন্যাসের পরিণামী রসনিষ্পত্তিতে প্রত্যক্ষ করা যায়।

শহরবাসের ইতিকথা

শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬)[২] উপন্যাসে গ্রামজীবনবিচ্ছিন্ন, এবং অতঃপর শহরজীবনে স্থিত এক পরিবারের বসবাসের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর বিত্তশালী পরিবারের সন্তান মনোমোহন তার শহরবাসের দীর্ঘদিনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সুযোগ পায়; এবং সপরিবারে কলকাতার একটি বিলাসবহুল বাসায় জীবনযাপন শুরু করে। মনোমোহন ও তার পরিবারের শহরবাসের অর্জিত অভিজ্ঞতার বয়ানই হচ্ছে *শহরবাসের ইতিকথা*।

মনোমোহনের কলকাতায় আসার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ছিলো না। তবে শহরবাসের একটি সুপ্তবাসনা ছিল তার মধ্যে। গ্রামজীবনের অভাব-দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দলাদলি, হিংসা-প্রতিহিংসা তাকে পীড়িত করতো। বাইরে থেকে গ্রামকে যতবেশি শান্ত ও নিরুপদ্রব মনে হয় গ্রামজীবন আসলে তা নয়। এখানকার সমস্যা অন্তহীন। বন্ধু চিন্ময়ের সঙ্গে মনোমোহনের কথোপকথনে তা স্পষ্ট :

---

১. হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ- ভূমিকা

২. '১৯৪৬ সালে মানিকবাবুর পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে প্রথমে (ফেব্রুয়ারী মাসে) প্রকাশ লাভ করে 'সহরবাসের ইতিকথা'। ... প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স।' (দ্রষ্টব্য : সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪)

> গ্রামকে, গ্রামের সরল শান্ত জীবনকে ভালোবাসিতে গেলে নিতাই পিয়নের সমস্যাটা তুচ্ছ করা যায় কেমন করিয়া? গ্রামের মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অশিক্ষা-কুসংস্কার-এসববাদ দিয়ে গ্রাম্য জীবন কল্পনা করা যায় কি করিয়া?[১]

গ্রামীণ জীবনের এই হতশ্রীদশা থেকে মুক্তির জন্য, সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত অজ্ঞতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্তির জন্য সে তার স্ত্রী-মা-ভাই-বোন সবাইকে নিয়ে শহরজীবনে স্থিত হতে চায়। শহরের আয়ে নয়, বরং গ্রামের অর্থেই মনোমোহন বিলাসী জীবনযাপন করতে চায়। এজন্য শহরে এসে বিশাল বাড়ি ভাড়া নিয়ে সে অত্যাধুনিক আসবাবপত্র কেনে; ক্রয় করে নতুন ডিজাইনের গাড়ি। সেই সঙ্গে সে প্রায়শই পার্টি আয়োজন করে। বন্ধু চিন্ময়, তার স্ত্রী সন্ধ্যা, বোন ঝরণা, বাড়িওয়ালা জগদানন্দ, বারবণিতা দুর্গা, চম্পা এদের নিয়ে মুখরিত জীবনযাপন শুরু করে মনোমোহন। এদের মধ্যে বাড়ির মালিক জগদানন্দই তার বেশি পছন্দের। সে জগদানন্দের মাধ্যমে শহরের বিচিত্র বিষয় অবগত হয়; শহরবাসের ইতিবাচকতা উপলব্ধি করে। জগদানন্দের মতে :

> শহর আমার কাছে উন্নতি, প্রগতি, শ্রীবৃদ্ধির প্রতীক। কারো শখে শহর গড়ে ওঠে না, কেবল আরামে থাকা আর মজা লুটবার জন্য শহর নয়। শিল্প, বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি সব কিছুর হেড কোয়ার্টার হল শহর। শহর দেখে দেশকে চেনা যায়, দেশের অবস্থা বুঝতে পারা যায়।[২]

শহরবাসের একপর্যায়ে মনোমোহন শহরের নানা অসঙ্গতি লক্ষ করে। বিশেষ করে চিন্ময় ও সন্ধ্যার বিকারগ্রস্ত দাম্পত্যজীবন তাকে পীড়িত করে। এদিকে গচ্ছিত অর্থে টান পড়ায় মনোমোহনের মায়ের অসন্তুষ্টি বাড়তে থাকে, ছোট ভাইও সম্পত্তির অধিকার দাবি করে। মোহনের সন্তানহীনা স্ত্রী লাবণ্যর জীবনও বিকারগ্রস্ততায় পরিণত হয়। তাই শহরবাসের অভিজ্ঞতা মোহনের জীবনে শেষপর্যন্ত সুখকর হয়নি। তার অন্তরজুড়ে ধ্বনিত হতে থাকে হাহাকার। সে হয়ে ওঠে জিজ্ঞাসাব্যাকুল :

> গ্রাম ছাড়িয়া কেন সে শহরে বাস করিতে আসিয়াছিল?
>
> সভ্যতার সুখসুবিধা ভোগ করিতে আর সেই সুখসুবিধা যারা পুরামাত্রায় ভোগ করে তাদের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে এবং অর্থোপার্জন করিতে আসিয়াছিল?

---

১. *শহরবাসের ইতিকথা*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড,অবসর প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১০, পৃ. ১৯

২. *শহরবাসের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

কারণটা এখন অসম্পূর্ণ, অর্থহীন মনে হয়। গ্রামে বসিয়া দিনের পর দিন সে কি কল্পনা করিয়াছিল মেটে পথে হাঁটার বদলে পিচঢালা পথে মোটর হাঁকানো আর গরিব অশিক্ষিত মানুষের বদলে ধনী সুশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার?

শহরের বাড়ি, গাড়ি, সঙ্গী, সাথি, সুখ, সুবিধা, আনন্দ, উৎসবের চন্য সে লুব্ধ ছিল, এসব নতুনত্ব ও পরিবর্তন কল্পনাও কনিত সর্বদা – অন্য কিফুর আশায়। এসব ছিল আনুষঙ্গিক, আসল কল্পনা নয়। কী যেন গড়িয়া তোলার আয়োজনের মতো শহরের জীবনকে সে কল্পনা করিত।[১]

উপন্যাসে মনোমোহনের এই উদ্দেশ্য অস্পষ্ট। 'মানিকবাবু মোহনের গ্রামের বাস তুলে দেবার পেছনে এমন কারণ দেখিয়ে মোহনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিঃসন্দেহে। তবে মোহনের শহরবাস নিছক অকারণ নয়, উপন্যাস পাঠে ক্রমে ক্রমে তা পরিষ্কার হয়। বাড়ি, গাড়ি, সঙ্গী ইত্যাদিও কামনা তার শহরবাসের অন্যতম কারণ নিশ্চিতভাবে, মোহন এসব অধিকারের জন্য উন্মুখ, তার আচার ব্যবহারে সেই উন্মুখতা প্রকাশিত। সর্বোপরি স্বপরিবারে ভাঙনের মুখে 'টাকা চাই, টাকা, টাকা আনিতে পারিলেই আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে' প্রত্যয়ে বোঝা যায় তার শহরবাসের মূল প্রেরণা কোন উৎসমূলে প্রোথিত।'[২]

একথা ঠিক যে, 'শহরের বাড়ি. গাড়ি, সঙ্গী, সাথি, সুখ, সুবিধা, আনন্দ, উৎসবের চন্য সে লুব্ধ ছিল', জীবনের নতুনত্ব ও পরিবর্তন কল্পনা করিত সবসময়। অন্যরকম কিছু-একটা করবার আকাঙ্ক্ষাও তার ছিল। কিন্তু তা যে ঠিক কী, তা এখন আর সে মনেও করতে পারে না। ফলে এক ধরনের অবসাদ ও অসন্তোষে সে আক্রান্ত হয়; জীবনকে মনে হয় বিষাদতিক্ত। উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ :

'যেমন ভাবিয়াছিল, শহরের জীবনটা সেরকম হয় নাই। তার ঈর্ষাতুর কামনাকে সার্থক করিয়া শহরের বিশেষ সম্প্রদায়টির মানুষগুলি তাকে নিজেদের একজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সেরকম মজা লাগে কই? ব্যাপক সামাজিক জীবনকে আয়ত্ত করিয়া সজাগ সক্রিয় জীবনযাপনে বৈচিত্র্য ও উত্তেজনা কোথায়?

তাছাড়া শুধু বন্ধু পাওয়ার হিসাবটাই সে ধরিয়াছিল, এত শত্রু তার জুটিল কোথা হইতে, তুচ্ছ কারণে আর সম্পূর্ণ অকারণে তার উপর যাদের বিরাগ জন্মিয়াছে?

মাকেও আজকাল মাঝে মাঝে মোহনের শত্রু মনে হয়। ভাববোনদের আড়াল করিয়া মা তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছেন, কাছে ঘেঁষিবার উপায় নাই। ওদের মনের মতো গড়িয়া তুলিবার কল্পনাটা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।...

---

১. *শহরবাসের ইতিকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

২. কার্তিক লাহিড়ী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস*, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

তাকে বাদ দিয়া ওরা শুধু পরামর্শ করে না, আজকাল তার কাছে ঘেঁষিতে চায় না, কাছে ডাকিলে অস্বস্তি বোধ করে। দূর হইতে নীরবে ওরা তার দিকে তাকাইতে শিখিয়াছে। ওদের চোখে ভীত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিই সে আবিষ্কার করে, খোকাখুকির চোখে পর্যন্ত।'[১]

চিন্ময় এ উপন্যাসে শহরবাসী হলেও এক পর্যায়ে গ্রাম জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার স্ত্রী সন্ধ্যা স্বাধীনচেতা নারী। অর্থলোলুপতার কারণে চিন্ময়ের সঙ্গে সে বিয়েতে সম্মত হয়। তবে বিয়ের পরেও সে স্বাধীন জীবনযাপনে আরামবোধ করে, যা প্রচলিত সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। সন্ধ্যা মূল্যবোধবিবর্জিত উচ্ছৃঙ্খল নারী। রেস, হোটেল, মদ্যপান ও গভীররাত পর্যন্ত পরপুরুষের সঙ্গে আড্ডা, মোহনের বাড়িতে রাত কাটানো, নিঃসন্তান থাকার চিন্তায় স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়িতে বসবাস, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে স্বামীর কাছ থেকে অর্থ আদায় করে ফূর্তিতে সময়ব্যয় – এসবই তার রুটিন কাজ। তবে শেষ পর্যন্ত চিন্ময়ের ভালোবাসার কাছে সন্ধ্যা হার মানে। চিন্ময় তার সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা মেনে নিয়ে তাকে মাতৃত্বের মায়াজালে বেঁধে ফেলে। বেপথু সন্ধ্যা সুপথে প্রত্যাবর্তন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মানিকের *শহরবাসের ইতিকথা* রচিত হয়। এই সময়কালে উপনিবেশিত ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় যেমন পরিবর্তন সংঘটিত হয় তেমনি মানিকের জীবন ও শিল্পবোধেও আসে ব্যাপক পরিবর্তন। "শহরবাসের ইতিকথা' লেখার সময়ে তিনি সরাসরি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। 'প্রগতি লেখক সংঘে' যোগ দেন। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপ সমাজজীবনের সর্বত্র দেখা দেয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিতেও একটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তার ওপর শুরু হয় ভয়াবহ মন্বন্তর। এটি অশনি সংকেত লেখার কাল। ঔপনিবেশিক শাসনের সুবাদে ইউরোপের বাধানো যুদ্ধের ফলে এদেশের মানুষকেও কম মূল্য দিতে হয়নি। বাঁচার তাগিদে গ্রাম থেকে দলে দলে শ্রমিক শহরে আসছিল। ভেঙে পড়ছিল ভারতের শ্রেণী ভিত্তিক আদি পেশা। ...যে আশা নিয়ে শ্রীপতি পূর্বপুরুষদের আদি ব্যবসা ছেড়ে মোহনের সঙ্গে কলকাতায় আসেতা পূরণ হয়নি। যুবতী স্ত্রী কদমকে ফেলে আসতে হয় শ্রীপতিকে। আর মন না চাইলেও যেতে হয় গণিকা দুর্গার কাছে।...বারবণিতা দুর্গা চম্পারাও সামাজিক বৈষম্যের শিকার।'[২] বস্তুত, ব্রিটিশ পুঁজিবাদের প্রভাবে যে শহরের গোড়া পত্তন হয়েছিল সে শহর বাস্তবিক অর্থে জনবান্ধব শহর ছিল না। পুঁজিবাদের অসম বিকাশে সেখানে বহুমুখী অন্যায় ও অসামাজিক কাজের উদ্ভব হয়। মানুষের মধ্যে বৈষম্য প্রকট হয়। মানুষে-মানুষে

১. শহরবাসের ইতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

২. মজিদ মাহমুদ, *সহরবাসের ইতিকথা ও ইতিকথার পরের কথা : মানিকের কম পঠিত দুটি উপন্যাস*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, *উত্তরাধিকার*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ-১৭৪

অবিশ্বাস প্রবল হয়; পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাস-অনাস্থা ঘনীভূত হয়। মনোমোহনের সঙ্গে তার মা-ভাইয়ের মনোজাগতিক বিচ্ছিন্নতাও এর প্রতিফল।

লেখক এ উপন্যাসে শ্রমিকদের সামষ্টিক জীবনচেতনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে নগরসংস্কৃতির প্রতি যে মোহ তার মূলে সক্রিয় ঔপনিবেশিক শাসকদের শাসন-শোষণ-আড়ালকারী তত্ত্ব প্রচার। তারাই সৃষ্টি করেছে অপর ভাবনা এবং কেন্দ্র-প্রান্তের ধারণা। তারা নিজেদের উন্নত, সমৃদ্ধ আলোকিত, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান মনে করেছে আর আমাদের অপরের তালিকায় ফেলে ভেবেছে, এই অপরেরা অশিক্ষিত, অসংস্কৃত ও অনালোকিত। এ ধরনের অপর ভাবনা থেকেই তারা প্রচার করেছে কেন্দ্র-প্রান্তের ধারণা।'[১] এই কারণে প্রান্তস্থিত যে-সমস্ত মানুষ কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বিত্ত ও বিদ্যা অর্জন করেছে, তারা নগরকেন্দ্রে বসবাসের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ-জন্য 'সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, অনিবার্য প্রয়োজন, তার নিজের অন্য ধরনের মানুষ হওয়া।'[২] এই ব্যর্থতার কারণেই শহরজীবনে মনোমোহন উন্মূলিত, দলছুট ও খাপছাড়া। 'শহরের জীবন-স্রোতে সে কুটার মতো ভাসিয়া চলিয়াছে, নোঙরের ব্যবস্থা করিতে স্মরণ ছিল না।' [৩]

চিন্তামণি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চিন্তামণি* (১৯৪৬)[৪] উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় গ্রাম-বাংলার বিধ্বস্ত অর্থনীতি এবং কৃষক সমাজের করুণ কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। *'চিন্তামণি*তে আছে আর্থনীতিক সমস্যার তীব্রতা, পুরনো মূল্যবোধকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দেবার কাহিনি। পৃথিবীজোড়া আর্থনীতিক সংকট ও মহাযুদ্ধ কীভাবে ব্যক্তি ও সমষ্টিজীবনের মূল্যবোধ ও সম্পর্ককে বদলে দেয়, তার নির্মম কাহিনি এ ছোট উপন্যাসটি। সমাজের পরিবর্তন তার আর্থনীতিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল – এই তত্ত্বটির শিল্পরূপায়ন *চিন্তামণি*।'[৫] আয়তনে ছোট হলেও *চিন্তামণি* মানিকের বিশিষ্টতার স্বাক্ষর বহন করে। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার

---

১. সৈয়দ আজিজুলহক, *কথাশিল্পী মানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

২. শহরবাসের ইতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৩. শহরবাসের ইতিকথা, প্রাগুক্ত

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্দশ উপন্যাস চিন্তামণি। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৫৩) এটি প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি পূর্বাশা পত্রিকায় 'রাঙামাটির চাষী' নামে ১৩৫০-এর আশ্বিন থেকে চৈত্র এবং ১৩৫১-এর কার্তিক থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত মোট বারো কিস্তিতে মুদ্রিত হয়।

৫. অরুণ কুমার মখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ৯৯

পটভূমিতে রচিত *চিন্তামণি* আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবেও সর্বমহলে সমাদৃত। 'ক্ষুদ্রায়ত এই উপন্যাসের ফ্রেমে এবং বৃহৎ তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রপটকে নিবন্ধ করার ব্যাপারে লেখককে বিশেষ সহায়তা করেছে উপন্যাসে ব্যবহৃত একাধিক চিঠি। 'বৈন' চিন্তামণিকে লেখা তার দিদির পত্রগুচ্ছের পটে ক্রমশ উৎকীর্ণ হয়েছে দুর্ভিক্ষকালীন দিনগুলির সুকঠিন বাস্তবতা।'[১]

চিন্তামনি এ উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র এবং উপন্যাসের কাহিনিস্থল মধুবনী গ্রাম। চব্বিশ পরগনার খিদিরপুর গ্রাম ছেড়ে চিন্তামণি ক্ষুধার তাড়নায় মধুবনী যায়। সেখানে সে হরেনাম রাইস মিলের মালিক নীলকণ্ঠ ঘোষালের বাড়িতে দাসির কাজ নেয়। উপন্যাসের এক পর্যায়ে গৌরের সঙ্গে চিন্তামণির সম্পর্ক তৈরি হয়। রাতে গৌর তার কাছে যায়, চিন্তামণিও তাকে শরীরে-মনে ভালোবাসে। এরই মধ্যে চিন্তামণির প্রতি বিতৃষ্ণাবশত মামাবাড়ি যায় গৌর। কয়েকদিন পরে সে আবার মধুবনীতে ফিরে আসে। ততদিনে দুর্ভিক্ষ কঠিন রূপ ধারণ করেছে। চিন্তামণির দিদির চিঠিতে তার প্রমাণ স্পষ্ট :

> অদেষ্টে সুখ নাই আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। কে দিবে যে আমার মন্দ অদেষ্ট আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব। আমার জমিটুকু ওঁনার বড়ো ভাই জোর করিয়া গার দাপটে ভোগ দখল করেন তুমি জানিবা এবং কতকাল আমার বলিবার কিছু মুখ নাই কারণ গুরুজন বেটাছেলা তাঁহার অমান্য করিলে লোকে থুথু দিবে। বিন্দীপাড়ার বিপিনকে দিয়া এবার বলাইলাম যে এ দুর্দ্দিনে আমার ভাগ দিবেন আমি এতকাল চাই নাই এখন ভাগ না পাইলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। পেটের খুধায় তুমি মধুবনী গিয়াছ বলিয়া আমার অন্তরে কত দুক্ষ জানিয়া গ্রাহ্য করিল না। সাফ জবাব দিল এমন পাষাণ। আমি কত সাধাসাধি করিলাম দাদা গিয়া কিছু বলিল না।[২]

চিন্তামণির দিদিও খিদিরপুর ছেড়ে বড়নিছিপুরে যায় কাজ করতে। সেখানে সে প্রথমে এক বাড়িতে, পরে ব্যারাকে দাসীর কাজ নেয়। সে তার বোনকে চিঠি লেখে :

> তুমি আমি দুই বোইন মন্দ অদিষ্ট নিয়া জন্মিয়াছি। আমার সোয়ামী থাকিয়া নাই তুমি কচি বয়সে সিঁদুর মুছিলা। তুমি আটটাকা পাঠাইয়াছ তাহাতে কি হইবে জিনিসপত্র আগুন হইয়াছে। বাবুরা শুদ্দ দিশা পাইতেছে না কি দিয়া কি করিবে। ছেলাপিলা মাগের ভাত কাপড় দিতে মাথায় হাত দিয়া কান্দে। তুমি

---

১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০০৮, পৃ. ১১৫

২. *চিন্তামণি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

আমাকে টাকা পাঠাইয়াছ তাতে কত সুখী হইয়াছি যে দিদিরে তুমি ভুলিলা না নিজে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইলা। নিজ বয়স বুঝিয়া সাবধানে চলিবা মন্দ লোক বুঝিলে কোন সংসর্গ রাখিবা না। পেটের খিদায় তুমি মধুবনী গিয়াছ ইহা আমারই অদিষ্ট। বড়নিছিপুরে আমি ভূষণ বাবুর বাসায় আসিয়াছি। ভূষণবাবুরে তুমি চিনিবা তিনি মোদের গাঁয়ের হালদার মশায়ের বড় জামাই তোমার হাত ধরিয়া টানিতে দেখিয়া যাহাকে গালমন্দ করিয়াছিলাম কিন্তু কেলেঙ্কারির ভয়ে প্রকাশ করি নাই। আমি ভূষণ বাবুর বাড়ি আসিয়া আছি। ইনি এমন ভালো লোক তাহা জানিতাম না। আমাকে নিরাশ্রয় জানিয়া এখানে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন।[১]

যুদ্ধের এই খবর মধুবনীতেও এসে পৌঁছে। তাই হু হু করে বেড়ে যায় জিনিসপত্রের দাম, কিছু জিনিস একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। লেখক তা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

বঞ্চিত নিষ্পেষিত জীবন এদের কাছে স্বাভাবিক সংগত ও অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, সুদূরের বিদেশের যুদ্ধের চাপটা তারা অনুভব করে ধীরে সুস্থে। কোনোমতে বেঁচে থাকার সামান্য প্রয়োজনগুলি এলোমেলো হয়ে থাকার চাপ। কোনোদিকের চাপটা বাড়ে ক্রমে ক্রমে কোনোদিকের চাপ অকস্মাৎ বেড়ে গিয়ে তাদের দিশেহারা করে দেয়। তেল নুন মশলার দোকানে আধলা ছিদামের বিক্রি বন্ধ হওয়ার মধ্যে তারা ব্যক্তিগতভাবে টের পায় যুদ্ধের ধাক্কা।[২]

এ আকালের কারণে মানুষ দুবেলা পেট ভরে ভাত খেতে পারে না। কৃষি উপকরণের জন্য ভুগেছে অনেক কৃষক। এমন পরিস্থিতিতে চিন্তামণি আবার দিদির চিঠি পায় :

আমি কাজ করিতেছি জানিবা। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কী দুঃখ পাইয়াছি না খাইয়া উপাস করিয়াছি এখানে পোড়া পেটের জ্বালায় বজ্জাত ডাকাইতগুলার দাসী হইলাম ইহা অদেষ্টে ছিল। কিরূপ হৈচৈ হইয়াছে লম্বা লম্বা কত বাড়ি উঠিয়াছে অবাক কাণ্ড দেখিয়া তুমি চোখের পলক ফেলিতে পারিবা না। ইহাকে বারাক বলিয়া জানিবা। ইহার মধ্যে গাদায় গাদায় মাতাল গুণ্ডা গিজগিজ করিতেছে। আমার মত শতাবধি পোড়াকপালী ঝির কাজ করিতে আসিয়াছে। কাহারো ধর্ম্ম নাই সতীত্ব নাই এরূপ কাণ্ড। বয়স হইয়াছে তথাপি আমারে টানাটানি করে কোনোমতে ধর্ম্ম রাখিয়াছি। না খাইয়া মরিবার দাখিল হইয়াছিলাম ইহা ভিন্ন গতি কি।[৩]

---

১. *চিন্তামণি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

২. *চিন্তামণি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৩. *চিন্তামণি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

উপন্যাসে গ্রামীণ মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীদের শোষণের চিত্র উঠে এসেছে। তাদের অমানবিক, নিষ্ঠুর ও নিয়ম-নীতিহীন শোষণের বেড়াজালে নিঃশেষিত হয়েছে মধুবনী গ্রামের কৃষক। এদের দাদন ব্যবসায়ের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি না থাকলেও, সমাজজীবনে রয়েছে তাদের ব্যাপক প্রভাব। *চিন্তামণি* উপন্যাসে তিনুর মতো ভূস্বামীরা কঠোর শর্তে কৃষকদের ঋণ প্রদান করে। তিনুর ভাই সরকারি 'তকমাধারী চাপরাসি' হওয়ায় তার সুবিধাও বেশি। গ্রামের অনেক কৃষক বীজ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে তিনুর দ্বারস্থ হয় এবং সে তাদের ঠকানোর চেষ্টা করে। লেখকের বর্ণনায় তা আরো স্পষ্ট :

> বুড়ো হারাণের সাত বিঘে জমি, তার চার বিঘেতে বীজ ছড়ানো চলবে। তিন বিঘে বাঁজা হয়ে থাকবে উর্বরা বিধবা মেয়ের মতো। হারাণ করে কী, তিনুর কাছে গেল। তোমার অনেক বিঘে জমি তিনু, শ বিঘে হোক তাই কামনা করি, লক্ষ্মীমন্ত হও। তুমি দানা পেয়েছ ঢের, ভালো সরকারি দানা, তোমার দীনু ভাইটি তক্‌মাধারী চাপরাশি, আহা, তার ভালো হোক, তোমার ভালো হোক। তুই আমার বাপ তিনু, আমার জন্মদাতা বাপ, গড় করছি তোর দুটি পায়ে, আমায় দানা দে। দাম নে, নগদ নে, বেশি নে, কিন্তু দে।[১]

তিনুদের কাছ থেকে বীজধান সংগ্রহ করে গৌর, রঘু, হারাণ, সদয় ও চাঁদের মতো অনেকেই। এতে তিনুর মতো মহাজনরা আরও সম্পদশালী হয়ে ওঠে। অপরদিকে কৃষকেরা হয়ে যায় নিঃস্ব। অনেক কষ্টের পর জমিতে ভালো ফসল হয়, কিন্তু তাদের বুক কেঁপে ওঠে। কারণ ধান উঠলেই তাদের মহাজনের পাওনা পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু কৃষক পাওনা শোধ করতে পারে না, তাই বেড়ে যায় ঋণের বোঝা। মানিক জানিয়েছেন :

> কী একটা প্যাঁচে যেন তারা পড়েছে, কী যেন মুশকিল ঘটবে তাদের, বিপদ আসবে। অভাবের জীবনে অভাব বাড়ে কমে, দুর্ভোগ চড়ে নামে, ওসব খাপছাড়া কিছু নয়। এবার সব উল্টোপাল্টা, গোলমেলে, অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। হাতের মুঠোয় এসে লাভ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লোকসানে। ভালো ফসল ঘরে তুলে বেড়ে যাচ্ছে খিদের যাতনাভোগ। জমিদার মহাজন উকিল ডাক্তার দোকানি পশারি আত্মীয় পরিজন বন্ধু ও পর নিয়ে যত মানুষের সঙ্গে ছিল তাদের কারবার, কটা মাসে যেন কেমন হয়ে গেছে তারা সকলে, কথা ও ব্যবহার যেন বদলে গেছে আগাগোড়া, লেনদেনের স্বাভাবিক হৃদয়হীনতা যেন দাঁড়িয়ে গেছে উলঙ্গ কুৎসিত নিষ্ঠুরতায়, লোভের যে অত্যাচার ছিল শুধু আদায়ের জন্য - আদায়ের পরে যেন তা বজায় থাকছে আরো তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়ে।

---

১. *চিন্তামণি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

কে জানে এসব কীসের সূচনা, কী আছে তাদের ভাগ্যে![১]

চিন্তামণি উপন্যাসের কাহিনি তৎকালীন সমাজের বাস্তব কাহিনি। দুর্ভিক্ষ ও মহাযুদ্ধ গ্রামবাসীকে কীভাবে অর্থনৈতিক মহাসংকটের দিকে ধাবিত করেছে – তারই বাস্তব আলেখ্য এ-উপন্যাস। বিভীষিকার মতো হয়ে উঠেছিল গ্রামীণ জীবনের অভাব, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য। চাঁপাবালার আত্মহত্যা, হৈমীর কলঙ্ক, গৃহস্থ ঘরের কন্যা ও বধূ চিন্তামণি ও তার দিদির নিজ গ্রাম ত্যাগ করে ধনবানের গৃহে ও সৈন্যদের ব্যারাকে ঝিয়ের কাজ করা, ব্যারাকে ব্যারাকে গ্রামের চাষি ও বধূ-কন্যাদের বাধ্যতামূলক দেহদান, চাঁদকাকা, চাঁদকাকার শাশুড়ি, পটু, গৌরের মা-র মৃত্যু – এসবই দুর্ভিক্ষ ও মহাযুদ্ধের প্রভাব।

উপন্যাসে শ্রমিক-চেতনায় উত্তরণের মধ্য দিয়ে কাহিনির শেষ হয়েছে। উপন্যাসটি 'ছোট, কিন্তু সুগ্রথিত কাহিনী। চিন্তামণি ও গৌরকে কেন্দ্রে রেখেই কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। চিন্তামণি গৌরের প্রেমকাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে – কিন্তু কাহিনীকথন রীতি কখনোই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সম্পূর্ণ সমাজকেন্দ্রিক। চিন্তামণি গৌরের চারপাশে শুধু অনেক সামাজিক চরিত্র ভিড় করে আসেনি, তাদের প্রেমের গতিও নিয়ন্ত্রণ করেছে আর্থ-সামাজিক ও সমকালীন চাপ। মানিকের উপন্যাসে একদিন যে ভূমিকা ছিল নিয়তির, এখন তার জায়গা দখল করেছে অর্থনীতি; কিংবা কথাটি ঘুরিয়ে এভাবে বলা যায়, অনির্দেশী নিয়তি নয়, সুনির্দিষ্ট অর্থনীতিই এখন মানিকের চরিত্রের নিয়তি।'[২]

খুনি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *খুনি* [৩] (১৯৪৩-৪৫) একটি মনোবিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মুকুন্দ। চাকরিচ্যুত অবস্থায় বেকারত্বের ঘানি টানতে গিয়ে সে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত

---

১. *চিন্তামণি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৩ (ক) 'খুনি' বানানটি মানিক পুত্র সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *খুনি* উপনাস থেকে গৃহীত। উপন্যাসটি প্রকাশ করেছে দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০১৫

১ (খ) '*খুনি*কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চদশ উপন্যাস বলা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় এটি তাঁর কোনো রচনাসংগ্রহে সংকলিত হয়নি। উপন্যাসটি 'নতুন জীবন' পত্রিকায় ১৩৫০ সনের পৌষ থেকে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়ে ১৩৫২র বৈশাখ মাস পর্যন্ত (১৯৪৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৫-এর এপ্রিল পর্যন্ত) মোট বারো কিস্তিতে সমাপ্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র*-এর একাদশ খণ্ডে উপন্যাসটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়।' (দ্রষ্টব্য : সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২)

সম্মানহানির কথা চিন্তা করে সে বেকারত্বের বিষয়টি আপনজনের কাছেও গোপন রাখে। এসময় সে গোপনে স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রি করে সংসার চালায়; এবং এ ঘটনা যেন কোনোভাবে প্রকাশ না পায়, সেজন্য সে স্ত্রীকে হত্যাও করে। এসবই সে করে তার মানসিক বিকারগ্রস্ততার কারণে।

মুকুন্দের বিকারগ্রস্ততার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তার ডাক্তারবন্ধু শরীরে সিফিলিসের অস্তিত্ব পায়। চিকিৎসার মাধ্যমে মুকুন্দ আরোগ্য লাভ করলেও সে মনোজাগতিক জটিলতা থেকে মুক্তি পায় না। তার মনের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। মনের এই ব্যাধি থেকে তার মুক্তি মেলে না। এই ব্যাধির স্বরূপ লেখকের বর্ণনায় নিম্নরূপ :

> মুকুন্দের মনে হইয়াছিল, যে অসুস্থ মনের বিকৃত খেয়ালে সে স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিল, সেই অসুস্থ মনেই কি নিজেকে হত্যা করার এই প্রেরণা জাগিতেছে না? মন তার স্বাভাবিক অবস্থায় নাই, একেবারে না হোক খানিকটা সে উন্মাদেরই শামিল। ভালো মন্দ উচিত অনুচিত বিবেচনা করার ক্ষমতা কী তার আছে? এই বিষাক্ত দেহ এবং ব্যর্থ বিধ্বস্ত জীবনটা শেষ করিয়া সব চুকাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা জাগাটাই হয়তো তার রোগেরই একটা লক্ষণ![১]

মুকুন্দের স্ত্রী কামিনী সহজ-সরল। সংসারের যাবতীয় কাজ সে একাই সামলে নেয়। চাকরিহীন জীবনে মুকুন্দের পাল্টে যাওয়া কামিনী বিশ্বাস করতে পারে না। যে লোকটি জীবনে কড়াকথা পর্যন্ত বলেনি, চাকরি হারিয়ে সে বারুদের মতো জ্বলে ওঠে। মুকুন্দ প্রায়শ ভাবে :

(গ) ' উপন্যাসটি রচিত হওয়ার কয়েক দশক পেরিয়ে মাত্র ক-বছর আগে কলকাতার এক প্রাচীন গ্রন্থাগার 'হিরণ লাইব্রেরি' থেকে সংগৃহিত দুষ্প্রাপ্য সাহিত্যপত্র *নতুনজীবন*-এ বারো কিস্তিতে ধারাবাহিক প্রকাশিত *খুনি* (পত্রিকায় 'খুনী') উপন্যাসের এগারোটি কিস্তি এবং বরানগর-এর জগন্নাথ চন্দ্র মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দ্বাদশ তথা সর্বশেষ কিস্তিটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের কথা এই যে, হিরণ লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত এগারোটি কিস্তির প্রথম তিনটি অংশ কীটদষ্ট থাকায় অনেকগুলি গ্রন্থাগারে নিরন্তর অনুসন্ধানের পরেও, ...শেষ পর্যন্ত প্রথম দু-টি কিস্তির অক্ষত পাঠ সংগ্রহ করা গেল না।' (দ্রষ্টব্য : সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কৈফিয়ত : মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পরিবারের পক্ষ থেকে', *খুনি*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০১৫, পৃ. ৫-৬)

১. *খুনি*, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,পূর্বোক্ত, পৃ-৫২

এই কামিনী তার শত্রু, তার জীবনের অভিশাপ। এ কী অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে এর মনে কষ্ট লাগবে বলে চাকরি যাবার খবরটা সে এর কাছে গোপন করেছিল? এর মনে যাতে ব্যথা না লাগে মাসের পর মাস সেই চেষ্টায় রত থেকে সে উন্মাদ হয়ে যেতে বসেছে ?[১]

কামিনী স্বামীর সঙ্গে একদিন বাকযুদ্ধে লিপ্ত হলে মুকুন্দ তার শরীরে ক্রমাগত আঘাত করে। এরপর স্ত্রীর গলা চেপে ধরে সে উন্মাদের মতো ঝাঁকাতে থাকে; অতঃপর হার্টফেল করে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে– এই মর্মে ডাক্তারি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে।

এ-উপন্যাসে মুকুন্দের মনোবিকারের কারণ তার চাকরিচ্যুতি। আর্থিক অনটন ও জীবনযাপনের অনিশ্চয়তার কারণে সে হারিয়ে ফেলে মানসিক সুস্থতা। এজন্য দায়ী ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং এর প্রতিভূ চরিত্র ধনদাস। ধনদাস ইন্সুরেন্স কোম্পানি এবং চালানি কারবারের মালিক। দেনার দায় দেখিয়ে একটি প্রেসও সে করায়ত্ত করে। মুকুন্দের সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে অফিসে যেতে বলে। এই ধনদাসই মুকুন্দকে চাকরি থেকে বিতাড়িত করে অনিশ্চিত জীবনে নিক্ষেপ করেছিল। প্রথমে দ্বিধান্বিত হলেও মুকুন্দ অবশেষে ধনদাসের প্রেসে চাকরি নেয়। ধনদাসের অফিসের নিয়ম-কানুনে বেশ কড়াকড়ি। সাতদিনের কাজ পাঁচদিনের মধ্যে করলেও মুকুন্দের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নতুন কাজ। এ অফিসে আসা-যাওয়ার সময়ও কঠোরভাবে বেঁধে দেওয়া :

আপিসে সকলকে আসতে হয় দশটায়, খাতায় সই করতে হয় নাম। দশটার পর কৈফিয়ত, সাড়ে দশটার পর লেট, এগারটার পর গরহাজির। গরহাজির, কিন্তু এসেছো যখন, কাজ করতে দোষ কী? কাজ তো শেষ করা চাই।

টিফিনের ছুটি আধ ঘন্টা। ঘড়ির কাটা ধরে – কম নয়, বেশি নয়। ঠিক একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। ধনদাস প্রায়ই একটা বাজার একটু পরে আপিসটা একবার পাক দেয়। যারা আসনে বসে থেকেই চা আর খাবার আনিয়ে খাচ্ছে দেখতে পায়, তাদের সঙ্গে হাসিমুখে দু-একটা কথা কয়। অধিকাংশ কর্মচারীই তাই টিফিনের ছুটিটা ছেঁটে ফেলেছে। বাইরে যে উঠে যায়, সে-ও পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি বাইরে থাকে না।[২]

একপর্যায়ে মুকুন্দ তার চাকরিদাতা ধনদাসের মধ্যেও বিকৃত মানসিকতার পরিচয় পায়। ধনদাস তার দুরসম্পর্কীয়া নাতনি সুধার সঙ্গে মুকুন্দের বিয়ে দেওয়ার চিন্তা করে। এজন্য সে মুকুন্দকে নিজবাড়িতে নিমন্ত্রণ

১. *খুনি*, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ-২১

২. *খুনি*, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ-২৮

করে। মুকুন্দ এ-প্রস্তাবে সাড়া না দিলে মেয়েটি ক্ষোভে দুঃখে আত্মহত্যা করে। মেয়েটির আত্মহত্যার জন্য ধনদাসকেই দায়ী করে মুকুন্দ :

> মুকুন্দের মনে হয়, সুধা আত্মহত্যা করে নাই, তাকে খুন করা হইয়াছে। সে চমকাইয়া ওঠে। খুন? না, ঠিক সেরকম খুন নয়, কামিনীকে সে যেভাবে খুন করিয়াছিল। কিন্তু তবু এ-ও খুন বইকি। তফাত শুধু প্রক্রিয়ার। নিজের হাতে না করিয়া ধনদাস সুধাকে দিয়াই খুন করাইয়াছে। অস্ত্র বা বিষের কাজ করিয়াছে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি।[১]

শুধু তাই নয়, স্ত্রী কামিনীর মৃত্যুর জন্যও সে ধনদাসকে দায়ী করে। ধনদাসদের ধনতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে মুকুন্দের সুখের সংসার ভেঙে গেছে। ধনদাসদের মতো পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে সমাজে দারিদ্র্য-বেকারত্ব সৃষ্টি করে এবং এর পরিণতি ভোগ করে মুকুন্দ-সুধা-কামিনীরা। পুঁজিপতিরা তদের ধনস্ফীতির জন্য সাধারণ মানুষকে দাসানুদাসে পরিণত করে। শোষণের জাল বিস্তৃত করে তাদের দেহমন পঙ্গু করে দেয়। এর ফলে এসব মানুষের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে মানুষী চেতনা উধাও হয়ে যায়, তাদের মধ্যে দেখা দেয় মানসিক বিকৃতি। এই আত্মোপলব্ধিই মুকুন্দকে উত্তীর্ণ করে অস্তিত্বের শুদ্ধসত্তায়। সে নির্দ্বিধায় চাকরি ছেড়ে দেয়। এভাবে ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি ধনদাসকে ঘৃণার মাধ্যমে তার চৈতন্যলোকে সঞ্চারিত হয় পরম তৃপ্তির বোধ :

> বহুদিন পরে আজ মুকুন্দের মন শান্ত হইয়াছে। ঘৃণা যে মানুষকে এত উঁচুতে তুলিয়া দিতে পারে, তলাইয়া দিতে পারে সমস্‌দ ছোটো ছোটো দুঃখ যন্ত্রণা অশান্তি ও ভয়, ঘুচাইয়া দিতে পারে এতকালের সদীর্ঘ জীবনের একটানা অনিশ্চয়তা, মুকুন্দের তা জানা ছিল না। পথ চলিতে চলিতে যে মানুষের ভিড়কে বুকের মধ্যে অনুভব করে – বাহিরের জনতা এতদিন পরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে জনাকীর্ণ করিয়াছে, ঘুচিয়া গিয়াছে এতদিনের নিঃসঙ্গতা।[২]

এতদিন যে নিঃসঙ্গতা, আত্মবিবরগামিতা কিংবা বিকৃতি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল, তা থেকে উত্তরণ ঘটে মুকুন্দের। সে এই সমাজের বিকৃতির কারণ সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারে; স্ত্রীর খুনের কার্যকারণও নির্ণয় করতে সক্ষম হয় :

> কামিনীর কথা মনে পড়ে। আজ সে প্রথম দ্বিধাহীন সংশয়হীন বিশ্বাস করিতে পারে যে কামিনীকে খুন করার দায়িত্ব তার নয়। যে মন লইয়া সে কামিনীকে খুন করিয়াছিল সেই মনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিকৃত ও

---

১. *খুনি*, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

২. *খুনি*, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

ভয়াবহ আবেষ্টনী যারা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, দায়ী তারা। চাকরি না থাকায় অভিমানে কামিনীর শ্রদ্ধা হারানোর কল্পনায় যে-মন কামিনীকে খুন করিয়াছিল, সে-মন সে গড়ে নাই, গড়িয়াছিল এই খুনিদের নিয়ন্ত্রিত সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ।[১]

প্রকৃতপক্ষে মুকুন্দের এই আত্মোপলব্ধিই *খুনি* উপন্যাসটিকে অনন্যতা দান করেছে। সেই সঙ্গে সমাজের প্রকাশ-প্রকরণ প্রসঙ্গে মানিকের জীবন ও শিল্পদৃষ্টির স্বচ্ছতাও এ-উপন্যাসের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে।

আদায়ের ইতিহাস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আদায়ের ইতিহাস* (১৯৪৭)[২] রাজনীতি পরোক্ষভাবে থাকলেও তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয়। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ইঙ্গিত উপন্যাসের গৌণ প্রসঙ্গ। রাজনৈতিক বিবেচনায় নয়, সমাজের দর্পণ হিসেবেই এটি বিশিষ্টতার দাবিদার। উপন্যাসটিতে দুটি শাখা কাহিনি রয়েছে : একটি প্রভা ও রমেশ দম্পতি বিষয়ক, আরেকটি রমলা ও ধীরেনের দাম্পত্যজীবনকেন্দ্রিক। প্রথম কাহিনিতে দেখা যায়, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে রমেশের কারাদণ্ড হয়েছে। স্ত্রী এবং শ্বশুর পরিবারের অব্যাহত অপমানের চেয়ে জেল জীবনকেই সে শ্রেয় মনে করেছে। কারণ তিনবছর পূর্বে চাকরি হারিয়ে তার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে; তার জীবনযাপন হয়ে পড়েছে হতশ্রীদশাগ্রস্ত। ত্রিষ্টুপের দৃষ্টিকোণ থেকে রমেশের আর্থিক হতদশার একটি চিত্র লক্ষণীয় :

রোয়াকে একটি আধপোড়া বিড়ি পড়িয়াছিল, কোথা হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া গিয়া রমেশ হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিড়িটা কুড়াইয়া নিয়াছে। বিড়ি নিয়া রমেশ ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, সেখান হইতে ডাক আসিল রাণুর। ঘরে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাণু ফিরিয়া আসিল।

দেশলাইটা দাও না দিদিমা, বাবা চাচ্ছে।

---

১. *খুনি*, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২. 'আদায়ের ইতিহাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তদশ উপন্যাস। কলকাতার এ. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লি. এর প্রথম প্রকাশক। উপন্যাসটি আনুমানিক ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত; এর নির্ভুল প্রকাশ-তারিখ পাওয়া যায় না। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'প্রবর্তক' পত্রিকার ২৬শ বর্ষের কয়েকটি সংখ্যায় পাঁচ কিস্তিতে অর্থাৎ ১৩৪৮ সনের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১৯৪১ সালের এপ্রিল, মে, জুন, অক্টোবর ও নভেম্বর) উপন্যাসটি অসম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত হয়। তারপর অজ্ঞাত কারণে এর প্রকাশ বন্ধ থাকে। ১৩৫০ সনের বৈশাখ (এপ্রিল ১৯৪৩) থেকে একই পত্রিকায় উপন্যাসটি আবার গোড়া থেকে মুদ্রিত হতে থাকে এবং ১৩৫১র বৈশাখ (এপ্রিল ১৯৪৪) পর্যন্ত দশ কিস্তিতে সম্পূর্ণতা লাভ করে।' (দ্রষ্টব্য : সৈয়দ আজিজুলহক, *কথাশিল্পী মানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২)

> আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া খায়, তিন বছরে রমেশের এমন অবস্থা হইয়াছে? প্রভার জন্য ত্রিষ্টুপ হঠাৎ গভীর মমতা বোধ করে। রমেশকে আজ আধপোড়া বিড়ি কুড়াইয়া বেড়াইতে হয় বলিয়াই তো প্রভা সারাদিন নালিশ করিয়া কাঁদিবার অজুহাত খোঁজে। আর কয়েক বছর পরে দুজনের অবস্থা কী দাঁড়াইবে কে জানে?[১]

দ্বিতীয় কাহিনিতে দেখা যায়, রমলা-ধীরেনের সংসার গড়ে উঠছে একটি আদর্শিক পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে। অল্পতেই ওদের সংসারে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। একারণে কোনো বিকারগ্রস্ততা তাদের আচ্ছন্ন করতে পারেনি। রমেশ-প্রভার সংঘাতময় জীবনের পাশে রমলা-ধীরেনের আদর্শময় জীবন তাই সমাজে প্রশংসিত হয়েছে। অপরদিকে জেলফেরত ধীরেনের গ্রহণযোগ্যতাও শুধু সমাজ নয়, রমলা, মণীষ ও কুন্তলার কাছেও বৃদ্ধি পেয়েছে। কুন্তলা স্বাধীনতা অর্জন করতে তার জীবন দিতেও প্রস্তুত। তাদের ব্যক্তিত্বে, জীবনাচরণে এক ধরনের আভিজাত্যবোধ ফুটে উঠেছে। বস্তুসম্পদ অর্জনে এদের লোভ নেই বললেই চলে। এদের কাছে স্বাধীনতা অমৃতের মতো। উপন্যাসে পরোক্ষভাবে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনে সম্পৃক্ততা থাকায় রমেশের জেল এবং জেলমুক্তিতে তারা উচ্ছ্বসিত। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেন :

> আদায়ের ইতিহাসে রাজনীতি আছে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের। কোন দলের তা বলা নেই। ধীরেন জেল খেটে এসেছে, এইটুকু মাত্র উল্লেখ। ধীরেনকে এই জন্যই পছন্দ মণীশের। রমলা এবং কুন্তলার কোথাও তাদের রাজনীতি করতে দেখা যায়নি। আদর্শ কি তাও স্পষ্ট নয়। কুন্তলা বলেছে, তারা স্বাধীনতার জন্য জীবন দেবার দলে। এটা তাদের রক্তেমাংশে মিশে গেছে তার পরিচয় আছে এদের ব্যক্তিত্বের গঠনে, এরা সবাই শান্ত ও দৃঢ়, বলিষ্ঠ অথচ জোর নেই কোথাও। এরা সহজ স্বাভাবিক, এদের বস্তুসম্পদে লোভ নেই। আধুনিককালের ব্রহ্মবাদী এরা। এদের প্রত্যয় যা দ্বারা অমৃত লাভ হবে না তা দিয়ে আমি কি করব? এই অমৃত হল স্বাধীনতা। এ যেন বিপ্লবী আত্মদানে উন্মুখ স্বাধীনতাকামীর আবেগকম্প্র সংঘাত প্রতিজ্ঞা। এইভাবে প্রচারিত হওয়ার রাজনীতি আর প্রচার থাকে না। একটা জীবন সংগীতের মতো হয়ে ওঠে।[২]

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ত্রিষ্টুপ পরিশ্রমী ও উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তবে তার মনের গঠন অনেকটা জটিল। নিজের জীবনে প্রচুর অর্থসংকট রয়েছে, তথাপি সে অন্যের অর্থসংকটের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। বড়ো হওয়ার স্বপ্ন তাকে তাড়িত করলেও তা বাস্তবায়নের পন্থা তার জানা নেই। চাকরি পেয়ে উৎফুল্ল-উল্লসিত মানুষদের দেখে সে বিরক্ত হয়। বন্ধুদের আড্ডায়ও সে নিজেকে অসহায় মনে করে। বাবা অবিনাশ তার উপার্জনের ওপর

---

১. *আদায়ের ইতিহাস*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩২

২. ক্ষেত্র গুপ্ত, *ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

কর্তৃত্ব দেখাতে চায়। বেতনের পুরো পঁচাত্তর টাকা প্রথমে তিনি হস্তগত করেন; অতঃপর পঞ্চাশ টাকা নিজে রেখে পঁচিশ টাকা ত্রিষ্টুপকে ফেরত দেন :

> বেতনের সমস্ত টাকাই ত্রিষ্টুপ বাপের হাতে তুলিয়া দেয়, অবিনাশ পঞ্চাশ টাকা রাখিয়া তাকে পঁচিশ টাকা ফেরত দেন। এটা প্রায় নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ত্রিষ্টুপের মনটা খুঁতখুঁত করে। হাতখরচের জন্য অবিনাশ তাকে পঁচিশ টাকা সঙ্গে সঙ্গে ফিরাইয়া দিবেন, কিন্তু সে জানে ওই টাকাটা কাটিয়া রাখিয়া বাকি বেতনটা সে যদি অবিনাশের হাতে দেয়, একটু তিনি ক্ষুণ্ন হইবেন। টাকার পরিমাণের জন্য নয়, তার দরকার আছে জানিলে সব টাকাই অনায়াসে ফিরাইয়া দিবেন; সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথমে তার টাকাগুলি তাঁর হাতে তুলিয়া দেওয়া চাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই ধরনের তুচ্ছ খুঁতগুলি চিরদিন ত্রিষ্টুপকে পীড়া দেয়।[১]

এমনই হিসেব অবিনাশের সংসারে। একটি পয়সাও অবিনাশের হিসেবের বাইরে যাওয়ার সুযোগ কম। আর্থিক টানাপড়েনের সংসারে সঞ্চয়ও নেই তেমন। বাবার অফিসের এই কেরানিগিরিই ত্রিষ্টুপের একমাত্র অবলম্বন। ধার-দেনা এই পরিবারের নিত্যসঙ্গী। তদুপরি প্রভা ও রমেশের দাম্পত্যসম্পর্ক, রমেশের অনৈতিক জীবনযাপনপ্রভৃতিও এই সংসারের পীড়ার কারণ। এসবের প্রভাব পড়েছে ত্রিষ্টুপের জীবনে। সে মনোজাগতিক সুস্থতা ও দৃঢ়তা নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সন্দেহ-সংশয়ের দোলাচলে সে ভুগেছে অহরহ। কুন্তলার সঙ্গে তার সম্পর্কের একপর্যায়ে সে তাই কুন্তলার আচরণকে সন্দেহের দৃষ্টিতে অবলোকন করেছে –

> তাকে পিঠা খাওয়ানোর জন্য কুন্তলা তার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে; হয়তো পরনের ছেঁড়া ময়লা শাড়িখানি বদলাইয়া একখানি ফরসা শাড়ি পরিয়াছে – সস্তা সাধারণ শাড়ি, পাছে সে মনে করে যে তার জন্যই সাজগোজ। একবার ত্রিষ্টুপের মনে হইল, পিঠা খাওয়ার নিমন্ত্রণটা রাখিয়া আসে। একেবারে যাওয়া বন্ধ না করিয়া ধীরে ধীরে যাওয়াটা কমাইয়া আনাই কি ভালো নয়? দুদিন যায় নাই, আজ যখন ক্ষিতীশ ডাকিতে আসিয়াছে, আজ একবার গেলে কী আসিয়া যাইবে? আবার চার পাঁচ দিন একেবারে না গেলেই চলিবে। তারপর ত্রিষ্টুপ ভাবিল, না, আজ না যাওয়াই ভালো।[২]

আদায়ের ইতিহাসে মণীশ চরিত্রটি ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। তিনি আদর্শনিষ্ঠ রাজনীতিক। তাঁর সঙ্গে ত্রিষ্টুপের সম্পর্ক শ্রদ্ধা ও স্নেহের। মণীশ ভেবেছিলেন, ত্রিষ্টুপ ভালো ছেলে; হয়তো একদিন তাঁর আদর্শ গ্রহণ করবে। বোন কুন্তলার সঙ্গে ত্রিষ্টুপের সম্পর্কেও তাই তিনি আপত্তি করেননি। তাঁর বিশ্বাস, ত্রিষ্টুপ কখনো কুন্তলার ক্ষতি

---

১. *আদায়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

২. *আদায়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৭

করবে না। কুন্তলার মনেও ত্রিষ্টুপকে ঘিরে একধরনের দুর্বলতা তৈরি হয়। কিন্তু দাদার আদর্শ তাকে সংযত ও সংযমী হতে শিখিয়েছে। এমন কি ত্রিষ্টুপের সঙ্গে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে গিয়েও সে নিজ আবেগকে আয়ত্তে রাখতে পেরেছে। কুন্তলার ব্যক্তিত্বের কাছে অবশেষে ত্রিষ্টুপের দেহমুখী বাসনা হার মানে। সে তার অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য অনুতাপ বোধ করে, এবং বলে :

> আমাকে ক্ষমা করো। জীবনে অনেক কিছু আদায় করব ছকেছিলাম, তার মধ্যে প্রথম ছিলে তুমি। প্রথমটাতেই ব্যর্থ হব? – ভাবলেই মনে হচ্ছিল সমস্ত জীবনটাই তা হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর কোন উপায় ছিল না, তাই এই খাপছাড়া উপায়টা দিয়ে চরম চেষ্টা করব ভেবেছিলাম।[১]

তার সঙ্গে মণীশ এবং তাঁর বোন কুন্তলার আন্তরিক মেলামেশাকে ত্রিষ্টুপ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছে। এই সম্পর্কের মূল্যায়ন সে ঠিকঠাকভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সন্দেহ ও ব্যর্থতার মূলে রয়েছে তার পরিবার-পরিপ্রেক্ষিত ও জীবনযাপনপ্রণালী। মণীশ তার বোন কুন্তলাকে দিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলতে পারে, এ আশঙ্কায় সে তাড়িত হয়েছে; যদিও চেতনমনে সে জানে, মণীশ ওরকম নয়।

কুন্তলাকে নিয়ে ত্রিষ্টুপ যখন দ্বিধাদ্বন্দ্বময়, তখন কুন্তলাই তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এতে অপমানিত হয়ে ত্রিষ্টুপ কুন্তলার চরিত্রহননের সংকল্প করে। সে মনে করে, এরপর মণীশ বাধ্য হয়ে বোনকে তার কাছে সমর্পণ করবে। কিন্তু কুন্তলার বুদ্ধিমত্তার কাছে ত্রিষ্টুপ হার মানে। কুন্তলা মনেপ্রাণে ত্রিষ্টুপকে শুধু গ্রহণের প্রতিশ্রুতিই দেয় না বরং তার জীবনও বদলে দিতে চায়। উপন্যাসে কোথাও কুন্তলার রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতা নেই। তবে কুন্তলা-ত্রিষ্টুপের কথোপকথনে এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায় :

> আপনি ঠিক করেছেন বড়ো হবেন। টাকাপয়সা, মানসম্ভ্রম, এসব নিয়ে যারা বড়ো হয়, দাদার কাছে তাদের কোনো দাম নেই। আপনি একগুঁয়ে মানুষ, যা ধরবেন তা ছাড়বেন না। একদিন মস্ত লোক হবেন, মোটর হাঁকাবেন, দেশ জুড়ে খ্যাতি লাভ করবেন – এই আপনার প্রতিজ্ঞা। আপনার সঙ্গে আমার কখনো বিয়ে হয়? কেন?
>
> আমাদের ছক আলাদা। আমরা অন্য প্রতিজ্ঞা করেছি – জীবন দিয়ে কী আদায় করবো।
>
> কী আদায় করবে?
>
> স্বাধীনতা। ...
>
> কুন্তলা ব্যগ্রভাবে বলিল, বুঝতে পারেছেন আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে কেন অসম্ভব? আপনি যা চান, সেসব য়ারা আদায় করেছে, তারা হল এক জাত: আর তাদের পায়ের নিচে যারা চ্যাপ্টা হয়ে মরছে, তারা হল আর জাত। আমরা ওই জাতের। বেজাতের হাতে দাদা কখনো বোনকে দিতে পারে?[১]

---

১. *আদায়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৭

কুন্তলার এই বক্তব্যে মার্কসীয় শ্রেণিচেতনার দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট। তিনি 'বুর্জোয়া, 'প্রলিতারিয়েত', কিংবা 'শাসক; ও 'শোষিত' এ-সব শব্দ ব্যবহার না করেও মণীশ ও তার বোনের রাজনৈতিক আদর্শকে অনেকটাই স্পষ্ট মাত্রা দিয়েছেন। তাদের একমাত্রা আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা নামক অমৃতের স্বাদ-অর্জন; গণমুক্তি।

ত্রিষ্টুপের উচ্চাভিলাষ, একগুঁয়েমি ও অপরিণামদর্শী আচরণ কুন্তলার ভালো লাগেনি। তাই সে ত্রিষ্টুপকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। কারণ কুন্তলার কাছে দাদার আদর্শই বড়। তবে ত্রিষ্টুপের জীবনগঠনের জন্যও সে সোচ্চার। উপন্যাসের পরিশেষে ত্রিষ্টুপের পরিবর্তিত জীবনাগ্রহ উপস্থাপনসূত্রে মানিক তা উপস্থাপন করেছেন। ত্রিষ্টুপ-কুন্তলার কথোপকথন প্রসঙ্গে তা অনুধাবনীয় :

> তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব কুন্তী। আমার প্রথম আদায় ফসকে গেল, ছকটাও ওলটপালট হয়ে গেল। আমি যদি নতুন ছক কাটি, যদি তোমাদের জাতে উঠতে চাই। মণিদা রাজি হবেন?
>
> নিশ্চয়। কিন্তু মত বদলানো বড়ো কঠিন।
>
> সে আমি বুঝব। তুমি রাজি হবে?
>
> দাদা রাজি হলে –
>
> ত্রিষ্টুপ অসহিষ্ণুর মতো বাধা দিয়া বলিল, তোমার নিজের কথা বলো। মনে করো তোমার আর আমার জীবনের আদর্শের একচুল তফাত রইল না। তখন যদি মণিদাকে বলার আগে তোমাকে বলি, মণিদাকে জিজ্ঞেস না করেই তুমি তোমার মত জানাবে?
>
> কুন্তলা বলিতে গেল, ওসব যদি-টদির কথা –
>
> ত্রিষ্টুপ প্রায় ধমক দিয়া বলিল, যদির কথাই বলো। রাজি হবে?
>
> হব।[২]

মানিক এ উপন্যাসে জীবন সম্পর্কে ব্যতিক্রমী চিন্তা-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এ উপন্যাসে অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়েছেন। মনীশ এই জীবনবোধের ধারক এবং সে তার দুই বোন রমলা ও কুন্তলার মধ্যে এই জীবনাদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন। কুন্তলাকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশের মধ্য দিয়ে ত্রিষ্টুপ এই জীবনাদর্শের প্রতি তার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে; এবং কুন্তলার সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। '*আদায়ের ইতিহাস* উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে দ্ব্যর্থবোধকতার একটি

---

১. *আদায়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

২. *আদায়ের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

ব্যঞ্জনা আছে। উপন্যাসের শেষে যুবক ত্রিষ্টুপ কুন্তলার কাছ থেকে আদায় করেছে তার সঙ্গে বিয়ের প্রতিশ্রুতি। বিনিময়ে কুন্তলা আদায় করেছে ত্রিষ্টুপের কাছ থেকে তার মনোভঙ্গি পরিবর্তনের অঙ্গীকার।'[১]

পেশা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পেশা* (১৯৫১)[২] উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ভারতবিভাগের প্রাক-পর্যায়ের পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বনে। উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে কলকাতা শহরের কেদার নামের এক ডাক্তারকে কেন্দ্র করে। কেদার ডাক্তার অত্যন্ত সহজ সরল; নিজের পরিবারে সে যেমন সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তিময় পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তেমনি তার সম্প্রীতি রয়েছে প্রতিবেশীদের সঙ্গেও। সে অত্যন্ত আদর্শবান ব্যক্তিত্ব এবং পেশার প্রতি একান্তই নিবিদিতপ্রাণ। জনৈক সমালোচকের মতে :

> সে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়, তবে লেখকের রাজনৈতিক চৈতন্যের সৃষ্টি। বলব না খুব উঁচুমাপের, কিন্তু প্রাণবন্ত ও বিশ্বাস্য, একবারও বানিয়ে-তোলা মনে হয়না।[৩]

সমকালের আর্থ-সামাজিক বিরূপতা কিংবা বিনষ্টি কেদারকে স্পর্শ করতে পারেনি। কোনো প্রকার শঠতা-প্রবঞ্চনা তাকে প্রভাবিত করেনি। এতৎসত্ত্বেও একদিন ধনী ব্যবসায়ী ত্রৈলোক্য মজুমদার ভেজাল ঔষধ কারবারের জন্য তাকে প্রস্তাব দেয়, এবং বলে :

> অন্ধকে আলো দান করা পেশাদার ধর্মপ্রচারকের কাজ, বিলাতি ওষুধের মতো দামি ওষুধ কেনবার কি ক্ষমতা আছে এদেশের লোকের? আমি কী ভাবি নি ওদিকটা, দেশের জন্য এত করছি, এত ভাবছি! যা হবার নয় সে স্বপ্ন দেখে লাভ কী? যখন সেদিন আসবে, খাঁটি স্বাধীনতা আমরা পাব,...লোকের যখন ক্ষমতা হবে যেমন রোগ তার উপযুক্ত ওষুধ কিনবার, চিকিৎসা করাবার, তখন কি আর সাধারণ চলনসই ওষুধ বাজারে ছাড়ব, না তার দরকার হবে, না লোকে তা কিনবে?[৪]

কিন্তু এ প্রস্তাব কেদার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে –

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনিশতম উপন্যাস পেশা। এটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ সনে (১৯৫১) এর প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি 'নতুন জীবন' নামক মাসিক পত্রিকায় ১৩৫২-এর কার্তিক সংখ্যা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল।

৩. ক্ষেত্রগুপ্ত, *ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৪. *পেশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯

> স্রেফ জুয়াচুরি। আপনার কথামতো যেমন এত বেশি রোগ আর চিকিৎসার অভাব কোনো দেশে নেই, তেমনি বোধহয় পেটেন্ট ওষুধের এমন জুয়াচুরির ব্যবসাও কোনো দেশে এত বেশি চলে না – এমন খোলাখুলিভাবে। বিজ্ঞাপনে ভুলিয়ে মানুষ মেরে আপনি টাকা রোজগার করতে চান, এটা জুয়াচুরি নয়? আপনাদের মতো যারা এ কাজ চালাচ্ছে ধরে ধরে তাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত![১]

এক নির্মম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেই কেদারকে ডাক্তারি পাশ করতে হয়েছে। যেদিন সে ডাক্তার হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে সেদিনই মারা যায় তার মা। গীতার কাছে তার অকপট স্বীকারোক্তি – 'আমি এদিকে ডাক্তার হচ্ছি, আমাকে ডাক্তার করার জন্য মা ওদিকে মরছে। আমাকে ডাক্তার করার খরচ জোগাতে বাড়ির লোকের অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে, মাকে মরতে হয়েছে। আমি যেদিন ডাক্তার হলাম, মা সেইদিন মরল।'[২] এই চেতনা থেকেই কেদার মানবসেবায় নিয়োজিত হয়। ছাত্রাবস্থায় তার মধ্যে ছিল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুর্বার তাড়না। তার প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা র ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন বিদেশি ডিগ্রিধারী ডাক্তার পালের কন্যা। কিন্তু ডাক্তারি পেশা শুরু করার পর এদেশের দরিদ্র মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে উচ্চ ডিগ্রিলাভের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে মানবসেবাকেই সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র গীতা। সে হর্ষ ডাক্তারের কন্যা। গীতা ভাবে – কেদার বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে তার পিতার চেয়েও বড়ো ডাক্তার হবে। কেদারের সংগ্রামশীল জীবনকেই সে পছন্দ করে –

> গীতা সরলভাবেই বলেছিল, তাদের স্তরের বড়োলোক অ্যারিস্টোক্র্যাট ছেলেদের বিরুদ্ধে তার কোনো নালিশ নেই, ওই স্তরে মনুষ্যত্বের অভাব ঘটেছে বলেও সে মনে করে না, মোটেই তার দম আটকে আসে না ওই সমাজে মেলামেশা করতে। তবে কিনা ওই সব ছেলেদের জীবনে কোনো লড়াই নেই। বড়ো হবার সবরকম সুবিধা সামনে ধরাই আছে, গ্রহণ করলেই হল। লড়াই করে জীবনে বড়ো হবার প্রয়োজন ওদের নেই। কেদার বড়ো হতে চায়, জীবনে উন্নতি করতে চায়। রীতিমতো যুদ্ধ না করে সফল হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, যতকিছু সুযোগ সুবিধা দরকার সব তাকে নিজে সৃষ্টি করে নিতে হবে। সামনে তার সোজা পথ খোলা নেই, তাকে উঠতে হবে নিজের জোরে নিজে পথ করে নিয়ে। তার বাবা ডাক্তার পালকে যেভাবে উঠতে হয়েছে, এই যুদ্ধটা গীতা ভালোবাসে। তাই সে পছন্দ করে কেদারকে।[৩]

তবে গীতা স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করতে আগ্রহী নয়। তার এ উদার দৃষ্টিভঙ্গি কেদারকেও মুগ্ধ করে। আবার কেদারের অবহেলায় রোগীর মৃত্যুকে গীতা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না – 'রোগীর মরণে মনমরা

---

১. *পেশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০

২. *পেশা*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসসমগ্র তৃতীয় খণ্ড, সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪

৩. *পেশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬

কেদারকে কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রায় অপদার্থ ভণ্ডের মতো ঘৃণা করে গীতা। তীক্ষ্ণ সুরে ধমক দিয়ে বলে কী বলছ তুমি পাগলের মতো?[১]

জ্যোতি এ উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র। বাইশ বছর বয়সী জ্যোতি কবিরাজি পেশায় নিয়োজিত পরিমলকে ভালোবাসে। কিন্তু পরিমলের সঙ্গে তার মেলামেশায় পিতা হর্ষ ডাক্তারসহ পরিবারের অন্যরা ক্ষুব্ধ হয়। সে পরিমলকে যোগ্য করে তুলতে চায় এবং এজন্য কেদারের সহযোগিতা কামনা করে। জ্যোতি বলে–

> কেউ কিছু করবে না আমার জন্যে। এতটুকু উপকার করার বদলে শুধু ক্ষতি করবে আর বাদ সাধবে। আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেলেও কারও এতটুকু মাথাব্যথা নেই। সব করতে হবে আমাকেই। তবু তোমরা চাও যে আমি মুখচোরা লাজুক মেয়েটি সেজে থাকি। তাই থাকতেই আমি চাই। ...কথা দাও সব ঠিক করে দেবে, তারপর এতটুকু বেহায়াপনা যদি দ্যাখো আমার, আমায় তুমি চাবুক মেরো।[২]

উপন্যাসে পরিমল সবসময় শান্ত এবং সংযত স্বভাবের মানুষ – 'কেদারের কাছ থেকে সিগারেটে দু–একটা টান দিতে শিখেছিল, কিছুকাল পরে তাও বর্জন করে দেয়। কোনোরকম অনিয়ম বা উচ্ছৃঙ্খলতাকে সে কখনো প্রশ্রয় দেয় নি। আচার নিষ্ঠার শুচিবাই তার ছিলনা বটে তবে জীবনকে শুদ্ধ ও পবিত্র করার আনুষ্ঠানিক দিকটার উপর ঝোঁক তার বরাবরই ছিল।'[৩] একারণে সে মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয় এবং প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যোগাসনে বসে।

জ্যোতির দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস এবং কৌশলের কারণে পরিমলের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পরই জ্যোতি পরিমলের আসল রূপ দেখতে পায়। পরিমলের পাশাপাশি তার শাশুড়ির আচরণেও সে কষ্ট পায়। সন্তানসম্ভবা জ্যোতি চরম অসুস্থতায় পিতার বাড়িতে যেতে না চাইলেও হাসপাতালের পরিবর্তে সে যেতে চায় পিতৃগৃহেই। এ ঘটনায় কেদার বুঝতে পারে – 'জ্যোতির জিদ অনেক লড়াই করে বাজি জিতবার অহংকার আঁকড়ে থাকা থেকে আসেনি। এই একরোখামি আর কিছু নয়, সে তার প্রেমের ব্যর্থতাকে অস্বীকার করতে চায়। তার প্রেম আর পুরোনো জীবন-ধারায় বিশ্বাস একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে, এই বিশ্বাস ছাড়া আর কোন অবলম্বন নেই। এ বিশ্বাসকে মর্যাদা না দিলে তার প্রেমের মান বাঁচে না, এ বিশ্বাসকে অভ্রান্ত বলে আঁকড়ে

---

১. *পেশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

২. *পেশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩

৩. *পেশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

না থাকলে প্রেমও একটা ভুল হয়ে দাঁড়ায়।'[১] অবশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উপন্যাসে জ্যোতি প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটেছে।

কেদারের ছোটবোন অমলা। দারিদ্র্যের কারণে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। অথচ একই পরিবারের সন্তান কেদার ডাক্তারি পাশ করেছে। 'অমলার পড়া কেন বন্ধ হয়েছিল অঞ্জলি জানে। আজ এতদিন পরে পুরোনোকালের বান্ধবীর কাছাকাছি এসে সে টের পায়, শুধু পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যই অমলা কোথায় ঠেকে গেছে, কতখানি ব্যবধান গড়ে উঠেছে তাদের দুজনের মধ্যে।'[২] মানিক এখানে নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

পেশা উপন্যাসে আরো কয়েকটি অসহায় নারী-পুরুষচরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে। এদের মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রী ছায়া কানের ব্যথার যন্ত্রণা ভোগ করলেও পরিবারের কাছ থেকে সহানুভূতি পায়নি। উপন্যাসে কিশোরী বুনু মেধাবী হলেও অভাবের কারণে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। মেধাবী অনাদী সেন বিজ্ঞান গবেষণায় আগ্রহী হলেও যোগ দেয় সরকারি চাকুরিতে।

মানিক এ উপন্যাসে পশ্চাৎপদ সমাজের কুসংস্কারের চিত্র তুলে ধরেছেন। উপনাসে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কীভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও অর্থাভাবের অভাবের সুযোগ নিয়েছে বিত্তবানশ্রেণি, তাও প্রদর্শিত হয়েছে।। এ উপন্যাসে মানিক উপলব্ধি করেছেন দেশের উন্নতি সাধন করতে হলে সমাজের পাশাপাশি ব্যক্তিমনের রূপান্তর সাধন জরুরি। বিভিন্ন চরিত্রের মানসগঠনের মধ্য দিয়ে তিনি এ সত্যকেই উন্মোচন করেছেন। সর্বোপরি উপনিবেশিত সমাজে লোভ-প্রলোভনের দাসত্ব না করে সাধারণ মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে কেদার ডাক্তার কীভাবে তার পেশার প্রতি নিবেদিতচিত্ত থেকেছে তা উপস্থাপিত হয়েছে।

ছন্দপতন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ছন্দপতন* (১৯৫১)[৩] উপন্যাসটি আত্মকথনের রীতিতে রচিত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নবনাথ রায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। কাব্য বা সাহিত্যরচনায় একজন কবির

---

১. *পেশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪

২. *পেশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯

৩. "ছন্দপতন' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশের তারিখ অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫১)। প্রকাশক, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড। ... মানিক প্রথমে এই গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'কবির জবানবন্দী', পরে নাম বদলে দিলেন 'ছন্দপতন'।" (দ্রষ্টব্য : সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬)

আদর্শ কী হওয়া উচিত তা উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন মানিক। বক্তব্য ও আঙ্গিক বিবেচনায় স্পষ্ট যে, 'লেখক ছন্দপতন উপন্যাসে যেন তার পরবর্তী সাহিত্যজীবনের স্বরূপটিকে প্রকাশ করেছেন। এই উপন্যাসের নায়ক কবি নবনাথ রায় যেন স্বয়ং লেখক । তার আত্মকথনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসে উত্তরণই এই উপন্যাসের উপজীব্য।'[১]

পঁচিশ বছর বয়সী কবি নবনাথ রায় জীবনবাদী। কবিতায় সে জীবনের কথা বলেন। তরুণ কবিদের প্রচারাকাঙ্ক্ষাকে সে সমর্থন করে। তার মতে,

> প্রত্যেক কবিই প্রচার চায় – নইলে কবিতা লেখার কোনো মানে হয় না।
> নীরব কবিরাই জগতের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে হাস্যাস্পদ।[২]

উপন্যাসের শুরু হয়েছে একটি সভামঞ্চে তরুণ কবি নবনাথের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। যদিও কথা ছিল নবনাথ আবৃত্তি করবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, তবুও সে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির অনুমতি নেয় এবং পাঠ করে 'প্রতিকার চাই' কবিতা। আবৃত্তি শেষ হলে উপস্থিত শ্রোতারা হাততালি দেয়; মুগ্ধতা প্রকাশ করে। একমাত্র মানসীই আনন্দের পরিবর্তে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করে। কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার পরিবর্তে অনুষ্ঠানে নামহীন-খ্যাতিহীন নবনাথের কবিতা আবৃত্তির বিষয়টি কিছুতেই শোভন সুন্দর নয়। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথকেই অপমান করা হয়। মানসীর এই যুক্তি নবনাথ মানতে পারে না। তার মতে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার পরিবর্তে নিজের কবিতা পাঠ করে সে নিজের কবিসত্তাকে বরং নতুন করে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে আসছে, এখনও করছে, পরেও করবে; কিন্তু তার কবিতা সে আবৃত্তি না করলে কে করবে! মনের এই দৃঢ়তা নিয়ে সে মঞ্চে তাই নিজের কবিতাই আবৃত্তি করেছে, এবং শ্রোতা-দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে সে উপলব্ধি করেছে এতদিনে তার কবিতা লেখা সার্থক হয়েছে। সে নিজের মধ্যে দৃঢ়তা অনুভব করে, নিজেকে কবি হিসেবে সার্থক ভাবতে শুরু করে। নিজের সাহিত্যিকসত্তার ওপর নবনাথের এই যে আস্থা তা মানিকের মধ্যেও বরাবর জাগরুক ছিল :

> মানিকের জীবনে একটা প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অদ্ভুত দৃঢ়তা। নবনাথকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বললে সে অনায়াসে দৃপ্ত ভঙ্গিতে নিজের কবিতাই আবৃত্তি করে শোনায়, তার স্বকীয়তা প্রচার করে।

---

১. নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

২. ছন্দপতন, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮

মানিকও বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক দৃঢ়তা নিয়ে উপস্থিত। নবনাথের মতো তিনিও বলতে পারেন, 'আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন রূপায়িত করছি আমার কবিতায়।[১]

সভামঞ্চে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ না করার অর্থ এই নয় যে, নবনাথ নিজেকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়ো কবি মনে করে! তার মতে, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি; অনেক বড়ো কবি। তিনিই বাংলা সাহিত্যের গর্বিত উত্তরাধিকার। স্বয়ং নবনাথের কবিতা রচনার সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আত্মভাষ্য :

> আমার কবিতা লেখার প্রেরণার বড়ো উৎস রবীন্দ্রনাথ ... এটা শুধু আমার বেলা নয়, সবরকমের সব কবির বেলাই সত্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা লেখার প্রেরণা পাইনি – এ কথা বলা যে-কোনো কবির পক্ষে চ্যাংড়ামি।
>
> এ কথা বলার অর্থ আমি বাংলাদেশে জন্মাই নি, বাংলার জলমাটিতে বাঙালি সমাজের খাদ্য খেয়ে শিক্ষা পেয়ে মানুষ হইনি – আমি স্বয়ম্ভূ অথবা আমি পরগাছা।
>
> পরগাছার বিস্তার নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য রস সব গাছের কোষে। পরগাছাকেও সেই মেশাল রস টেনে পুষ্ট হতে হবে।
>
> রবীন্দ্রনাথের একেবারে বিপরীত খাতে সম্পূর্ণ অমিল ধারার কাব্য সৃষ্টি আলাদা কথা। সে অধিকার সবার আছে, আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন রূপায়িত করছি আমার কবিতায়। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য কবিতা লেখার প্রেরণা জোগায় নি একথা বলার সাধ্য আমার নেই – অন্য কারো আছে আমি বিশ্বাস করি না।[২]

নবনাথ মনে করে, রবীন্দ্রনাথকে স্বীকরণ করে কাব্যসৃষ্টি অন্যায় নয়; প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক কালে সব প্রতিষ্ঠিত কবি পূর্বসূরিদের কাছ থেকে অবলীলায় ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে অনেক উগ্র মার্কসবাদী লেখক-সাহিত্যিক-সমালোচক যখন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মকে বাতিল করে দিতে চেয়েছেন সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, রবীন্দ্র-পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের প্রধান প্রেরণা-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে প্রেরণাসঞ্চারী।

নবনাথ জানে শুধু বন্ধুমহলে তার কবিতার সমাদর হলে চলবে না। তার কাব্যভাবনাকে ব্যাপক মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। এজন্য সে বিড়ি শ্রমিকদের কাছে, নিচুতলার চানাচুর বিক্রেতার কাছেও কবিতা পরিবেশন করে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আসে না। তারা নবনাথের কবিতার মধ্যে নিজেদের

---

১. সরোজমোহন মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

২. *ছন্দপতন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০

প্রত্যক্ষ করে না। কারণ সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে কবি-জীবনের যোগ না থাকলে কবির সৃষ্টির মধ্যে থেকে যায় ফাঁক ও ফাঁকি। তৃপ্তিকে উদ্দেশ্য করে নবনাথ তাই বলে :

> কবি পৃথিবীর ভালবাসা চায়, খাঁটি বাস্তব ভালবাসা। ...একমুখী ঝোঁকটাই ভালবাসা নয়। একমুখী ঝোঁক নিয়ে বুক ফেটে মরে গেলেও কবি দু-লাইন কবিতা লিখতে পারে না – বাস্তব জীবন যেমন অনেক কিছু মিলিয়ে, ঝোঁকটাও তেমনই সর্বাঙ্গীণ হওয়া চাই, সম্পূর্ণ হওয়া চাই। ভালবাসাও তেমনি। ভালবাসা স্বপ্ন, ভালবাসা রক্তমাংসের শরীর, ভালবাসা দশজনের সঙ্গে মেলানো জীবন, ভালবাসা রাগ ভয় ভক্তি ঘৃণা হিংসা মমতা সবকিছু দিয়ে গড়া।[১]

সাধারণ মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসায় জাগ্রত না হলে তাদের উপলক্ষ করে রচিত কবিতা কখনোই তাদের আগ্রহী বা আন্দোলিত করতে সক্ষম হবে না। তাই তাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের অনুভবগম্য ভাষায় কবিতা রচনা করতে হবে। এই বিশেষ গুণ অর্জন করতে হবে একজন কবিকে; যাকে নবনাথ 'প্রতিভা' বলে শনাক্ত করেছে। রমা ও তমালের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে সে বিষয়টি স্পষ্ট করেছে এভাবে :

> আমি বলি, যে লাইনে যে বিশেষজ্ঞ তার বিশেষ গুণকেই প্রতিভা বলে। কিন্তু প্রতিভা সম্পর্কে মানুষের অনেক ভুল ধারণা আছে। প্রতিভা কোনো আকাশ থেকে পড়া গুণ কিংবা ছাঁকা কোনো গুণ নয়। অনেক কিছু জড়িয়ে এই গুণ – কোনো বিষয়ে সাধনা করার বিশেষ ক্ষমতা আর আগ্রহই আসল কথা। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভা আসলে এক – দুজনের মধ্যে তফাত শুধু ঝোঁকের। মনের গড়ন, পরিবেশ, সুযোগ সুবিধা অনেক কিছু মিলে ঝোঁকটা ঠিক করে।[২]

কবিতার জন্য এই গুণটা জরুরি। প্রতিভা অর্জনের জন্যে মন ও পরিবেশের অনুকূল সমন্বয় প্রয়োজন। এই সমন্বয়বোধের অভাবেই কবিতা সার্থক হয় না, মানুষের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন তৈরি করে না। মানসীকে উদ্দেশ্য করে নবনাথ তাই বলে :

> তোমায় তো আগেই বলেছি যে ভাষা খুঁজছি – বাস্তব জীবনের প্রাণের ভাষা। আমার ভাব নতুন, নতুন যুগের নতুন সত্যকে আমি জেনেছি – কিন্তু কবিতায় কোন ভাষায় ঢেলে সাজব? ভাব রাখতে গেলে কবিতা হয় না – যেন একটা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার তৈরি করেছি। কবিতা করতে গেলে ভাব থাকে না– যেন কাব্যবোধের ঐতিহ্যটুকু শুধু গুলে দিয়েছি। আমার না হয় বস্তুবাদী জীবনদর্শন – অন্য জীবনদর্শনও তো কম কঠিন বা কম জটিল নয়। কিন্তু কবিতার তাতে এসে যায় নি। ঈশ্বরবাদ, মায়াবাদ, ভক্তিবাদ, রহস্যবাদ – এসব বাদ

---

১. *ছন্দপতন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪

২. *ছন্দপতন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭

না দিয়েও কত শ-বছর ধরে জগতে কত কবিতা লেখা হয়েছে। নিজস্ব ভাবও বজায় আছে, কবিতাও হয়েছে। আমার একটা বিশেষ বাদ আছে বলে আমার কবিতায় এ সমন্বয় হয় না কেন? এই খেইটা খুঁজছি।[১]

এই 'খেই' কবিতার জন্য যেমন, ঠিক তেমনি জীবনের জন্যও জরুরি। এই খেই নেই বলেই সে যেমন কবিরূপে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি মালতী, রমা, তৃপ্তি কাউকেই জীবনের সঙ্গে লগ্ন করতে পারেনি। এদের কেউই তার প্রতি হার্দ্য অনুভবে জেগে ওঠেনি। সে এতদিন যন্ত্রবৎ জীবনযাপন করেছে।

উপন্যাসে তৃপ্তি অল্পশিক্ষিত, অসচ্ছল পরিবারের মেয়ে। নবনাথের আত্মসংকট প্রথম আবিষ্কার করে এই তৃপ্তিই। অদম্য বিদ্রোহের শক্তি ছিল তার ভালোবাসায়। একারণে নবনাথের মনের বিকারগ্রস্ততা দূর করতে সে নিরন্তর চেষ্টা করে। কিন্তু নবনাথের নিস্পৃহতা কিংবা নিরাসক্তি প্রত্যক্ষ করে একপর্যায়ে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় সে বলে :

আমরা সাদাসিধে সাধারণ মেয়ে। ভালবাসাটা তোমার আসেই না – ভালবাসার ক্ষমতাই আসলে তোমার নেই। না ভালবাস মানুষকে, না দেশকে, না তোমার কতিাকে। কোনো কিছুকে নয়। পারলে তো ভালবাসবে? তুমি হলে একটা সূক্ষ্ম যন্ত্র।[২]

তৃপ্তির বক্তব্যে নবনাথ আত্মসম্বিৎ ফিরে পায়। সে উপলব্ধি করে :

ভালবাসি না? ভালবাসতে জানি না? তৃপ্তিকে বা মানসীকে ভালবাসার কথা নয় – মানুষকে ভালবাসি না, ভালবাসতে জানি না? কবিতাকে পর্যন্ত নয়? আমার যে ভালবাসা সেটা যান্ত্রিক?

তৃপ্তির কাছে শেষে হারানো খেই পেলাম – যার সন্ধানে পাগল হয়ে উঠেছি! ভালবাসা ছাড়া শ্রদ্ধা নেই – শ্রদ্ধা ভালবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না। শ্রদ্ধায় ভালবাসায় মানুষের আপন না হয়ে কী করে জানব সেই প্রাণের ভাষা – যে ভাষা ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।[৩]

জীবন ও শিল্পের যোগ যে কতোবেশি অঙ্গাঙ্গী তা নবনাথের এই বক্তব্যসূত্রে অনুধাবন করা যায়। *ছন্দপতন* উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের প্রতি, তথা মানুষের প্রতি শিল্পীর দায়বোধসম্পর্কিত তাঁর বিশ্বাসের কথাই অসাধারণ ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছেন।

---

১. *ছন্দপতন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১

২. *ছন্দপতন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৪

৩. *ছন্দপতন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৪

পাশাপাশি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পাশাপাশি* (১৯৫২)[১] উপন্যাসটি সুনীল নামে এক যুবকের জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত। মা-বাবা, ভাই-বোনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সে তার সমস্ত আরাম-আয়েশ, স্বপ্ন-সাধ বিসর্জন দিয়েছে; হতে হয়েছে নিয়মনিষ্ঠ, দায়িত্ববান। রোমান্টিক স্বপ্নবিলাস ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে সে বাস্তবতাকে বড়ো করে দেখেছে; পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছে এবং কৃচ্ছ্রসাধনা করেছে। তার এই নিয়মনিষ্ঠ জীবনবোধের কারণে অনেকেই তাকে অবমূল্যায়ন করেছে: পরিবারের লোকজনও তাকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর বলে চিহ্নিত করেছে। উপন্যাসের শুরুতে মানিক তার জীবনযাপন প্রসঙ্গে বলেছেন :

> লোকে বলে, রসকষ নেই, ভোঁতা মানুষ।
> বাড়ির লোক আরো বাড়িয়ে বলে, দয়ামায়া নেই, হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মানুষ।
> কেনই বা বলবে না লোকে, ঘরের এবং বাহিরের।
> বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে, স্বাস্থ্য ভালো, চেহারা ভালো, চাকরি করে ছাঁকা তিনশ টাকা মোটা বেতনের। ঘরে ঘরে যখন বেকার, তখন তার এমন চাকরি! এরকম একটা চাকরি বাগিয়ে কত কিছু করার প্ল্যান আঁটে জোয়ান ছেলেরা, স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে! চাকরি বাগিয়েও সে কিছুই চায়না। অথচ একটা অদ্ভুত নিরুত্তেজ যান্ত্রিক জীবন-যাপন করে চলেছে। তার যেন কোন শখ নেই আবেগ নেই উত্তাপ নেই।
> বউ চায় না, নেশা করে না, সিনেমা দেখে না, জুয়া খেলে না। মেয়েদের সাথে মেলামেশা, বন্ধুর সাথে মজার কথা রসের কথা কেচ্ছার কথা, কোনো কিছুতে রুচি নেই। কাউকে স্নেহমায়া দেয়ও না, নিজের জন্য চায়ও না।...
> রাত্রে দিব্যি ঘুমায়। পেট ভরে খায়। সংসারের খুঁটিনাটি সব বিষয়ে নজর রাখে।
> কঠোর নিয়মে সংসার চালায়।...
> নিয়মমতো আপিস করে, সন্ধ্যার পর বাড়তি খেটে বাড়তি রোজগার করে, বই পড়ে, কাগজ পড়ে। কিন্তু জীবনটা রসালো করার জন্য, জীবনে রঙ ও বৈচিত্র্য আনার জন্য কিছুই করে না। ...
> বিয়ের কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেয়।[২]

সুনীল সময়সচেতন, কর্মদক্ষ ও দায়িত্ববান। পরিবারের দায়িত্ব সুচারুভাবে নির্বাহের প্রয়োজনে সে চাকরির বাইরে অতিরিক্ত আয়ের জন্য টিউশনি করে। শুধু ইংরেজি সাহিত্য নয়, ছাত্রজীবনে সে টেকনিক্যাল বিদ্যাও

---

১. পাশাপাশি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেইশতম উপন্যাস। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর (মহালয়া ১৩৫৯)। এর প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। "প্রথমে মানিক এই গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন 'হৃদয়হীন'।" (সূত্র : সরোজমোহন মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২)

২. *পাশাপাশি*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস সমগ্র*, অবসর, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ৩

রপ্ত করেছে। সেইসূত্রে সে অঘোরের কোম্পানিতে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। অঘোর কোম্পানির স্বত্বাধিকারী হলেও তাকে সে ভয় বা সমীহ করে না; অপ্রয়োজনে সৌজন্যবোধও প্রদর্শন করে না। বরং দক্ষতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সে কোম্পানিতে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

মায়া, নন্দা, বিভা, রেবা, নবীন অঘোর প্রভৃতি চরিত্রের সংসর্গে-সাহচর্যে মানিক সুনীল চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন। মায়ার সঙ্গে সুনীলের সম্পর্ক ছিল আন্তরিক ও মধুর। সুনীলের মতোই সে তার পুরনা সংসারের দায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। সে নিজের বাড়িতে একটা শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং স্কুল পরিচালনা করে। তার মধ্যে অতিরিক্ত কোনো ভাবপ্রবণতা নেই। যে- কোনো বিষয়ে সুনীলের সঙ্গে পরামর্শ করে অতঃপর সে সিদ্ধান্ত নেয়। সুনীলের সঙ্গে তার এই মিলের কারণেই সুনীল একপর্যায়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় :

> আমি ভাবছিলাম কী, সমস্ত ছোটো বড়ো ব্যাপারে আমরা প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মতো পরামর্শ করি। ... প্রেম বোধ হয় আমাদের আসবে না, ও জিনিসটা বোধ হয় আমাদের ধাতেই নেই। কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে যখন আমাদের এত মিল, স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেলেই বা দোষটা কী? অন্তত দুজনে বসে আমরা একটা প্ল্যান তো করতে পারি – স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাকি জীবনটা আমরা কাটাতে পারি কি না?... আমাদের তো ভালবাসার বিয়ে হবে না। সুবিধার বিয়ে হবে। পরস্পরকে আমরা জানি বুঝি বিশ্বাস করি পছন্দ করি, দুজনে পরামর্শ করে কাজ পর্যন্ত করি। সেইজন্য একটা সম্পর্ক গড়ে নেওয়া। আমাদের বোধ হয় ভালোই লাগবে মায়া।... পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কী? ভালো না লাগে, শেষ পর্যন্ত সুবিধে না হয় – বিয়েটা আমরা বাতিল বলে ধরে নিয়ে এখন যেমন আছি তেমনি থাকব। [১]

সুনীলের বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে মায়া তাকে জানায় :

> তা আর হয় না। এখন যেমন আছি তেমন থাকা যায়, কিছুদিন স্বামী-স্ত্রীর মতো কাটিয়ে আর এ অবস্থায় ফেরা যায় না। সেই জন্য খুব ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখা দরকার। ... আজকেই একটা কিছু ঠিক করে না ফেলে, কয়েকটা দিন ভাবি এসো। আজকে কথাটা উঠল, আজকেই হেস্তনেস্ত করা ঠিক হবে না। [২]

মায়ার সঙ্গে সহজ ও আন্তরিক এ-সম্পর্কের সূত্রে সুনীল চরিত্রের নীতি-আদর্শের স্বরূপ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়। মায়াও উপলব্ধি করতে পারে, তার প্রতি সুনীলের আন্তরিকতার স্বরূপ।

[

১. *পাশাপাশি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

২. *পাশাপাশি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

নন্দার সঙ্গেও সুনীলের সম্পর্ক ছিল কর্তব্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। নন্দাকে পড়াতে গিয়ে সে নন্দার অসহায়তার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে, এবং তার পত্রিকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। নন্দার ইচ্ছা ছিল , পত্রিকাটি হবে অদলীয় ও স্পষ্টবাদী। কিন্তু সুনীল আস্তে-সুস্থে নন্দাকে বুঝিয়ে বলে :

> অদলীয় মানুষ হয় না, অদলীয় কাগজও হয় না। মানুষ হোক কাগজ হোক, একটা পক্ষ নিতেই হবে।... পক্ষ যে মানুষকে নিতেই হবে তার আসল মানে হল এই যে, সমস্ত মানুষ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে আছে – শোষক আর শোষিত। এর একটা ভাগে মানুষকে পড়তেই হবে। রাজনৈতিক দলও আসলে আছে দুটোই – শোষকের দল আর শোষিতের দল।[১]

সুনীলের তত্ত্বাবধানে অতঃপর 'দি পিপলস ভয়েস' নামের পত্রিকাটি ক্রমশ বাম রাজনীতির সংস্রব গ্রহণ করে এবং দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এমতাবস্থায় নন্দা সুনীলকে পত্রিকার আংশিক মালিকানা প্রদানের প্রস্তাব করলে সুনীল নির্দ্বিধায় বলে :

> আমি তো মাইনে নিচ্ছি।...
> শুধু মাইনের স্বার্থ নয়– কাগজে লিখছি। কাগজে আমার মতামত প্রকাশ পাচ্ছে, অনেক গায়ের জ্বালা কাগজটার মারফত ঝাড়তে পারছি, দেশের লোকের অনেক দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই করছি। কাজ করে এত আনন্দ জীবনে কখনো পাইনি। কেবলি কী মনে হয় জানো? বদ্ধ একটা জলার মতো এতদিন যেন জীবনটা শুধু পচছিল – এতদিনে সত্যি একটা গতিলাভ করেছে। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। কাগজ তোমারই থাক, আমাকে কাগজটা চালিয়ে যেতে দিয়ো, তাহলেই হবে।[২]

অল্পদিনেই অন্যায় আর অবিচারের সমালোচনা ও প্রতিবাদ, জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে পত্রিকার কাটতি বেড়ে যায়। পত্রিকার আপিসে অনেক নামকরা নেতা, লেখক-সাংবাদিক, শিক্ষাব্রতী সন্ধ্যার দিকে এসে আড্ডা জমায়। মালিক নন্দা দেবীও পত্রিকার উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তায় সন্তুষ্ট হয় এবং পত্রিকাটির সম্পাদক প্রদ্যোতও সুনীলকে উচ্ছ্বসিত সমর্থন করে। এদিকে আর্থিক সংকট উত্তরণে সুনীলকে পত্রিকার অংশীদারিত্ব প্রদান করা হয়। পত্রিকাকে বাঁচাতে সুনীল তার পরম শত্রু অঘোরের পঙ্গু মেয়ে বিভাকে অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করতে সম্মত হয়। অর্থের লোভে সুনীল পঙ্গু বিভাকে বিয়ে করবে – এ কথা বিশ্বাস করেনা তার নিকটজনও। তার বান্ধবী মায়াও এতে অবাক হয়। তবে সুনীলের বিয়ের এই সংবাদ সে অবশেষে মেনে নেয়।

---

১. *পাশাপাশি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

২. *পাশাপাশি*, পূর্বোক্ত, পৃ-৬০

সুনীল আবেগতাড়িত হয়ে বিভাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। ছাত্রী বিভার সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল আন্তরিক। বিভা যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'দি পিপলস ভয়েস' ভয়েস পত্রিকার কর্মপরিধি সম্প্রসারণের প্রয়োজনে অর্থসাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে তখনই সুনীল তাকে স্ত্রীর গৌরবে ভূষিত করেছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধনের জন্য সে একটি পঙ্গু মেয়েকে বিয়ে করতে দ্বিধান্বিত হয়নি। এখানেই সুনীল চরিত্রের গৌরব। আবার বিভাও সুনীলের প্রতি বিশ্বস্ততা ও একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করেছে। বিভাকে ব্যবহার করে তার পিতা অঘোর পত্রিকা থেকে অনৈতিক সুবিধা আদায় করতে চাইবে, এরকম একটা জনরব উঠলে বিভা সুনীলের পক্ষেই তার ভূমিকা স্পষ্ট করার অঙ্গীকার করে। এ-প্রসঙ্গে সুনীল-বিভার কথোপকথন লক্ষণীয় :

> (সুনীল) বলে, তোমায় স্পষ্টভাবে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম। তোমায় বিয়ে করা ছাড়া আর কোনো শর্ত থাকবে না তো আমার টাকা পওয়ার?
>
> বিভা আশ্চর্য হয়ে বলে, আবার কীসের শর্ত?
>
> তোমার বাবা যদি কোনো গোলমাল করেন?
>
> ইস! গোলমাল করলেই হল! বাবা তো আর তোমায় টাকা দেবে না, টাকা দেব আমি। বলো না এক্ষুণি চেক লিখে দিচ্ছি।...
>
> আমার পক্ষ নিয়ে বাবার সঙ্গে যদি তোমার লড়াই করতে হয়? সম্পর্ক আর টাকার বিনিময়ে উনি যদি আমার কাছে কিছু বাগাবার চেষ্টা করেন, তাই নিয়ে ওর সঙ্গে যদি তোমার ঝগড়া হয়? তুমি দোটানায় পড়ে কষ্ট পাবে।
>
> বিভা দ্বিধামাত্র না করে বলে, না। কষ্ট পাব, দোটানায় পড়ব না। বাবা যদি অন্যায় করে তোমার কাছে কিছু বাগাতে চায়, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার দোটানার কষ্ট হবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি বলে বুকে জোর পাব। দরকার হলে, বাপের দিক ছেড়ে মেয়েরা স্বামীর দিকেই ঝোঁকে – এটাইতো চিরকালের নিয়ম।[১]

নবীন অঘোরের অফিসে চাকরি করে। 'বছরখানেক আপিসে ঢুকেছে। ঢুকেছে খিড়কির দরজা দিয়ে। পরীক্ষা পাসের গুণ বা কোয়ালিফিকেশনের জোরে তার চাকরি নয়। অঘোরের মেয়ে তাকে স্নেহ করে।'[২] বিভার বাবা অঘোরও তাকে স্নেহ করে। নবীন কবিতা লেখে এবং তার একটি কবিতার বইও বেরিয়েছে। একই অফিসে সুনীলের সঙ্গে চাকুরির সুবাদে সুনীলের ছোটবোন আলপনার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক 'এনগেজমেন্ট' পর্যায়ে গড়ায়। নবীন আলপনার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে 'নব আলপনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করে। একসময় নবীনের সঙ্গে সুনীলের সম্পর্কের তিক্ততা

---

১. *পাশাপাশি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

২. *পাশাপাশি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

সৃষ্টি হয়, যা আলপনা সহজভাবে নিতে পারে না, এমনকি নবীনের সঙ্গে সে কথাবলাও বন্ধ করে দেয়। তবে নবীন জানে তাদের এ অভিমান দীর্ঘস্থায়ী নয়, সমঝোতার যোগ্য। এজন্য একদিন সে প্রতিজ্ঞা ভেঙে মান ভাঙাতে সুনীলদের বাড়িতে আসে। সে সুনীলকে বলে – 'আপনি বিভাদিকে বিয়ে করেছেন বলেই আমার মাইনে বাড়াল। অঘোরবাবু নিশ্চয় ধরে নিয়েছেন আমি ঘটকালি করে বিয়েটা ঘটিয়েছি। অঘোরবাবু জানেন যে বিভাদি দরকার হলেই আমাকে আপনার কাছে পাঠাত – গাড়ির ড্রাইভার থেকে শুরু করে অঘোরবাবুর অনেকগুলি স্পাই আছে।'[১] নবীন সুনীলের কাছে আলপনার অভিমানের কথা অসঙ্কাচে জানায়। তার সঙ্গে আলপনা কথা বন্ধ করে দেওয়ার কথাও জানালে সুনীল হেসে বলে – 'তোমার মতো খোশামুদে মতলববাজ ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বন্ধ করাই উচিত।'[২] সুনীলের এ-বক্তব্যে তার ব্যক্তিত্বই পরিস্ফুট হয়। সে যে সমস্ত ভাবালুতার ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করতে অভ্যস্ত তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমদিকের উপন্যাসসমূহে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বকে যেভাবে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, মার্কসীয় ভাবাদর্শ গ্রহণের পরও তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। এ কারণে উপনাসের বিস্তৃত অংশ জুড়ে সুনীলের গতিবিধিসূত্রে তিনি মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ' লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হলেও এ উপন্যাসের বিপুল অংশ জুড়ে উপস্থাপিত হয়েছে সুনীলের মনোবিশ্লেষণ। সেই সঙ্গে কখনো কখনো পরিবেশিত হয়েছে মায়া-চরিত্রের মনোবিশ্লেষণও। এসব বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যার দক্ষ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটি তাৎপর্য অর্জন করেছে।[৩] তবে সবকিছু ছাপিয়ে এ-উপন্যাসে বড়ো হয়ে উঠেছে মানুষের জীবন। প্রেমের চেয়ে জীবন যে অনেক বড়ো, এবং জীবনে যে নীতিনিষ্ঠতা কতোবেশি জরুরি তা সুনীল চরিত্রের জীবন ও কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে মানিক উপস্থাপন করেছেন।

নাগপাশ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নাগপাশ* (১৯৫৩)[৪] একটি অন্যতম আর্থ–সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার উপন্যাস। উপন্যাসটি কয়েকটি চরিত্র – নরেন, মাধব, মন্টু প্রভৃতি চারত্রের জীবনবাস্তবতা অবলম্বনে রচিত

---

১. *পাশাপাশি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

২. *পাশাপাশি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৩. সৈয়দ আজিজুল হক, কথাশিল্পী মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

৪. *নাগপাশ* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঁচিশতম উপন্যাস। এটি ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে (নববর্ষ ১৩৬০) প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : সাহিত্য জগৎ, কলকাতা। (দ্রষ্টব্য : সরোজমোহন মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১)

হয়েছে। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট যুদ্ধোত্তরকালে আরো তীব্র হয়ে ওঠে যা ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে চাকরিচ্যুতি, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, উদ্বাস্তু সংকট প্রভৃতির যৌথতায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ব্যক্তিজীবনের সংকটের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জীবনের সংকটের মেলবন্ধন ঘটায় মানিক এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন। আর এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর মার্কসীয় চেতনা। যে ভাবাদর্শ অনুযায়ী সংকট নিরসনের একটি পথ তিনি একালে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। এ উপন্যাসে তাঁর এসব ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে।'[১]

নাগপাশ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নরেন ছাড়াও আরও কয়েকজন বেকার যুবকের কষ্টকর জীবনযাপনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।। নরেন শিক্ষিত বেকার যুবক। মাধব কলেজে অধ্যাপনা করে। নন্দন এম.এ পাশ করে বছরের পর বছর যাপন করছে বেকার জীবন। দীননাথের ছেলে মণ্টু অর্থাভাবে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি। এদের বেকার জীবনের দুর্দশাময় বাস্তবতা উপন্যাসে সমকালীন জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে পরিবেশন করেছেন মানিক।

নরেন ছাত্র হিসেবে মেধাবী। বিদ্যাভ্যাসই তার ধ্যান-জ্ঞান। অবশেষে 'গ্র্যাজুয়েটত্ব লাভ করে পড়া ছেড়ে দিয়ে আশি টাকার একটা চাকরিতে গাঁথা হয়ে গিয়ে জ্ঞানী হবার সাধ তার ভোঁতা হয়ে গেছে।' তবু বেকার-জীবনের অবসান হয়েছে এটিই তার জন্য অনেক গর্বের বিষয় :

> এই বাজারে যেমন হোক একটা চাকরি! লোকে তাই বলে। বাড়ির লোকে তো আরো বেশি জোর দিয়ে বলে। কত বেকার ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা চাকরির জন্য, তার বন্ধু নন্দন আজ পর্যন্ত কিছু জোগাড় করতে পারল না।
>
> সে একটা চাকরি পেয়েছে!
>
> পরীক্ষা পাসের পুরস্কার শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে এই, বেকারদের সঙ্গে তুলনায়। প্রথম বয়সটা গেল পরীক্ষা পাস করার ধান্ধায়, বাকি জীবনটা কাটবে জেলখানার কয়েদির মতো কলম পিষে।[২]

কিন্তু নরেনের এই চাকরিপ্রাপ্তির স্বস্তি একেবারেই সাময়িক। একমাসের ব্যবধানে একদিন সে অফিসে গিয়ে জানতে পারে, তার চাকরি নেই। কেবল সে নয়, তার সঙ্গে আরও তেরোজনের চাকরি গেছে। চাকরি হারানোর বেদনায় সে যখন অস্থির, তখন দেখা গেল, সহানুভূতির জ্ঞাপনের পরিবর্তে পরিবারের সবাই তাকে এজন্য দোষারোপ করে চলেছে:

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক, কথাশিল্পী মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

২. *নাগপাশ*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

রোজগেরে চাকরে মানুষের দলে ভিড়েও, এতদিন চাকরি করেও, তুই শেষে এমনভাবে বেকারের দলে এসে ভিড়লি! সব দোষ তোর। মানিয়ে চলতে পারলে কি তোর এ দশা হয়? চাকরি যায়?

চিরকালের অবুঝ একগুঁয়ে সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধিহীন ছেলে। এছাড়া তার কী গতি হবে?[১]

চাকরিপ্রাপ্তির পরে পরিবারে তার যে অবস্থান ছিল অতিদ্রুত তা পাল্টে যায়; অবহেলা-অবজ্ঞাই হয়ে ওঠে তার নিয়তি :

... বেকার হবার ক-টা দিনের মধ্যে সকলের কাছে সে যেন চোরছ্যাঁচড়ের চেয়ে অধম ঘরের শত্রু দাঁড়িয়ে গেছে!

শুধু অবজ্ঞা করা নয়, তাকেভাত খেতে না ডেকে, নিজে গিয়ে আসন পেতে খেতে বসলে তাকে ভাত দিতে স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখিয়ে, তাকে যেন আঘাত করতে চায় মা আর বোনেরা!

এক সকালের মধ্যে এই পরিবর্তন।[২]

যে ছবিরানীকে নিয়ে সে জীবন ও সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখতো, সেও নরেনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নরেনের জন্য অপেক্ষা করতে সেও ভরসা পায় না। সে নরেনকে জানিয়ে দেয় –

আমি বাবা সেকেলে মেয়ে – দেখছি তো সংসারের অবস্থা। উড়ো কথায় চিঁড়ে ভেজে না জানি। একদিন তোমার চাকরি হবেই যদি ভরসা থাকত, মা আর দাদুর সঙ্গে লড়াই করে আমি এটা ঠেকাতাম।...

ছবিরানী আরো রেগে বলে, রাগ কর আর টিটকারি দাও, আমি সব জানি। তোমাদের নিজেদের দোষেই কোনোদিন চাকরি হবে না। [৩]

সংসারের সবাই যখন নরেনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন সে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

তাকে পালাতে হবে এই পরিবেশ ছেড়ে।

গরিবদের মধ্যে, অশিক্ষিতদের মধ্যে, চাষি-মজুরদের মধ্যে, পালিয়ে গিয়ে তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে!

যারা অন্ধকারে থাকে, শুধু সূর্যের আর চাঁদের আলো চেনে, কৃত্রিম আলোয় মিথ্যার সত্যরূপ দর্শন করে বিভোর হয় না – তাদের মধ্যে যেতে হবে। সেখানে কেউ তো তাকে ঘৃণা করবে না সে বেকার বলে! উসকানি দিয়ে দিয়ে তাকে পাগল করে দেবে না।

---

১. *নাগপাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

২. *নাগপাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৩. *নাগপাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪

> উপোস করে থাকলেও স্বস্তি আর আত্মমর্যাদা বোধটা তো তার বজায় থাকবে। অন্তত মাথাটা ঠিক রাখতে তো পারবে ওদের সঙ্গে থেকে।[১]

এভাবে সুবিধাবাদী ও সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ-পরিসর জীবন ছেড়ে নরেন শহরের সাধারণ বস্তিবাসীদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। গ্রামের অশিক্ষিত কৃষকের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হয়। এদের জীবনধারার সঙ্গে মিশতে গিয়ে সে তার মধ্যবিত্তসুলভ বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি পরিহার করতে সক্ষম হয়।

নাগপাশ উপন্যাসে মাধব উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তবে তিনি আর্থিকভাবে অসচ্ছল; বিষয়বুদ্ধিহীন। একদিন বাজারে প্রয়োজনের চেয়েও মস্তবড়ো ইলিশ মাছ কিনতেই তাঁর পকেটের টাকা শেষ হয়ে যায়। তরকারি কেনার অবশিষ্ট অর্থ না থাকায় একটি বেগুন ও দুটি আলু নিয়ে তিনি বাড়িতে ফেরেন। এ নিয়ে স্ত্রী মানসী ও শিষ্য নরেন হাসি-তামাশায় মেতে ওঠে। তবে মাধব বিদ্যাপাগল মানুষ ভেবে মানসীর রাগ কমে যায় । মাধবের মনে হয় –

> সে-ই কি মানসীকে আজ উসকে দিয়েছে বেশি করে মানিয়ে চলার জন্য, সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য? মাধবকে নিয়ে আলোচনা করার সময় তার কথার এই মানেই কি মানসী বুঝেছে যে জ্ঞানের জন্য যে পাগল হয় তার অন্যরকম পাগলামি, চরম আত্মকেন্দ্রিকতা হোক, বা স্বার্থপরতা হোক, সে পাগলামিগুলিকেও মেনে নিতে হবে, প্রশ্রয় দিতে হবে।[২]

আদর্শিক কারণে মাধব অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে পারেন না। তিনি দিল্লিতে মোটা অঙ্কের বেতনের চাকরি নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন। কলেজে বাংলা নববর্ষের আলোচনা সভায় প্রধান বক্তার বক্তব্যে মাধব এদেশের শিক্ষানীতির অব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলেন –

> শিক্ষার অব্যবস্থার সঙ্গে অন্য সমস্ত অব্যবস্থার অন্যায় ও দুর্নীতির যোগাযোগগুলি দেখিয়ে দিয়ে সে ঘোষণা করে যে ওসব বজায় থাকলে শিক্ষার অব্যবস্থা কোনোমতেই দূর হতে পারে না, পৃথক করে শিক্ষার ভালো ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করার অর্থ হয় না। সুতরাং ভালো শিক্ষালাভই যদি ছাত্রজীবনের একমাত্র ব্রত, একমাত্র কাজ ধরেও নেওয়া যায় – এই নীতি অনুসারে, শিক্ষার খাতিরে ছাত্রদের কোমর বেঁধে সবকিছু ঠিক করার কাজে অর্থাৎ রাজনীতি করতে নেমে পড়তে হবে।[৩]

---

১. *নাগপাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

২. *নাগপাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৩. *নাগপাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে প্রকাশ্যে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করায় মাধব কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়েন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি চাকরিচ্যুত হন। এ অবস্থায় স্ত্রী মানসী তার ধনী বোনের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ফলে মাধবের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হতে থাকে। কিন্তু তিনি দ্রুতই এ-অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির পথসন্ধান করেন। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তিনি সন্তানদের প্রতিপালনের দায় নিজেই গ্রহণ করেন; কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে মামলা করেন, সেইসঙ্গে বিদ্যার্জন ও বই প্রকাশের কাজে মনোযোগী হন। নরেনকে তিনি বইয়ের প্রুফ দেখার কাজ দেন এবং সহকারীরূপে নিযুক্ত করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে বেকার জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা এবং একইসঙ্গে বস্তিবাসী ও গ্রামীণ কৃষকদের জীবনযুদ্ধের নগ্নবাস্তব রূপ তুলে ধরেছেন। নরেন তার মধ্যবিত্তের অহমিকাবোধ ত্যাগ করে এদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। জীবনের সুখ-দুঃখকে সে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে। কোনো কাজেই এখন আর তার অনীহা নেই। সে এখন প্রেসে প্রুফ রিডারের কাজ করে। মাধবের উৎসাহে সে কাজটি বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে করে। এই পর্যায়ে সে মাধবের মনোজাগতিক শূন্যতা অনুভব করে, এবং মৌসুমীকে মাধবীর সংসারে নিয়ে আসার প্রয়াস পায়। কিন্তু তার জীবনের শূন্যতা পূরণ করবে কে? ছবিরানীর সঙ্গে সেই যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে তা দিনে দিনে কেবলই ব্যাপ্ত হয়েছে। দিন সাতেক পরে সতেরোই বৈশাখ ছবিরানীর বিয়ে। চাকুরে স্বামীর সংসার করতে করতে একসময়সে বুড়িয়ে যাবে; আর নিঃসীম শূন্যতায় সমর্পিত হতে থাকে নরেন। উপন্যাসের শেষে তার এই মনোভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নাটকীয়ভাবে উপস্থিতি ঘটে ছবিরানীর। নরেনকে চমকে দিয়ে সে বলে :

> হ্যাঁ গো। তোমার চাকরিবাকরি নেই বলে কোথায় আরো বেশি করে তোমায় আঁকড়ে ধরব, তোমার হয়ে সবার সাথে লড়াই করব, তার বদলে তোমায় বাতিল করে দিলাম! একেবারে উলটো হিসাব নয়? বোকাই ছিলাম আমি! ...
>
> আমি এবার ঠিক বুঝেছি। কাল কী ভাবলাম জানো? ভাবলাম তোমার চাকরিটা থাকতে থাকতে যদি আমাদের বিয়ে হয়ে যেত? চাকরি গেছে বলে তোমায় তখন কি ছাঁটাই করতে পারতাম? ভেবেই ঠিক করলাম, মান চুলোয় যাক, ভোরে উঠে আমি নিজেই তোমার কাছে আসব।[১]

---

১. *নাগপাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

বেকার সমস্যা যে সমাজে একটি জটিল ও ভয়াবহ সমস্যা তা এ উপন্যাসে লেখক অত্যন্ত বাস্তবভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসে গোবিন্দ প্রতারকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পূর্ব পুরুষের অর্থ উপার্জনের একমাত্র সম্বল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি হারিয়ে পরিশেষে বিষপানে আত্মহত্যা করে। অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মন্টু জীবিকার তাড়নায় ডিম ফেরি করে; নন্দন তার আকাঙ্ক্ষিত জীবনলাভে ব্যর্থ হয়; অনেকের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। যে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব মানুষের জীবনে অতলান্তিক অন্ধকার নিয়ে আসে, সে-দারিদ্র্যের মধ্যেও যে শক্তি ও সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে তা মানিক এ-উপন্যাসে নরেন ও মাধবের জীবনপরিণামসূত্রে প্রদর্শন করেছেন। দারিদ্র্য এদের শুভবোধকে বিনষ্ট করেনি বরং প্রখর করেছে। শেষপর্যন্ত এরা উত্তরিত হয়েছে ইতিবাচক বোধে।

বস্তুত, *নাগপাশ* উপন্যাসে সমকালের বেকার সমস্যা, ছাত্র রাজনীতি, কারখানা-অফিসে ধর্মঘট, গ্রামে কৃষক বিক্ষোভ, কলেজে ছাত্ররাজনীতির বাস্তব ঘটনা চিত্রায়ণের মাধ্যমে মানিক প্রকৃতপক্ষে সমকালীন সমাজসত্যকেই রূপদান করেছেন।

চালচলন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চালচলন* (১৯৫৩)[১] উপন্যাসটি আকারে-প্রকাশে ছোটো। এটি একটি নির্ভেজাল সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক সুনীলের বৈচিত্র্যহীন জীবনের ইতিবৃত্ত নিয়ে *চালচলনের* ঘটনাংশ পরিকল্পিত। সুনীল ভালো বাঁশি বাজায়, চাকরি করা সত্ত্বেও আর্থিক সংস্থানের জন্য টিউশনি করে এবং সে-সূত্রে ছাত্রী রেণুর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে তা পরিণয়ে রূপ পায়নি। এ নিয়ে সুনীলের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়াও নেই।

সুনীল সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল নয়। 'কোনো দায় কোনো ঝঞ্ঝাট সে ঘাড়ে নিতে রাজি নয়। মাসে মাসে বেতন পেলে হাতখরচের টাকাটি রেখে বাকি সমস্ত টাকা সে মা-র হাতে তুলে দেয়। সংসারের জন্য এটুকু ছাড়া আর কিছুই যেন তার করার নেই।'[২] সে প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণের সময় পাড়ার বিভিন্ন বাড়ি থেকে ফুল এনে রেণুকে মাল্যদান করে। মানিক বলেন :

---

১. গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক থেকে *চালচলন* মানিকের সাতাশতম উপন্যাস। এটি প্রকাশিত হয় জুন ১৯৫৩ সালে (আষাঢ় ১৩৬০)। এর প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা)। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

২. *চালচলন*, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুময় পাল-এর ভূমিকা সম্বলিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উত্তরকালের ছয় উপন্যাস*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় পুনমুদ্রণ : মার্চ ২০১৮, পৃ. ২৪২

> জ্যোৎস্নাকে ভোরের আলো ভেবে সুনীল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। ভোরের বদলে শেষরাত্রে। ভোর শুরু হতে হতেই সে প্রতিদিন বেড়াতে বার হয়। যখন রাত্রির অন্ধকার সবে তরল হতে শুরু করেছে অথবা রাত্রিশেষের জ্যোৎস্নাতে লাগতে আরম্ভ করেছে ভোরের আলোর রং। বাড়িতে এত ভোরে আর কারও ঘুম ভাঙেনা। বেড়াতে বেড়িয়ে সুনীল ফুল তুলে আনে প্রতিদিন।[১]

এদিকে সংসারের ব্যয় বেড়ে গেলেও আয় বাড়েনি সুনীলের বাবা সিদ্ধেশ্বরের। একারণে তার আফিমের পরিমাণটা চড়ে গেছে, কমে গেছে দুধের বরাদ্দ। সুনীলের চাকরি পাওয়ার পরও তা দিয়ে পরিবারের খরচ মেটাতে কষ্ট হয় তাদের। এদিকে ছোটো ছেলেমেয়ে দুটিকে স্কুলে দিতে হয়েছে। বড়ো তিনজন পড়ছে উচ্চ শ্রেণিতে। এসব চিন্তায় সিদ্ধেশ্বরের শরীর ভেঙে যায় :

> শরীর যে ভেঙে পড়ছে গো। সেইজন্যই তো পারছি না! এত ঝঞ্ঝাট, চিন্তাভাবনা আর সয়না আমার। এ আফশোশের মানে বোঝে সকলেই, সাত বছরের মীনা পর্যন্ত বোঝে। সুনীল তাকায় না সংসারের দিকে। ... বিয়ে করে সে যদি ভিন্ন হয়ে যেত? একেবারে ডুবে যেত সিদ্ধেশ্বরের সংসার।[২]

উপন্যাসে রেণু অনেকটা আকস্মিকভাবে সুনীলের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করে এক অধ্যাপকের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসে। সুনীলের পছন্দের দুই নারী – রেণু ও মিলনীর বিয়ে হয়ে হলে সে একা হয়ে পড়ে সুনীল। অবশ্য সে মনের ব্যাকুলতা রেণু বা মিলনী কাউকেই জানাতে পারেনি। তাই আত্মপ্রবঞ্চনা তাকে আঁকড়ে ধরে। এসময় সে –

> সারাদিন পথে-ঘাটে ট্রামে বাসে আপিসে অসংখ্য মানুষের বাঁচার জন্য মর্মান্তিক প্রচেষ্টা দেখে এসে, একটা সুস্থ মুখ দেখে নিরানব্বইটা ক্লিষ্ট ক্লান্ত কেরানী, চাষি আর কুলিমজুর ফেরিওয়ালা, দোকানি আর ভিখারি, রঙিন কাপড়ে মোড়া ক্ষুধাতুরা শিকারিনি একাকিনী বেশ্যা, ভদ্র মেয়ে, এক পর্যায়ে কুষ্টের ক্ষত ব্যান্ডেজ করা যুবতি ভিখারিনি–সারাদিন জীবনের এই বিচিত্র কুৎসিত রূপ দেখে এসে, সন্ধ্যার পর চারিদিকে মার্কিনি ঢং-এর গানবাজনায় মুখরিত অনেকগুলি রেডিয়োর বেলাল্লাপনার পরিচয় পেতে পেতে সুনীল যখন বাঁশিটি হাতে নিয়ে ছাদে গিয়ে বসে, তখন এইসব চিন্তা তার মনে আসে।[৩]

মিলনী বিত্তবান অবিনাশের মেয়ে। মিলনীর সঙ্গে সুনীলের পরিচয় করিয়ে দিতে রাজি হয়নি রেণু। তাই মিলনী সুনীলের কাছে বলে– 'আমি যেচে কারও সাথে আলাপ পরিচয় করি না। রেণুদি জিজ্ঞেস করেছিল,

---

১. *চালচলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

২. *চালচলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

৩. *চালচলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

ডাকব, আলাপ করবে? আমি যদি সায় দিয়ে বলতাম, হ্যাঁ হ্যাঁ ডাকো, আলাপ করিয়ে দাও – আপনি আবোল-তাবোল কতরকম কিছু ভাবতেন। রেণুদি আপনাকে বলত, মিলনী তোমার বাঁশি শুনে তোমার সাথে আলাপ করতে চেয়েছিল, তাই ডেকে আলাপ করিয়ে দিয়েছি।'[১] মিলনীর মধ্যে কোনো রোমান্টিকতা নেই, তার কাছে গুরুত্ব নেই সুনীলের পুষ্পাঞ্জলিরও। তাই বাবার পছন্দের পাত্র অনাদীর সঙ্গেই সে বিয়েতে রাজি হয়। যদিও এর বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ যৌতুকের টাকা গুনতে হয়ে তার বাবাকে।

চালচলন উপন্যাসে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত – উভয় সমাজে যৌতুক প্রথার প্রভাব লক্ষণীয়। বিলেতফেরত অনাদী যৌতুক নিয়ে অবিনাশের মেয়ে মিলনীকে বিয়েতে সম্মত হয়। এমনকি বিয়ের আগেই অনাদী যৌতুকের অর্থ গ্রহণ করে। আবার সুনীলের বাবাও মোটা অঙ্কের যৌতুকের প্রস্তাব পেয়ে ছেলের বিয়েতে সম্মতি দেয়।

মনোজ এ উপন্যাসের আরেকটি পুরুষ চরিত্র। সে সহায়রামের কারখানায় কাজ করে। অফিসে ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সে গুরুতর আহত হয়। তার ভেতরকার নির্লিপ্ত সমাজ-সচেতনতাই তাকে আন্দোলনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেয়নি। সুনীলের 'গা বাঁচিয়ে চলা' নিয়ে সে বিস্মিত। মনোজ একের পর এক স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে তিনটি বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

মানিক এ উপন্যাসে বিভিন্ন সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজের রন্ধ্রে বহমান দারিদ্র্যের ভয়াল চিত্র। উপন্যাসে বিত্তহীন দরিদ্রশ্রেণির কথা আছে, মার্কিনি সভ্যতার উৎকর্ষের কথা আছে। মনোজদের কারখানায় পুলিশি উপদ্রবের কথা আছে। তবে সব কিছু মিলিয়ে যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চালচলনের পরিবর্তনের অনিবার্যতার প্রসঙ্গও আছে। মিলনী যাকে ভালোবাসা বলেছে, অনাদী তাকেই ন্যাকামি বলেছে। সেই সঙ্গে সুনীল চরিত্রের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। এ প্রসঙ্গে সমালোচক রহমান হাবিব বলেন :

> নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সুনীল বিলাতফেরত অনাদি-কে যে অর্থলোভী ও প্রতারক ধারণা করেছে; তা তার মধ্যবিত্তসুলভ দোলাচল ও অদূরদর্শী মানসিকতার কারণেই। মিলনী নাম্মী উচ্চবিত্ত সংসারের কন্যার মনে ভালোবাসার যে রোমান্স কাতরতা, তা তার বিত্তশালিতার জন্যেই; অথচ অনাদি চরিত্রের মধ্যে

১. *চালচলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

বাস্তবতাশাণিত সংহত হৃদয়বৃত্তিই আমরা প্রত্যক্ষ করি। মানব চরিত্রের আর্থনীতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কসূত্র এ উপন্যাসে অভিব্যক্ত হয়েছে।[১]

চালচলন উপন্যাসে লেখক সুনীলকে আত্মোপলব্ধিহীন এক মানব চরিত্রের প্রতিনিধি হিসেবে অঙ্কন করেছেন। এ চরিত্র অঙ্কনে লেখক ইতঃপূর্বে রচিত দুটি উপন্যাস –*পাশাপাশি* ও *ছন্দপতনের* ছায়া অবলম্বন করেছেন। বলা যায়, লেখক এ উপন্যাসে নরনারীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম ও জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন।

তেইশ বছর আগে পরে

তেইশ বছর আগে পরে (১৯৫৩)[২] উপন্যাসটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যথার পূজা'[৩] গল্পের প্রলম্বিত রূপ। গল্পটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তিনি গ্রন্থভুক্ত করেননি। তেইশ বছর পরে সে-গল্পটিকে প্রলম্বিত করে তিনি রচনা করেছেন এ-উপন্যাস। এর মধ্য দিয়ে মানিক মূলত শিল্পীর দায়ই পালন করেছেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> তেইশ বছর আগে ছাত্রজীবনে একটি করুণ কাহিনী রচনা করেছিলাম। ... কাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছিল বিচিত্রায়। ...
>
> এ তো গল্প নয়। এ যে অসম্পূর্ণ কাহিনী। ...
>
> কাহিনীটিকে সম্পূর্ণতা দেবার দায়িত্ব কেবল নয়, বাস্তবকে ফাঁকি দিয়ে আর সত্যকে আড়ালে রেখে কীভাবে ফেনিল ভাবালুতার গল্প লেখা যায় সেটা দেখিয়ে দিয়ে সাহিত্যে ব্যথার পূজা-র নজির বাতিল করার দায়িত্বও আজ তেইশ বছর পরে পালন করছি। [৪]

---

১. রহমান হাবিব, *মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৯৩

২. *তেইশ বছর আগে পরে* উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে; মহালয়া উপলক্ষে। এর প্রকাশক ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলকাতা।

৩. 'ব্যথার পূজা প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়, ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে (আগস্ট ১৯২৯)।

৪. *তেইশ বছর আগে পরে*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১

মানিকের শিল্পিসত্তায় তেইশ বছরের ব্যবধানে কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা এ-উপন্যাসের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে শিল্পীকে যে সমাজের অসঙ্গতি নির্দেশের পাশাপাশি তার প্রতিকারের দায়িত্বও নির্দেশ করতে হয় তা এ উপন্যাসটি রচনার মাধ্যমে মানিক প্রদর্শন করেছেন।

তেইশ বছর আগে পরে উপন্যাসটি তেরোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এর প্রথম অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে 'ব্যথার পূজা' গল্প। অবশিষ্ট বারোটি অধ্যায়ে উক্ত গল্পের পরিণতি প্রদর্শিত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে 'শিক্ষিত মার্জিত মাতাল' জগদীশের জীবনের ট্র্যাজেডি উপস্থাপনের মাধ্যমে। ঢাকা শহরে বসবাসরত ধনী ব্যবসায়ী পিতার পুত্র এই জগদীশ। এম.এ পাশ করে সে জাহাজে চেপে দেশান্তরী হয়ে যায়। চার বছর পর সে দেশে ফেরে। দেশে ফেরার তিন পাঁচেক আগে মারা যায় তার বাবা। অতঃপর –

> শ্রাদ্ধের পর মাস তিনেক বাড়ি থেকে কলকাতায় চলে গেল। তারপর দশ বছর আর সাড়াশব্দ নেই। মাঝখানে কেবল খবর শুনলাম, সে তার সর্বস্ব দান করেছে।[১]

এরপর সে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে বোহেমীয় জীবন। এই জীবনের একপর্যায়ে সে প্রেমে পড়ে যায় চিত্রার। চিত্রাকে কেন্দ্র করে যখন জগদীশের জীবন বর্ণিল হয়ে উঠতে শুরু করেছে তখনই অকস্মাৎ পা ফসকে হুড্রুর জলপ্রপাতের মধ্যে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করে চিত্রা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়, জলপ্রপাতের নিকটেই এক বুনো গ্রামে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন শুরু করে জগদীশ। চিত্রার মৃত্যুশোক থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে বেছে নিয়েছে নির্জন জীবন। নেশার কড়া ওষুধে, মদ-গাঁজা-আফিম খেয়ে সে চিত্রার স্মৃতি বিস্মৃত হওয়ার চেষ্টা করে, এবং একইসঙ্গে আত্মরক্ষার উপায় সন্ধান করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সান্নিধ্য লাভের পর সে সাধু বনে যায়; হয়ে যায় সাধুবাবা জগদীশ। তার নাম অতি দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। 'অন্ত্যজ ও অন্যভাষী জিরাই ও তিপ্পাই তার জীবনযাত্রার সহকারী ও সহায়িকা, মদের নেশায় প্রায়ই সে আত্মবিস্মৃত হয় এবং তার প্রতি কৌতুহলী জনসাধারণের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেয়, জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে।'[২] একসময় ভক্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে ভক্তদের তিরস্কার করলেও তারা তাকে সাধু বলেই শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। গ্রাম ও শহর থেকে বিকারগ্রস্ত মানুষ মুক্তির আশায় ছুটে আসে। লেখক সে অবস্থার বর্ণনা করেছেন এভাবে :

---

১. *তেইশ বছর আগে পরে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩
২. নিতাই বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সাধু হিসাবে বেশি বেশি নাম ছড়ানো জগদীশকে বিস্মিত করে, একটু শঙ্কাও জাগায়। কী পরিণতি হবে তাকে সাধক-মহাপুরুষ করে তোলার এই প্রক্রিয়ায় যার গতিরোধ করার সাধ্য তারও নেই, একমাত্র পালিয়ে যাওয়া ছাড়া।

তিনদিকে ঘিরে আছে আদিম অসভ্য মানুষের গাঁ, তারাই সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি।

তারা জগদীশকে ভয় করে, ভক্তি করে।...

গ্রাম থেকে আসে চাষাভুষো মানুষ, তারা বড়োই গরিব আর বড়োই অজ্ঞ।...

গ্রামের চেয়ে বেশি ভক্ত আসে খোদ শহর থেকে।

শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মানুষ।

নানারকম অর্ঘ্য ও উপচার নিয়ে আসে – টাকাপয়সা প্রণামি দিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায়।

জগদীশ বলে, টাকা পায়ে ছুঁইয়ো না। ওই মাটির হাঁড়িটাতে ফেলে দাও।

উপদেশ চায়। আশীর্বাদ চায়। অর্থে-আনন্দে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ চায়।

জীবনে কত যে ব্যর্থতা আর কত যে ঝঞ্ঝাট মানুষের। কত যে সমস্যা আর কত যে বিপদ।[১]

একদিন সত্তরোর্ধ বয়সী প্রতাপ সপরিবারে হুড্রুর জলপ্রপাত দেখতে এসে জগদীশের আস্তানায় হাজির হয়। প্রতাপ তাকে সোনার মোহর দিয়ে প্রণাম করে। জগদীশই তার জীবনের 'শেষ সাধু, শেষ গুরু' – এমন দাবি করে সে সকাতরে জগদীশের সাহায্য প্রার্থনা করে, এবং বলে :

টানতে আর পারিনে বাবা। আছে তো মোটে তিন শ বিঘে জমি, গোটা চারেক বাড়ি আর আশি নব্বুই হাজার নগদ টাকা। কারবারটা টানছি বলে কোনো মতে ঠেকিয়ে যাচ্ছি। রোজগেরে ছেলেগুলো পর্যন্ত ছিনে জোঁকের মতো সেঁটে রয়েছে – ভাগটা না মারা যায়। কী অশান্তি, কী অশান্তি! ...

কোটিপতির ছেলে আপনি, পার্থিব সুখ ছেড়ে যোগী সন্ন্যাসী হয়েছেন। আপনার বাবাও ছিলেন মহাপুরুষ, কত হাজার টাকা আমায় পাইয়ে দিয়েছিলেন ঠিক-ঠিকানা নেই। দেশ বিদেশের জ্ঞান কুড়িয়ে এই বয়সে সংসার ছেড়ে সাধক হয়েছেন। আমার অশান্তি কীসে ঘোচে আমায় বলে দিতে হবে বাবা!'[২]

দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার পর জগদীশ হঠাৎ গর্জে উঠে বলে –

তুমি মহাপাপী।...

---

১. *তেইশ বছর আগে পরে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

২. তেইশ বছর আগে পরে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

মানুষের চেয়ে টাকার দাম তোমার কাছে বেশি। নিজের ছেলে মেয়ে বউ নাতি নাতনির সঙ্গে পর্যন্ত তোমার টাকার সম্পর্ক। রামকৃষ্ণ দেব বলতেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। তোমার কাছে টাকাই সব।'[১]

প্রতাপের অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর জগদীশ তাকে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেয়। অনেক সাধ্য-সাধনার পর জগদীশকে সে তার শহরের গৃহে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। জগদীশ এখানে আসার পর পুরো এলাকায় সাড়া পড়ে যায়। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা দলে দলে তার কাছে আসতে থাকে। জগদীশও তাদের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের আলোচনা নিয়ে মেতে থাকে। পরম ভক্তিতে সবাই তার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে। যদিও জগদীশ জানে :

সে যোগীও নয়, সাধকও নয়! বরং অতি অপদার্থ মানুষ। সে তো শুধু চিত্রার জন্যে নিজের অসহনীয় মনোবেদনা নিয়ে কাতরায়, নিজেকে অভিশাপ দেয়, সোজাসুজি আত্মহত্যা করতে পারে না বলেই বেপরোয়া নেশা চরমে তুলে চব্বিশ ঘণ্টার অর্ধেকের বেশি সময় ব্যথাবোধের শক্তি হারিয়ে দিন কাটিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মরে যেতে চায় – সচেতন থাকার সময়টুকু শুধু আবোল-তাবোল এলোমেলো চিন্তা করে।[২]

চতুর্দিকে যখন জগদীশের জয়জয়কার, তখন একদা চিত্রার প্রেমিক ও জগদীশের প্রতিদ্বন্দ্বী জলধি রায় পুরোনো ঈর্ষার জেরে একরাতে জগদীশকে গ্রেপ্তার করতে আসে। 'তারই ইঙ্গিতে চারজন মানুষ এসে নীরবে জগদীশের কুঁড়েঘরের দাওয়ার সামনে দাঁড়ায়, তাদের তিনজনের হাতে রাইফেল, একজনের হাতে রিভলবার।' ওই এলাকায় আশ্রম গড়ে তোলার চুরি-চামারি হচ্ছে চারদিকে। এজন্য তারা জগদীশকে দোষারোপ করে, এবং গ্রেপ্তার করতে চায়। কিন্তু জলধি রায় জগদীশকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের প্রিয় নেতা জগদীশকে রক্ষা করে। প্রাসঙ্গিক এলাকা লক্ষণীয় :

আবলুশ কুঁদে তৈরি করা শ-তিনেক মেয়ে-পুরুষ আঁধার ফুঁড়ে জড়ো হয় কুটিরের সামনে।

অস্ত্রধারী চারজনকে তিনদিকে ঘেরাও করে জমাট বাঁধে।

কারো হাতে কোনো অস্ত্র নেই। যেসব আদিম অস্ত্র সম্বল করে তারা বাঘ-ভালুকের রাজত্বে শিকার করতে যায়, সে অস্ত্রগুলি পর্যন্ত সঙ্গে আনেনি।'[৩]

---

১. তেইশ বছর আগে পরে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

২. *তেইশ বছর আগে পরে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫

৩. তেইশ বছর আগে পরে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

তার প্রতি আদিবাসীদের মমত্ববোধ প্রত্যক্ষ করে জগদীশ বিস্মিত হয়। সে ভাবতে থাকে – এমন কী দিয়েছে সে এসব বুনো মানুষদের, যার বিনিময়ে তারা তাকে এতো ভালোবাসে! তাকে রক্ষা করবার জন্য রাইফেলের সামনে বুক পেতে দেয়! পরিশেষে এদের ভালোবাসাই জগদীশকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে প্রণোদিত করে। প্রতাপ, তার পুত্রবধূ ললিতা, ললিতার বান্ধবী সুদর্শনা এবং রত্নাকরও তাকে পরিবর্তিত জীবনস্রোতে আন্দোলিত হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তদুপরি 'ভক্ত-সান্নিধ্যে সে উপলব্ধি করেছে, যন্ত্রণা শুধু তার একার ব্যক্তিমনেই নেই, সমষ্টিমনে রয়েছে তার ব্যাপ্তি; সুতরাং শুধু ব্যক্তির সুস্থতাই তার কাম্য নয়, কাম্য সমষ্টির সুস্থতা। সমষ্টির সুস্থতার জন্য আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি জগদীশ নিজ জীবনের সুস্থতা ফিরে পায়।'[১] যার পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশ পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে প্রতাপের সহযোগিতায় মনোরোগের চিকিৎসা কেন্দ্র খুলতে চায়; জনস্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করে, এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করে।

শুভাশুভ

মানিকের *শুভ/শুভ* (১৯৫৪)[২] উপন্যাসের বিষয় যুদ্ধোত্তরকালে ব্যবসা ও শিল্প-বাণিজ্যের ওপর নেমে আসা বিপর্যয়ের কাহিনি। উপন্যাসের তথ্যানুযায়ী মহিম চৌধুরীর মৃত্যুর পর তার ছেলে সমরেশকে পৈতৃক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি লোকসানের ভারে ছিল জর্জরিত। তাই বাধ্য হয়ে তাকে মামা ভবানীর সাহায্যপ্রার্থী হতে হয়। যদিও ভবানী প্রথম জীবনে ভগ্নিপতি মহিম চৌধুরীর তিনশো টাকা আত্মসাত করে পালিয়ে যায়, এবং সেই টাকা লগ্নী করে সে পরবর্তীকালে বিশাল অর্থ-বিত্তের মালিক হয়। সমরেশ তার সাহার্যপ্রার্থী হলে প্রথমাবস্থায় সে সমরেশের প্রতি বিশেষ কোন আন্তরিকতা দেখায় না। কিন্তু স্ত্রী সরমার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও চাপে সে সদয় হয় এবং অর্থসাহায্য প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করে। অল্পদিনের ব্যবধানে ভবানীর বিকারগ্রস্ততার শিকার হয়ে সরমা আত্মহননের পথ বেছে নেয়। অতঃপর বিলম্ব না করে নন্দিতাকে বিয়ে করে ভবানী। নবাগত মামীও সমরেশকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে ভবানীকে উদ্বুদ্ধ করে।

সমরেশ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃবন্ধু বনমালীর পরামর্শে এবং স্বীয় বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে পৈতৃক ব্যবসা নতুনভাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। মহিম আর বনমালী যে দায় সামলাত, মহিমের মরণের পর একা বনমালী আরো কিছুকাল সে দায় সামলে এসেছে – বনমালীর মৃত্যুর পর সে দায় সামলাচ্ছে ছেলেমানুষ সমরেশ। লোকসানি প্রেসটিকে বাঁচাবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এ সময়ে তার

১. সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

২. *শুভ/শুভ* প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মসে (আশ্বিন ১৩৬১)। এর প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা।

প্রেসে প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিকদের জম্পেশ আড্ডা চলতে থাকে। একদিকে ব্যবসার দায় অন্যদিকে সংসার চালাতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে ওঠে সমরেশ। অস্তিত্বরক্ষার এই সংগ্রামে সে তার পরিবারকে কৃচ্ছ্রসাধনায় উদ্বুদ্ধ করে।

শুভ/শুভ উপন্যাসে যুদ্ধোত্তরকালে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সমাজ-জীবনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, তা উপস্থাপিত হয়েছে। অভিজাত ব্যবসায়ী সমরেশের বাবা মহিম চৌধুরীর ব্যবসায়ে ধস নামার ঘটনাটি বৈশ্বিক আর্থনীতিক অপপরিস্থিতিরই বহিঃপ্রকাশ। এই সময়ে সৎব্যবসায়ীরা অসৎ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে। মজুতদারি, কালোবাজারিরর মাধ্যমে অনেকেই প্রচুর বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে সমরেশের মামা ভবানী অবৈধ অর্থ উপার্জন করেছে এবং অর্থের দাপটে সে তিনটি বিয়ে করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একারণে সে মনেপ্রাণে প্রত্যাশা করছে – যুদ্ধ বিলম্বিত হোক। 'যে যুদ্ধ মানবজীবনকে আর্থনীতিক ও মানসিক পরমতম বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে; অর্থলোভী ব্যবসায়ীরা (এখানে ভবানী) তাদের মুনাফাবৃত্তির জন্যে সে অমানবিক যুদ্ধকেই প্রত্যাশা করে এবং তার জন্য প্রতীক্ষা করে – মানব ও অর্থনীতি সম্পর্কের দ্বৈরথই এখানে অভিব্যক্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বার্থলোভী উন্মাতালতা মহিম চৌধুরীর (সমরেশের বাবা) পরিবারের আভিজাত্যকে যে নিপতিত করেছে, তা আমরা প্রত্যক্ষ করি সমরেশের বোনদের কোনরকম মানবেতর কাজ জুটিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ধনাঢ্য জমিদার বা ব্যবসায়ী পরিবারিকভাবে বাণিজ্যিক কুটজালে বিত্তহীন শ্রমজীবী পরিবারে রূপান্তরিত হয়ে পড়তে পারে – মানব ও সমাজ-অর্থনীতি সম্পর্কের সে আন্তঃরহস্য আমরা *শুভ/শুভ* উপন্যাসটির মধ্যে প্রতিফলিত দেখি।'[১]

উপন্যাসে সমরেশ, কুমার ও নন্দিতার সম্পর্ক অতিঘনিষ্ঠ। 'মানিক দেখিয়েছেন, বন্ধুত্ব যে সর্বদা বিয়ের মধ্য দিয়ে অনিবার্য পরিণতি অর্জনসহ সার্থকতা লাভ করবে তা নাও হতে পারে। অন্য পুরুষকে বিয়ে করার পরও একাধিক পুরুষের সঙ্গে নারীর বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকার মধ্যে নেই কোনো অস্বাভাবিকতা, অনৈতিকতা কিংবা অসম্ভ্যবতা।'[২] এ কারণে সমরেশের চেয়ে নন্দিতা দু-বছরের বড়ো হলেও তাদের বন্ধুত্বে বাধা সৃষ্টি হয়নি। একপর্যায়ে নন্দিতা সমরেশের মামা ভবানীকে বিয়ে করলেও মামি–ভাগ্নের বন্ধুত্বের সম্পর্কে চিড় ধরেনি।

ভবানীর তিন স্ত্রীর মধ্যে নন্দিতা উচ্চ শিক্ষিতা ও সমাজসচেতন নারী। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার রয়েছে স্বচ্ছ ধারণা। সে প্রবলভাবে আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী। কুমারের সঙ্গে প্রেমসম্পর্ক থাকার পরও নতুন যুগের মেয়ে

---

১. রহমান হাবিব, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ-৯৪
২. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৩০

নন্দিতা বিপত্নীক ভবানীকে বিয়ে করে। তার ধারণা যে, শুধু দেহের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নেই, আবার শুধু মন দিয়েও প্রেম হয় না। স্বামী-সংসারে সতীন অণিমাকেও সে গ্রহণ করেছে স্বাভাবিকভাবে। সরমা, নন্দিতা, অণিমা – এই তিন মামিই সমরেশকে অর্থপ্রদানের জন্য ভবানীকে অনুরোধ করেছে।

নন্দিতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য সৃষ্টি। সে শিক্ষিত, স্বাধীনচারী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ও ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। তার জীবনসম্পর্কিত ভাবনাও অনেকবেশি আধুনিক। সে তার স্বামীর ভোগস্পৃহার কাছে নিজের স্বাধীন সত্তাকে কখনোই জলাঞ্জলি দেয়নি। অর্থের জন্য ভবানীকে বিয়ে করলেও সে স্বামীসৃষ্ট শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে কখনো বন্ধুগৃহে, কখনো কলকাতায়, আবার কখনো বা পাটনায় গিয়ে অবস্থান করেছে। সতীন অণিমাকেও সে নিজের উদারতায় আপন করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমরেশের সঙ্গে তার যে কথোপকথন তা লক্ষণীয় :

> সতীনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?
>
> নন্দিতা হাসে।
>
> শুধু দেখা হওয়া? একবেলায় গলায় গলায় ভাব হয়েছে। বেশ চালাক-চতুর কিন্তু বড্ড বেশি মেয়েলি ভাব। সেটা এক হিসাবে ভালোই হয়েছে, তোমার মামার বড়ো ভালো লেগেছে। আমি যেচে গিয়ে ভাব করেছি বলে কী খুশিই যে হয়েছে তোমার মামা!
>
> সমরেশ দিশেহারার মতো প্রশ্ন করে, তোমার একটু হিংসা হল না, রাগ হল না, অপমানবোধ হল না –?
>
> চেয়ারে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে বসে নন্দিতা বলে, তুমি বুঝবে না। আমি যেন বেঁচেছি। তোমার মামাও বেঁচেছে। আমি একেবারে জন্মের মতো ত্যাগ করিনি জেনে যে কী আনন্দ ভদ্দর লোকের! ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, ওর সেকাল-একাল মেশানো মেয়েলি-মার্কা বউটাকে যেচে ডেকে এনে ভাব করলাম – মামা তোমার বর্তে গেছে।[১]

উপন্যাসে সমরেশের বোন প্রণতি জীবনের তাগিদে ঘর থেকে বাইরে যেতে বাধ্য হয়। সে পোস্ট অফিসের চিঠি বিলি করে উপার্জনের চেষ্টা করে। প্রণতির এই কর্মোদ্যোগ প্রসঙ্গে প্রশংসা করে 'নন্দিতা জোর দিয়ে বলে, প্রণতি চাকরি করছে, স্রেফ চাকরি করছে। আমি স্বামীর দাসীত্ব করি, আমার চেয়ে ওর বেশি সম্মান প্রাপ্য।'[২] উপন্যাসে প্রীতি ও প্রণতির মতো সংগ্রামী জীবনের পথ বেছে নিয়েছে। কুমারের বোন সুমিত্রা

---

১. *শুভাশুভ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

২. *শুভাশুভ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

সামাজিক সংস্কার জলাঞ্জলি দিয়ে জনৈক পরলোকগত ভদ্রলোকের শিশুপুত্র-কন্যাদের লালন-পালনের দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক বিরূপতায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবনযাপনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা মানিক শুভাশুভ উপন্যাসে বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করেছেন। এই যুদ্ধের প্রভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কীভাবে পড়েছে তাও ঔপন্যাসিক অসামান্যতার সঙ্গে প্রদর্শন করেছেন।

পরাধীন প্রেম

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পরাধীন প্রেম* (১৯৫৫)[১] মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত নরনারীর প্রেমসমস্যা অবলম্বনে রচিত। এটি তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস। নরনারীর প্রেম যে স্বাধীন নয়, বরং তা যে সমাজের নানা নিগড়ে বাঁধা তা এ-উপন্যাসে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র সাপেক্ষে মানিক উপস্থাপন করেছেন। বিনয়-বকুল, অনিল-কান্তা, অজিত-উমা, কার্তিক-পাঁচীর প্রণয়সম্পর্ক, মিলনাকাঙ্ক্ষা কিংবা বিচ্ছেদ- বেদনা অঙ্কনসূত্রে মানিক দেখিয়েছেন প্রেম সমাজসাপেক্ষ ও পরাধীন।

পরাধীন প্রেম উপন্যাসের শুরুতেই রয়েছে বিনয়-বকুলের প্রসঙ্গ। বাল্যবেলা থেকে এরা পরস্পরের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ। বকুলের বড়োবেলায় যখন বিনয়ের সঙ্গে বকুলের বিয়ের প্রস্তাব আসে, তখন বিনয় এই বিয়েতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। কারণ, সে বকুলকে ছোটবোনের মতোই স্নেহ করে। কিন্তু বিয়ের দিনকয়েকের ব্যবধানে বকুল বৈধব্যবেশে পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন করলে তার প্রতি নতুন পরিসরে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে বিনয়। তার কেবলই মনে হয়, বকুলের এ পরিস্থিতির জন্য সে নিজেও অনেকাংশে দায়ী। কারণ প্রথমাবস্থায় বকুলকে বিয়ে করলে হয়তো তার অবস্থা হতো না। ফলে সে বকুলের প্রেমপ্রত্যাশী হয়, বকুলও সম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু তাদের এ সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে বকুলের বড়ো বোন মুকুল ও পিসি। ঔপন্যাসিক তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকতার ধরন প্ররিবেশন করেছেন এভাবে :

> বকুলের মা গুম খেয়ে ঠাকরঘরে ঢোকে।

---

১. গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক থেকে *পরাধীন প্রেম* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একত্রিশতম উপন্যাস। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালের মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২)। এর প্রকাশক রিডার্স কর্নার, কলকাতা। ১৯৫১ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে 'অনন্যা' পত্রিকায় 'বাস্তবিক' নামে একটি উপন্যাসের তিনটি কিস্তি মুদ্রিত হয়েছিল। এই তিন কিস্তির ঘটনাংশের সঙ্গে পরাধীন প্রেম উপন্যাসের কিছু মিল লক্ষ করা যায়।

পিসিমা আঁতকে উঠে কাতরাতে থাকে, বারবার মিনতি করে শুধু বলতে থাকে যে এবার তাকে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হোক! আর নয় – এই ঘোর কলিতে আর সংসারে থাকা নয় – ইহকাল তো গেছেই, পরকালটাও যাবে এবার!

মুকুল একেবারে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করে।

ঠিক পাগলামির মতো করতে থাকে হঠাৎ যেন বিশ্রীরকম হিস্টিরিয়ার প্রচণ্ড আক্রমণ ঘটেছে।

বিশ্রীরকম চেঁচামেচি শুরু করে, বকুলকে গালাগালি আর অভিশাপ দিয়ে সে আর কিছু রাখে না – তারপর আঁশবটি নিয়ে বকুলের গলা কাটতে যায়।

বিয়ে করার সাধ গেছে? আয় তোর গলা কেটে ফাঁসি গিয়ে দুজনেই মিলেমিশে জ্বালা জুড়োই।[১]

নিকটাত্মীয়দের এই বাধাদানের এ-পর্যায়ে একদিন শ্বশুর বাড়ি থেকে একটি পার্সেল আসে বকুলের কাছে। সেখানে ছিল তার দেবর ও উকিলের চিঠি। চিঠির মাধ্যমে বকুল জানতে পারে, তার স্বামীর রেখে যাওয়া সহায়-সম্পদ, বাড়ি, জোত-জমিতে তারও অংশ আছে। এ-তথ্য অবগত হয়ে বকুল অধিক সুখের প্রত্যাশায় বিনয়কে প্রত্যাখ্যান করে, এবং প্রয়াত স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

পরাধীন প্রেম উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনিল বাস্তববাদী ও সংস্কারমুক্ত। সহপাঠী কান্তাকে সে ভালোবাসে। আট বছর বয়সে কান্তার বিয়ে হয় মাতাল অঘোরের সঙ্গে। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর সে লেখাপড়া করে জীবনকে নতুন করে নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়, এবং অনিলের প্রতি প্রেম নিবেদন করে। এ-পর্যায়ে অনিল-কান্তার কথোপকথন ছিল এরকম :

অনিল হাসিমুখে বলে, ... স্কুল-কলেজে ক-বছর তোমায় ফার্স্ট করেছি – এবার থেকে সারা জীবন সব ব্যাপারে তোমার ফার্স্ট করে রাখবো।

কান্তাও হাসে।

সায় দেওয়ামাত্র ভাষা ফুটল? এতকাল কী করে চুপ করেছিলে তুমি!

অনিল হেসে বলে, কোনো দিন একটু আমল দিয়েছ? ভয় হত, মুখ ফুটে কিছু বললে হয়তো মেলামেশাই বন্ধ করে দেবে।

খুব বিশ্রী ব্যবহার করে এসেছি?

বিশ্রী বলা যায় না – শক্ত নীরস ব্যবহার। অন্য কেউ সহ্য করত কি না জানি না।

কান্তা তার হাত চেপে ধরে।

---

১. *পরাধীন প্রেম*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

এবার থেকে খুব মিষ্টি ব্যবহার পাবে। বুঝতে তো পারো, কতকাল নিজেকে সামলে এসেছি? হয়তো যতটা দরকার নয় তার চেয়ে বেশি শক্ত হয়েছিলাম। অত হিসাব কি কষতে পারে মানুষ?

কান্তা মিষ্টি করে একটু হাসে।

অনিলের হাত ধরাই থাকে তার হাতে।[১]

কান্তা প্রতিবাদী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। তার মধ্যে রয়েছে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা। সধবা হয়েও সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে সে মদ্যপ স্বামীর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়েছে; অসংকোচে সংযমের প্রাচীর ভেঙে নিজেকে অনিলের কাছে সমর্পণ করেছে। একপর্যায়ে দুজনই যখন বিয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তখনই অনিলের যক্ষ্মা রোগে আক্রান্তের সংবাদে তারা পিছিয়ে পড়েছে। একদিকে অসুস্থতা, অন্যদিকে সংসারের নানা টানাপড়েন ও কর্তব্যবোধের কারণে তাদের প্রেমাবেগ শেষাবধি সার্থক হয়ে ওঠেনি।

উপন্যাসে অজিত ও উমার প্রেমসম্পর্ক ও ব্যর্থতার প্রসঙ্গও বৈরী সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত করে চিত্রিত করেছেন মানিক। উমা চরিত্রটিকে মানিক আধুনিক নারীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের উপযোগী করে চিত্রিত করেছেন। অজিতকে প্রেমনিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়েও সে বিচলিত হয়নি, বরং সে কৌশলে অজিতকে ব্যবহার করেছে, লেখাপড়ার খরচ আদায় করে নিয়েছে। অবশেষে তার মাধ্যমে নিজের জন্য একটা ভালো চাকরিও সে বাগিয়ে নিয়েছে । চন্দ্রনাথের ওপর চাপ প্রয়োগ করে উমার এ চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে অজিত। অতঃপর উমা তার চেয়ে কম বেতনের আনন্দময়কে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বাধ সেধেছে তারই অফিসের কর্তা চন্দ্রনাথ। তিনি উমাকে বলেন : উমাকে বলে–

এখন তোমার চাকরিগত প্রাণ – তোমার চাকরির ওপর সংসার নির্ভর করছে। চাকরি ছাড়া তোমার অন্য ইন্টারেস্ট নেই, অন্য চিন্তা নেই। চাকরে একজনের সঙ্গে বিয়ে হলে তোমার জীবনে অন্য ইন্টারেস্ট আসবে, মনে অন্য চিন্তা জাগবে। চাকরির মায়াও তোমার কমে যাবে – তোমার চাকরি থাক বা না থাক, আর একজনের তো থাকছে!

উমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবে।

চন্দ্রনাথ মিষ্টি সুরে বলে, খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে আমাকে? কিন্তু কি করব বল – এটাই আমার প্রিন্সিপ্‌ল। আপিসের ব্যাপারে আমি কোন সেন্টিমেন্টের ধার ধারি না, এ ক্ষেত্রে ওসব হিসাব আমার কাছে বাতিল। কারুর জন্য আমি এ নিয়মের এদিক-ওদিক করব না, নিজের বাপ-ভাই-বউ-ছেলে-মেয়ের খাতিরেও নয়।[১]

---

১. *পরাধীন প্রেম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

বিয়ে করলে চাকরি ছাড়তে হবে – কর্তৃপক্ষের এমন শর্তে অবশেষে উমা বিয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। উমার এই সিদ্ধান্ত আনন্দময়ও নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয় :

> আনন্দময় চিরদিন চুপচাপ। উমা যা বলেছে যা ঠিক করেছে তাই সে মেনে নিয়েছে।
> বিয়ে করে নিজের একটা সংসার পাতার বদলে, চাকরি করে গিয়ে বাপ-ভাইয়ের সংসারটা চালিয়ে যাওয়াই শেষ পর্যন্ত উমা স্থির করবে, এটাও যেন তার জানাই ছিল।
> বিনা প্রতিবাদে সিদ্ধান্তটা সে মেনে নেয়। উমার সঙ্গে পাঁচ মিনিট তর্কও করে না।
> শুধু বলে, চাকরি ছাড়া কি চলে? বিয়ের গণ্ডগোল বাধিয়ে চাকরি ছেড়ে কাজ নেই। তুমি আমি যেমন চালিয়ে যাচ্ছি তেমনই চালিয়ে যাই এস। তারপর দেখা যাবে।[২]

অপরদিকে কার্তিক-পাঁচীর প্রণয় কাহিনিতে নিম্নবিত্ত পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। পাঁচী যেহেতু বিধবা ছিল সেহেতু তার সঙ্গে বিয়েতে কার্তিকের মায়ের প্রবল আপত্তি ছিল। তিনি ছিলেন সংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু কোনো সংস্কারই পাঁচীর সঙ্গে কার্তিকের বিয়েতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মায়ের মৃত্যুর পর তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। বিনয়-বকুল, অনিল-কান্তা, অজিত-উমা যা পারেনি, তা-ই পেরেছে কার্তিক-পাঁচী। মধ্যবিত্তের সংশয়, পিছুটান কিংবা স্বার্থপরতার বিপরীতে প্রণয়সম্পর্কের প্রতি নিম্নবিত্তের এই সাহস কিংবা সদিচ্ছা মানিক এ-উপন্যাসে কার্তিহ-পাঁচীর পরিণয়সূত্রে প্রদর্শন করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাংলার জীবন ও সমাজব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, মানব-মনস্তত্ত্বে যে অভূতপূর্ব বিবর্তন সাধিত হয়েছে তা *পরাধীন প্রেম* উপন্যাসে মানিক শিল্পমূল্য অর্জন করেছে।

মাশুল

মানিকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ উপন্যাস *মাশুল* (১৯৫৬)[১]। এ-উপন্যাস রচনাকালে চিকিৎসাতীত ব্যাধিতে আক্রান্ত মানিকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পুরোপুরি সুস্থ ছিলো না। হয়তো এই কারণেই

---

১. *পরাধীন প্রেম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

২. *পরাধীন প্রেম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

উপন্যাসটি পূর্ণতা লাভ করেনি। তথাপি *মাশুল* উপন্যাসে নর-নারীর বৈচিত্র্যময় জীবনচিত্র অঙ্কনে মানিকের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট।

উপন্যাসে সাধন ও রানি প্রতিবেশী। তারা উভয়েই প্রেমসম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এ প্রণয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তারা দুজনেই বিষপানে আত্মহননের পরিকল্পনা করে। রানি 'বাপের কৌটা থেকে ভরি দেড়েক আফিম নিয়ে আর মোড়ের দোকান থেকে কালো খয়ের কিনে এনে সমান সাইজের দুটি বড়ি বানিয়ে সঙ্গে নেয়।'[২] সাধনের প্রতি রানির অকৃত্রিম মমত্ববোধের কারণে সাধনের জীবন বাঁচিয়ে দিয়ে সে নিজেই আত্মহননের পরিকল্পনা করে। কিন্তু আফিমের বড়ি ও কালো খয়েরের বড়ি পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে রানি ব্যর্থ হয়। ফলে তার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশ স্মর্তব্য :

> বিষ খেয়ে শুয়ে পড়ার চরম কীর্তিটা তার যে বেশি রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়নি সেটাও অনুমানের ব্যাপার নয়। তাগিদটা ছিল রানির, অনেক আগে থেকেই বুক কাঁপছিল, মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল – প্লান করা দুর্ঘটনার এত উদ্বেগ-উত্তেজনা আর রোমাঞ্চকর ভয়-ভাবনা কত আর সহ্য হয় এতটুকু মেয়ের? হায়! কে জানত মাথা গুলিয়ে যাবার এমন মারাত্মক ফল দাঁড়াবে – আফিমের বড়ি আর কালো খয়েরের বড়ি এমন ভাবে রানি গুলিয়ে ফেলবে। ... রানি জানত, এতগুলি আফিম গেলার ফলে তার ঝিমোনি আসবে তাড়াতাড়ি, কিছুক্ষণের মধ্যে গাঢ় ঘুমে অবশ হয়ে যাবে সবকিছু – সে ঘুম আরও গাঢ় হতে হতে একসময় সব শেষ হয়ে যাবে, আর সে জাগবে না কোনোদিন।
>
> কিন্তু ওরকম কিছুই তো ঘটে না। মুখটা শুধু বিশ্রী রকম তিতো লাগে আর বমি পায়। সাধনের রকমসকম বরং খাপছাড়া মনে হয় – খানিকটা কালো খয়ের খাওয়ার জন্য মোটেই এরকম হওয়াটা উচিত নয়। ক্রমে ক্রমে লক্ষণগুলি স্পষ্টতর হতে থাকে। গলায় একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার করে সাধন বলে, তুমি না বলেছিলে, কোনো কষ্ট হবে না? শুধু ঝিমিয়ে যাব – ঘুমিয়ে পড়ব? এমন ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে কেন আমার?

---

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস *মাশুল*। এটি ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (আশ্বিন ১৩৬৩) প্রকাশিত হয়; প্রকাশক : সাহিত্য জগৎ, কলকাতা। *মাশুল* গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক থেকে মানিকের তেত্রিশতম উপন্যাস।

২. *মাশুল*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালের ছয় উপন্যাস*, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুময় পাল সম্পাদিত, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : মার্চ ২০১৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

প্রথমটায় রানি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। দুচোখ বড়বড় করে সে প্রায় ভুত দেখার মতোই সাধনের রকমসকম লক্ষ্য করে। বড়ি বদল করে ফেলার সহজসরল ব্যাখ্যাটা কিছুতেই যেন তার মাথায় ঢুকছে না। বমি করে কালো খয়েরগুলি উগরে ফেলে দিয়ে সে যেন সংবিৎ ফিরে পায়।[১]

এটি রানির অনিচ্ছাকৃত ভুল হলেও সাধন তাকে ক্ষমা করতে পারে না। সে রানির প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘদিন পরে সাধনের মন থেকে এ সন্দেহ দূর হয় এবং রানির বৌদি মমতার ঐকান্তিক মধ্যস্থতায় পরিসমাপ্তি ঘটে তাদের সম্পর্কের টানাপড়েন। ভজহরির স্ত্রী বালার উদ্দেশে রানি বলে :

তুমি তো সবই জানোই – আয় কম বলে বিয়েটা খালি পিছিয়ে দিচ্ছিল। তারপর বোম্বেতে ভালো একটা চাকরি বাগিয়েছে – বিয়েটা স্থগিত করে মানুষটা একাই সেখানে ভাগবার ফিকিরে ছিল। এতদিন কিছু প্রকাশ করেনি – হঠাৎ জানিয়েছে কদিন বাদে রওনা হয়ে যাবে। বলে কিনা চাকরিতে ধাতস্থ হয়ে ছুটি নিয়ে এসে বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে দেবে।[২]

মাশুল উপন্যাসে লেখকের মধ্যবিত্ত জীবনাভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত মানসের প্রতি তিনি এ উপন্যাসে অনেকবেশি সহানুভূতিশীল। সাধনের চিন্তায় তা স্পষ্ট :

সাধন তাই ভাবে – এজন্যই কি ভাঙন ধরেছে মধ্যবিত্তের উঁচুনিচু দুই স্তরেই, জীবন বিশ্রী রকম নীরস জটিল আর উদ্দেশ্যহীন হয়ে গেছে! – তারা অন্যায় করে আর অন্যায় সয়ে যায় বলে? কিন্তু সে কথা তো সত্য নয়! মধ্যবিত্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, জেল খেটেছে, গুলি খেয়ে মরেছে – অন্য শ্রেণির মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবার প্রেরণা এবং চেতনাও জাগিয়েছে। অথচ এদিকে মধ্যবিত্তের কত বড়ো অংশ সেকেলে সংস্কারের পচা বদ্ধ নালায় আটকে রয়েছে, কত বড়ো অংশ তলিয়ে আছে অশিক্ষার অন্ধকারে।[৩]

উপন্যাসে কোনো কোনো উপ-কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যে ফ্রয়েডের মনোবিকলনতত্ত্বের প্রয়োগ রয়েছে; কিন্তু তা অনেকাংশে অগোছালো। উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে রানির জীবনের 'ভুলের মাশুল'-এর কারণে উপন্যাসের

---

১. *মাশুল*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালের ছয় উপন্যাস*, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুময় পাল সম্পাদিত, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, মার্চ-২০১৮, পূর্বোক্ত, পৃ-২৮২-২৮৩

২. *মাশুল*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, *উত্তরকালের ছয় উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫

৩. *মাশুল*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*,*উত্তরকালের ছয় উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

নামকরণ *মাশুল* যথোপযুক্ত বলেই মনে হয়। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের জীবনাচারের সঙ্গে পাঠক নামকরণের মিল নাও পেতে পারেন বলে মানিক আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন :

> একটা ভুল করে বসলে তার মাশুল দিতে হয়। এটা সংসারের অতিসাধারণ নিয়ম। কিন্তু শুধু ভুলেরই কি মাশুল দিতে হয়? মাশুল গোনাই যেন মূলনীতি জীবনযাত্রার। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনের বা প্রৌঢ় বয়সে, বার্ধক্যে পর্যন্ত। প্রত্যেক জীবনের আদি এবং অন্ত মিলিয়ে মিশিয়ে প্রত্যেক জীবনের হিসাব-নিকাশ। তার মধ্যে ফাঁকি নেই। প্রশ্নটা নিয়মনীতি নিয়ে। কেন এমন হয়, কেন অমন হয়! কে তা সঠিক বলতে পেরেছে, কারো সঠিক জানা নেই। কেউ ভালো ভালো কথা বলে, কেউ গভীরে তলিয়ে বলে তথাকথিত দামী দামী কথা – যা বহুদিন পর্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে থাকে মানুষের। একদিন দেখা যায়, যা ছিল বহুদিন ধরে অত্যন্ত সঠিক সেটা মিথ্যা হয়ে গেছে – বেঠিক নিয়মনীতি মানতে চেয়ে মানুষকে দিতে হচ্ছে দুঃখ বেদনা গ্লানি অনুতাপের মাশুল।[১]

মানিকের বিভিন্ন রচনার মতো এ উপন্যাসেও তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা স্পষ্ট। কোনো মানুষের একটি ভুলের কারণে জীবনভর তার মাশুল গুণতে হয় – এ চিরন্তন সমাজসত্যই এ উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান

মানিকের *প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান* (১৯৫৬)[২] হালকা ধাঁচে লেখা উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রাণেশ্বর। সে বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীরাম নাথ দেবশর্মার একমাত্র ছেলে; পরপর তিনকন্যা সন্তানের পর প্রাণেশ্বরের জন্ম হয়। জন্মলগ্নেই সে তার মা সরলাকে অনেক কষ্ট দেয়। 'প্রাণেশ্বরকে জন্ম দিতে হয় কলকাতার শ্রেষ্ঠ হাসপাতালে, মা হওয়ার মুশকিল সামলাবার ওয়ার্ডে। মাকে তিন দিন তিন রাত্রি ভুগিয়ে প্রায় মেরে ফেলে আমাদের উপাখ্যানের শ্রীমান রাত একটা নাগাদ ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সরলার জ্ঞান ছিল না। অজ্ঞান অবস্থাতেই সরলাকে প্রসবাগার থেকে আনা হয়েছিল তার বেডে।'[৩] সরলার পাশের বেডেই কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছিল

---

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'লেখকের বক্তব্য', (দ্রষ্টব্য : নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সমাজজিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৯৯, পৃ. ১৪৮

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পর প্রকাশিত হয় *প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান*। প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৫৬ (অগ্রহায়ণ ১৩৬৩); প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক থেকে এটি মানিকের চৌত্রিশতম উপন্যাস।

৩. *প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান*, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুময় পাল সম্পাদিত, *উত্তরকালের ছয় উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯

সমরের স্ত্রী মণিমালা। এই মণিমালার চেষ্টায় প্রাণেশ্বর সেদিন প্রাণে বেঁচে যায়। আর সেইসূত্রে প্রাণেশ্বর মণিমালাকে মণিমা বলে ডাকে।

এ উপন্যাসের কাহিনিবয়নে মানিকের সৃজনশীলতা বিশিষ্টতাবোধে উজ্জ্বল হতে পারেনি। 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান এই দুই পরিবারের নানা সুখ দুঃখের কাহিনি। তবে কাহিনিটি শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক অগ্রসর হতে পারেনি। হঠাৎ সমাপ্তি টানা হয়েছে। উপন্যাসের গ্রন্থনও অসংলগ্ন। মানিকের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। প্রাণেশ্বরকে কেন্দ্র করে তিনি কতকগুলি উদ্দেশ্যহীন চরিত্রের আমদানি করেছেন। তাও তিনি সুসমাপ্ত করতে পারেন নি।'[১]

উপন্যাসের চরিত্রসৃজনের মধ্যেও এক ধরনের শৈথিল্য রয়েছে। তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ অবয়বে চিত্রিত করা হয়নি। '*প্রাণেশ্বরের উপাখ্যানে* নায়ককে বিশিষ্টতা দেবার চেষ্টা কার্যকর হয়নি। ক্বচিৎ তার মধ্যে বিদ্রোহী ভাব, কখনো শিশুসুলভ ভাবালুতা (মণিমালার প্রতি) আবার মানসিক অস্বাভাবিকতার ঝোঁক। কিন্তু সব মিলে কিছু হয়ে ওঠেনি। ব্যক্তিত্বময়ী রূপসী ইন্দ্রাণী, মণিমালা, স্বাধীনচেতা রানী, হাতুড়ে শ্যামাদাস, মণিমালার পাগলাটে ভাব সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিশিষ্ট রচনা হয়ে উঠল না। লেখকের নিঃশেষিত শক্তির দ্যোতক হয়ে রইল। ইন্দ্রাণী-প্রাণেশের অস্ফুট প্রণয় এতই নিরুচ্চার যে, মনে হয় লেখক মনস্থির করতে পারেন নি।[২]

এ উপন্যাসে প্রাণেশ্বরের পরামর্শে তার বোন রানী যক্ষা রোগাক্রান্ত পাত্রকে বিয়ে না করে অসবর্ণ পাত্রকে বিয়েতে রাজি হয়। '...সৌদামিনী বলে–'প্রাণেশ কি মিছেই এ বিয়ে ঠেকাতে লাফালাফি করেছে, পাগলামি করেছে? মহেন্দ্রর টি.বি হয়েছিল জানো না তোমরা? তিন বছর ভুগে বাপ দাদাকে ভুগিয়ে কত ছিকিচ্ছেয় সেরেছে। বোনকে বাঁচাতে গিয়ে অনেকের কাছে বদ হয়ে গেছে প্রাণেশ্বর।'[৩] বিয়ে সংক্রান্তে এ দুই ঘটনাই বহমান সামাজিক নিয়মরীতির বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা নারীর দ্রোহেরই প্রমাণ বহন করে। তবে, 'নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিন্যাসেই মৃদুলা ও চপলের বিয়ের প্রসঙ্গটি নতুনত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। চপলের দুরারোগ্য ব্যাধি এবং মৃদুলার সন্তান ধারণের অক্ষমতার কথা উভয়ে জেনেই পরস্পরকে বিয়ে করেছে। এমন সিদ্ধান্তের

১.সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪০

২.ক্ষেত্র গুপ্ত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯৯

৩. প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৯

মধ্যে প্রকৃত প্রণয়, সামাজিক রীতিনীতির আবেগ থেকে মুক্ত হয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও গভীর মনুষ্যত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে।'[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান* প্রসঙ্গে সমালোচকগণ নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন – মানিক এ-উপন্যাস রচনা না করলেও ভালো করতেন। আবার অনেকে মনে করেন তাঁর জীবিকার্জনের জন্য লিখে যেতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মানিকের সমসাময়িক লেখক ও সমালোচক প্রেমেন্দ্র মিত্রের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> ছেচল্লিশ বছরের জীবনে মানিক কম কিছু লেখেননি। *পুতুলনাচের ইতিকথার* মতো বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার মতো রচনা তাঁর মধ্যে যেমন আছে তেমনি এমন রচনাও হয়তো আছে নেহাৎ জীবিকার্জনের দায়ে প্রকাশকের হাতে যা তাকে অনিচ্ছায় তুলে দিতে হয়েছে। কিন্তু লেখার নিপুণ হাত বাইরের নানা কারণে যেখানে তাঁর শিথিল ও ক্লান্ত সেখানেও তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার দীপ্তি থেকে চাপা থাকেনি, এইটিই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে শুধু তাঁর স্রষ্টামনের অভিনব গড়নের জন্যে, যে গড়নের মধ্যে তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য উদ্ভাবনের তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আংশিক ব্যর্থতার রহস্য নিহিত।[২]

প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান শিল্পমানে কতটুকু সফল, সে-বিষয়ে কোনো বিতর্কে না জড়িয়ে শুধু একথাই বলা যায় যে, এ-উপন্যাসেও মানিক অনেকবেশি সমাজসংলগ্ন ছিলেন। সামাজিক নানা অসঙ্গতি নির্দেশে মানিক যে জীবনের শেষপর্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তা এ-উপন্যাসপাঠে অনুধাবন করা যায়।

মাটি-ঘেঁষা মানুষ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মাটি-ঘেঁষা মানুষ* (১৯৫৭)[৩] একটি অসমাপ্ত উপন্যাস। তাঁর মৃত্যুর পর *'পরিচয়'* পত্রিকার সম্পাদক সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন। সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে বলেছেন :

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪২

২. প্রেমেন্দ্র মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, তথ্যসূত্র : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্মশতবর্ষ*, উত্তরাধিকার, সম্পাদক-সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ॥ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা-৪৯৯, [উৎস : মানিক বিচিত্রা]।

৩." *মাটি-ঘেঁষা মানুষ* প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩৬৪)। কলকাতার ডি. এম. লাইব্রেরি এটির প্রকাশক। উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ। গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক থেকে এটি মানিকের পঁয়ত্রিশতম উপন্যাস এবং তাঁর মৃত্যুর পরে

প্রথমে মানিকবাবুর ইচ্ছে ছিল 'চাষির মেয়ে কুলির বৌ' নামে একটি বড় উপন্যাস লিখবেন। পরে তাঁর সে মতের পরিবর্তন হল। এবং তিনি স্থির করলেন 'চাষির মেয়ে' ও 'কুলির বৌ' নাম দিয়ে দুটো ছোট ছোট উপন্যাস লিখবেন। অবশেষে তাঁর সে মতও পাল্টে গেল এবং 'চাষির মেয়ে' পরিবর্তন করেও তিনি নতুন নামকরণ করলেন 'মাটি ঘেঁষা মানুষ'। 'মাটি ঘেঁষা মানুষ' সম্পূর্ণ করবার আগেই 'কুলির বৌ' এর একটিমাত্র কিস্তি তিনি লিখেছিলেন।'[১]

মাটি-ঘেঁষা মানুষ উপন্যাসে অঘোর চাষির মেয়ে রেবতী কীভাবে চাষিকন্যা থেকে নারীশ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে, তা-ই বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। রেবতী সাহসী; গ্রামের মেয়েদের তুলনায় তার আচার-আচরণ স্বতন্ত্র। গোবিন্দ নামের এক শিল্পশ্রমিক গ্রামে এসে সর্পদংশনে আহত হলে সে বিষ শুষে নেয় রেবতী। গ্রামীণ জীবন-পরিসরে একজন কুমারীকন্যার জন্য এ-ঘটনাটি দুঃসাহসের শামিল। সমাজ কিংবা বাপ-ভাইয়ের রক্ষচক্ষুকে উপেক্ষা করে রেবতী বিবেকতাড়িত হয়ে একাজ করেছে। নিজের জীবনের পরোয়া না করে সে দৃপ্ত প্রতিজ্ঞায় জেগে উঠেছে। কারণ –

মানুষটাকে সে বাঁচাবেই।
যে যাই বলুক আর যত শাসনই তার কপালে জুটুক।
কোনোদিকে না তাকিয়ে ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে সে প্রাণপণে রক্ত চুষে নিয়ে থুতু থুতু করে ফেলে দিতে থাকে।
রক্তের সঙ্গে যে বিষও আসছে সেটা সে টের পায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।
মুখের মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে জ্বালা বাড়তে থাকে।
কতক্ষণে সে তার দুঃসাহসী চিকিৎসা চালিয়ে যেত বলা যায় না, খানিক পরে রাজু এসে তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলে চিকিৎসা বন্ধ হয়।[২]

ঘটনাটি সাংবাদিকরা পত্রিকায় প্রকাশ করে। ফলে রেবতীবিষয়ক এ রোমাঞ্চকর খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। সে রাতারাতি এ অঞ্চলের মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে এ দুঃসাহসিক কাজের

প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি (ফাল্গুন ১৩৫৯) থেকে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় 'একটি চাষীর মেয়ে' নামে উপন্যাসটি অনিয়মিতভাবে মোট নয় কিস্তিতে বের হয়। এর নবম কিস্তি মুদ্রিত হয় ১৯৫৪ সালের নভেম্বরে (অগ্রহায়ণ ১৩৬১) তারপরেও এটি অসম্পূর্ণ থাকে। 'একটি চাষির মেয়ে'কে *মাটি-ঘেঁষা মানুষ* উপন্যাসের প্রথম খণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে এর দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে 'কুলির বৌ' রচনার পরিকল্পনা করেন লেখক এবং এর একটি মাত্র কিস্তি লিখে যেতে পারেন যা ছাপা হয় 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে (পৌষ ১৩৬৩)। (দ্রষ্টব্য : সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০)।

১। নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

২। *মাটি-ঘেঁষা মানুষ*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০

জন্য শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামীদের কাছে ব্যাপক প্রশংসা পায়। এসময় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মানবিক মনের অধিকারিণী রেবতী নামের এই কুমারী নারীকে সংবর্ধনা জানায়। তবে 'ওই রকম অভিভূত বিচলিত অবস্থাতেও একটা বিষয় খেয়াল করে রেবতী। শুধু তার প্রশংসাকীর্তন নয়, তাকে বড়ো করা নয় – তার কথা থেকে আসছে দেশের গরিব চাষাভূষো ঘরের মেয়েদের কথা, চাষিদের দুরবস্থার কথা, চাষির লড়াইয়ে মেয়েদের অংশ নেবার কথা।'[১]

রেবতীকে নিয়ে যখন শ্রমজীবী মানুষ প্রশংসায় উদ্বেলিত, চতুর্দিকে যখন তার জযজয়কার, তখন সে গ্রামের 'পিরিতকাতুরে বখাটে'দের লালসার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পরিবার-পরিজন তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। গ্রামের জমিদার প্রসন্নবাবুও হঠাৎ রেবতীর প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে তাকে 'ছ্যাঁচড়ার মত পালিয়ে' যেতে হয় মামাবাড়িতে। গ্রাম ছেড়ে চলে আসার আগে সেখানে সে সংগ্রামশীল চাষি-মজুরদের দলে যোগ দেয়। কিন্তু খাদ্যের জন্য গ্রাম থেকে সদরে যাওয়া চাষিদের আন্দোলনে সে যোগ দিতে পারে না। এ আন্দোলনে পুলিশের গুলি লাগে সন্তানসম্ভবা পদ্মার পেটে আর বুনো সাঁতরার বিধবা মায়ের বুকে। রেবতী আন্দোলনে অংশ নিতে না পেরে কষ্ট পায়।

মামাবাড়িতে সে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। ভাগচাষি ফণীর স্ত্রী এলোকেশীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আসার পর থেকেই মামি গিরি তাকে বেশ আদর যত্নে নিজের করে নিয়েছে । ইতোমধ্যে গোবিন্দের প্রতি রেবতী প্রণয়েচ্ছায় জেগে উঠেছে। এরকম পরিস্থিতিতে এতদঞ্চলে বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে। বানের জলে একাকার হয়ে যায় পুরা এলাকা :

> যেখানে যত নৌকা আর ডিঙি ছিল সব দিবারাত্রি লেগে যায় প্রাণ বাঁচানো আর প্রাণে বেঁচে থাকার উপকরণ বাঁচানোর কাজে। নৌকাই ঘরবাড়ি হয়েছে কত পরিবারের। বাঁশ আর তক্তা খাটিয়ে কত পরিবার আশ্রয় নিয়েছে গাছের ডালে।
>
> লক্ষ কোটি মানুষের ঘাড় ভাঙার অধিকার পাওয়া কিছু মানুষদের বিলাতি বিশেষজ্ঞ এনে অজস্র টাকা ঢেলে তৈরি করা বাঁধের হঠাৎ চুরমার হয়ে পড়ার বন্যা। সবাই জানত বিপদ আসছে। ভীষণ বিপদ। তাদের কপালে যে এত পরিকল্পনা করা বাঁধ ভাঙার বিপদ এমন আকস্মিক বন্যার রূপ নিয়ে আসবে কে তা ভাবতে পেরেছিল!
>
> জলে থই থই চারদিক।[২]

---

১. *মাটি-ঘেঁষা মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯

২. *মাটি-ঘেঁষা মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৬

এই দুর্দিনে রেবতীদের দেখতে তার মামাবাড়িতে আসে গোবিন্দ। এসময় মামি রেবতী-গোবিন্দের প্রণয়সম্পর্কের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে। কালবিলম্ব না করে মামা-মামী তিনদিনের মধ্যে তাদের বিয়ের বন্দোবস্তও করে ফেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যায় রেবতী-গোবিন্দ –

> এই বন্যায় বিয়ে?
>
> তিন দিন পরে যে বিয়ের শুভলগ্ন আছে সেই লগ্নে?
>
> রেবতী আর গোবিন্দ মস্ত একটা রুইমাছ রোয়াকে তুলতে গিয়ে অর্ধনগ্ন হয়ে, মাছটা তুলে রোয়াকে রেখে পরস্পরের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়ে, একটা অদ্ভুত রহস্যময় অদম্য প্রেরণায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল বলেই তিনদিনের মধ্যে বিয়ে ঘটিয়ে দিতেই হবে তাদের! এই থইথই বন্যায় পৃথিবী যখন ডুবে আছে?[১]

কিন্তু বিয়ের দিনক্ষণ-লগ্ন পেরিয়ে গেলেও গোবিন্দ আসে না; আসে 'অজানা একজন জোয়ান মানুষ'। সে জানায় কারখানার হাঙ্গামায় সে আটক হয়েছে। দিনকয়েকের ব্যবধানে জানা যায় আহত ও রক্তাক্ত গোবিন্দ হাসপাতালে, পুলিশের লাঠির ঘায়ে তার মাথা ফেটে গেছে। সুতরাং রেবতী-গোবিন্দের বিয়ে হয় না।

রেবতীকে আনতে তার দাদা মধু মামাবাড়িতে আসে। তারা রেবতীর বিয়ে ঠিক করেছে মদনের সঙ্গে। দিন দশেক পরে কোন শুভলগ্নে বিয়ে হবে বলে কিছু টাকা ধারও নিয়েছে মদনের কাছ থেকে। গিরি তার যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে – 'রেবতী বলে, না! মোকে খেদাসনে মামি, যাবার আগে এখানে বিষ খেয়ে মরব। গাঁয়ে কী করে মুখ দেখাব বল? ঘরে গঞ্জনা, বাইরে টিটকারি – রেবতী কেঁদে ফেলে।'[২] একপর্যায়ে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে নিরুপায় রেবতী চলে আসে শহরে, গোবিন্দের কাছে। যথারীতি তাদের বিয়ে হয়। শহরের বস্তিতে ধীর শান্ত রেবতীকে দেখে সে অবাক হয়। নতুন জীবন শুরু হয় শহরের বস্তিতে। গ্রামের মাটি-ঘেঁষা রেবতী শহরের বস্তিতে এসে ঘর গোছানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ-পর্যায়ে রেবতী-গোবিন্দের কথোপকথন :

> ... কলকাতায় এসে ঘরকন্না নিয়েই মেতে রইলি? এদিক-ওদিক ঘুরতে সাধ যায় না? জাদুঘর আছে, চিড়িয়াখানা আছে, গড়ের মাঠ আছে –
>
> রেবতী হেসে বলে, জানি জানি। কলকাতার ট্রাম-বাসও চলবে, ওসব দেখার জায়গাও টিকে থাকবে। বেড়াব না তো কী, বেড়ানোর চোটে অতিষ্ঠ করে তুলব তোমাকে। গোছগাছ করে নিয়ে বসি?
>
> গোবিন্দ বলে, তুই যে এরকম ধীর শান্ত হবি, আমি তা ভাবতেও পারিনি।
>
> রেবতী আবার মিষ্টি করে হাসে।

---

১. *মাটি-ঘেঁষা মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০

২। *মাটি ঘেঁষা মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫

গেরস্ত ঘরের মেয়েরা এমনিই হয়। তোমরা ব্যাটাছেলেরা তড়বড় করো, কোনো দিকে তাকাও না, রাস্তায় চলতে সাপের লেজ মাড়িয়ে দিয়ে ছোবল খেয়ে মরতে বসো – ওরকম হলে কি মেয়েদের চলে?[১]

মানিক এ উপন্যাসে রেবতীর কর্তব্যবোধের চিত্রাঙ্কনসূত্রে দেখাতে চেয়েছেন যে, নারী শুধু গৃহকোণে আবদ্ধ থেকে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলেও সুযোগ পেলে তারাও সংগ্রামী হয়ে উঠতে পারে। রেবতী তার জীবন বিকশিত করতে স্বল্প পরিসরের গ্রাম্য জীবন ছেড়ে শহর জীবনে পদার্পণ করে হয়ে উঠেছে সংগ্রামশীল। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হক বলেন :

শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামশীল বৈশিষ্ট্যই তাদের নির্ভীক করে তুলতে পারে, পারে তাদের অগ্রযাত্রাকে অন্তরায়মুক্ত করতে। এই সংগ্রামশীলতা শুধু তাদের নিজেদের ক্ষেত্রেই না, প্রভাব বিস্তার করে সমগ্র সমাজের ওপর। গৃহকোণের শৃঙ্খলে যুগ যুগ ধরে আবদ্ধ নারীও ওর প্রভাবে কখন যে গৃহসীমার বাইরে এসে নিজ শক্তির উন্মোচন ঘটায় নিজেও তা জানে না। ভীরু, নানা সংস্কারের শৃঙ্খলে বন্দি নারীর মধ্যে এই যে মুক্তিস্পৃহার জাগরণ তা সৃষ্টির মূলে সক্রিয় থাকে বৃহত্তর জীবনের সংগ্রামমুখর পরিবেশ। মানিক সমাজ ও ব্যক্তির মনোগত রূপান্তরের এই দ্বন্দ্বমূলক তাত্ত্বিক দিকটি সম্পর্কে প্রত্যয়ী ছিলেন।'[২]

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এগিয়ে আসা মানুষের ভিড়ে এখানকার জগৎ একেবারেই অন্যরকম; মানুষের জীবনভাবনাও বিচিত্র, বিস্ময়কর। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষ্যণীয় :

বস্তিতে বিদেশী মানুষদের ভিড়টা বড়ো বিস্ময়কর মনে হয় রেবতীর। ঘরে ঘরে নানা দেশের মেয়ে-পুরুষের ভিড়!

মাদ্রাজ, বোম্বাই, উড়িষ্যা, কর্ণাটক এবং আরো অনেক প্রদেশ থেকে শুরু করে পূর্ববাংলার ঢাকা, চট্টগ্রাম, আসামের মেয়ে-পুরুষ এই বস্তিতে ঠাঁই নিয়েছে।

উড়িয়ান রম্ভা এবং মাদ্রাজি সারদার সঙ্গে রেবতীর ভাব গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

ভাব করার জন্য কেউ যেন তারা ব্যস্ত নয়। কিন্তু যেটুকু ভাব জমায় তার আন্তরিকতা সম্পর্কে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

খুব সংযত – কিন্তু প্রাণখোলা মেলামেশা।'[৩]

---

১. *মাটি-ঘেঁষা মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭

২। সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

৩. *মাটি-ঘেঁষা মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮

এভাবে চাষিকন্যা রেবতী গ্রামজীবন থেকে ভালোবাসার টানে ছুটে আসে শহরের বস্তিতে। ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে সে নিজেকে একাকার করে ফেলে। নতুন পরিসরে সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে শুরু হয় তার সংগ্রামী নতুন জীবন; সংগ্রামের মধ্যেই সে প্রত্যক্ষ করে জীবনের আস্বাদ।।

শান্তিলতা

শহরতলির জীবনযাত্রা নিয়ে নির্মিত হয়েছে মানিকের *শান্তিলতা* (১৯৬০)[১] উপন্যাস। শহরতলির উদ্বাস্তু জীবনের খণ্ডাংশ এখানে বিন্যস্ত হয়েছে। শহরতলির এই মানুষগুলোর সামনে ডোবা পুকুর, বাঁশঝাড় বিলুপ্ত করে সেখানে গড়ে ওঠে ছোট ছোট দালানের কলোনি। নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে এ দালানগুলি অধিক মুনাফা লাভের আশায় দাঁড় করানো হয়েছে মাত্র। এখানে– 'পূর্ববঙ্গের একশ্রেণির গৃহত্যাগী, গৃহের জন্য উন্মাদ মানুষদের ঘাড় ভেঙে মোটা মুনাফা লুটেছে। এরা সব ধনী নয়তো অবস্থাপন্ন জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, চাকুরে– যে দামেই হোক একটা বাড়ির মালিক হয়ে গ্যাঁট হয়ে বসাটাই ছিল এদের স্বপ্ন, প্রথম প্রয়োজন। অনেকেই আবার বাড়ির একাংশে ভাড়াটে বসিয়েছে, অন্তত একখানা ঘরে, কিছু আয়ের জন্য। ভাড়াটেরা সব অল্প সঞ্চয় নিয়ে আসা উদ্‌বাস্তু।'[২]

অপর দিকে অর্থহীন উদ্বাস্তুদের স্থান হয়েছে বস্তির নিম্নস্তরে। লেখক বস্তিজীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে :

> অন্যদিন এমন সময় থেকেই রাস্তায় কলের জলে ভিড় জমাতে শুরু করে। সারিসারি নানান মাপের বালতি আর কলশি নিঃশব্দ মিছিল দাঁড়িয়ে যায়। বস্তির মেয়ে পুরুষরাই সংখ্যায় বেশি; বাবুদের বস্তিঘেঁষা নতুন কলোনি থেকেও দু-চারজন আসে। কলোনি থেকে রাস্তার কলে নিরুপায় হয়ে ধন্না দিতে আসে শুধু লুঙ্গিপরা, গেঞ্জি গায়ে বা গামছা-জড়ানো বেপরোয়া পুরুষরাই নয়, মাঝ বয়সি বিধবারাও আসে; মোটা থান পরনে, একেবারে কোরা অবস্থা থেকে একবারও ধোপ না দিয়ে মাঝে মাঝে সাবান কাচা করার ফলে একটা হলদে হলদে ময়লা রং পাকা হয়ে পড়ে গেছে। এদের স্তিমিত ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে গোড়ার দিকে কেমন একটু মায়া অনুভব করত বস্তির মজুর মেয়ে-পুরুষের দল।[৩]

এ উপন্যাসে শান্তিলতা ব্যক্তিত্বময়ী ও সংস্কারমুক্ত জীবনচেতনায় বিশ্বাসী। পিতার সংসার কিংবা স্বামী সুখেন্দুর সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে তার বলিষ্ঠতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। স্বামীর বর্বর নির্যাতন সহ্য করেও সে অকৃত্রিম

---

১. *শান্তিলতা* প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৬৭)। এর প্রকাশক সাহিত্য জগৎ, কলকাতা।

২. *শান্তিলতা*, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুময়পাল-এর ভূমিকা সম্বলিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালের ছয় উপন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩

৩. *শান্তিলতা*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকালের ছয় উপন্যাস, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৪৩

ভালোবাসায় তার মন জয় করতে সক্ষম হয়। শান্তিলতার বুদ্ধিমত্তার কারণে সুখেন্দুর জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। সে তার কারখানার মালিকের অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয় এবং প্রতিফলে লাঠির আঘাতে তার মাথা ফেটে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। শ্রমিক সহদেবের মাধ্যমে শান্তিলতা এ সংবাদ জানতে পারে। লেখক শান্তিলতার সেদিনের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শান্তিলতা শোনে সব কথা। বিকালে আজ আবার স্নান করেছে, তোরঙ্গ খুলে অনেকদিন পরে ফুলশয্যার নীলাম্বরীখানা পরেছে কী ভেবে কে জানে! পুষ্পর মাকে ডাকিয়ে এনে যত্ন করে চুল বেঁধেছে , খোঁপায় দিয়েছে বেলীফুলের মালা। লম্বা সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর দিয়ে গেছে পুষ্পর মা, কপালে বড়ো একটা কুমকুমের টিপ।...স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তিলতা। দূর থেকে রাস্তার গ্যাসের আলো এসে পড়ে তার শান্ত কঠিন কালো মুখে। জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে কুমকুমের টিপ, চওড়া সিঁথি।[১]

উপন্যাসে ইয়াকুব আলি নামের এক শ্রমিক নেতার প্রসঙ্গ রয়েছে। ইয়াকুব সুখেন্দুকে সামষ্টিক মঙ্গলের পথ দেখায়। বিষয়টি সুখেন্দুকে ভাবিয়ে তোলে :

> নতুন ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছে তার মাথায় ইয়াকুব আলি। পোড় খাওয়া মানুষ। মজদুরের ছেলে। বিশ বছর ধরে লড়ছে। মজদুরের নেতা। এই পঞ্চাশ বছর বয়সেই মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে তার।
> সুখেন্দু ভাবতে চায়। ইয়াকুব সাহেব মানুষটা খাঁটি। দিলটা সাচ্চা, বাজে কথা বলেনি। সব মানুষের সুখের কথা বলেছে। সব অ-সুখের মূলটা কোথায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।[২]

প্রকৃতপক্ষে মানিক-মানসে যে মার্কসীয় দর্শনের চিন্তাচেতনা বহমান ছিল, তা তিনি সুযোগ পেলেই প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

---

১. *শান্তিলতা*, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৭৩-৪৭৪

২. *শান্তিলতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত সমকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

সময় ও সমাজের পরিবর্তমান প্রেক্ষাপটে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) শিল্পদৃষ্টির বিবর্তন, বিস্তৃতি ও বিকাশের প্রসঙ্গ বিবেচনাযোগ্য। আধুনিক রূপান্তরশীল জীবনের বিচিত্র সমস্যা ও সংকটের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়োজনে তিনি বরাবরই তাঁর উপন্যাসের ঘটনাংশ নির্বাচন করেছেন। বৈজ্ঞানিক জীবন-জিজ্ঞাসায় চালিত হয়ে তিনি সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায়ে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বকে জীবনের নিয়ামক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করলেও শেষপর্যায়ে মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে তিনি মানবমুক্তির অনিবার্য অভিজ্ঞানরূপে বিবেচনা করেছেন। সাহিত্যজীবনের শুরু থেকে তাঁর অন্তর্সত্তায় কার্যকর ছিল ভাব-বিলাসিতার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ শিল্পসাধনার প্রতিশ্রুতি; ছিল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃত্তাবদ্ধ শিল্পী ছিলেন না। বিজ্ঞানদৃষ্টি তাঁর রচিত কথাসাহিত্যের গতিনির্দেশ করলেও তিনি বরাবরই মানবজীবনকে বিচার করেছেন কালধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে। এজন্য তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়ে এসেছে লক্ষণীয় পরিবর্তন। লেখক-জীবনের প্রথম পর্যায়ে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের লিবিডো-তত্ত্বকে চরিত্রপাত্রের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিরূপে বিবেচনা করলেও উত্তরকালে মার্কসীয় জীবনবীক্ষা তাঁর জীবনসম্পর্কিত বিশ্বাসে যুক্ত করে ব্যাপক পরিবর্তন। তাঁর এই পরিবর্তিত জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে উত্তরকালের কথাসাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তায় বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সক্রিয় ছিল মানবতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা। এই চেতনার কারণেই *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) উপন্যাসে তিনি বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জেলেপল্লির দুর্দশাগ্রস্ত বাস্তবতা এবং কুবের-গণেশের জীবনসংগ্রামের চালচিত্র যেমন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে অঙ্কন করেছেন, তেমনি *শহরতলি* উপন্যাসে যশোদার মতো বাস্তবধর্মী চরিত্র নির্মাণ করেছেন। মানুষ কিংবা মানবতার প্রতি অবিচল নিষ্ঠার কারণেই লেখক-জীবনের মধ্যপর্যায়ে তিনি ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত হন (১৯৪৩); সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যপদ গ্রহণ করেন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে অংশ নেন, এবং গ্রহণ করেন ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ

(১৯৪৪)। ফলে তাঁর জীবন ও শিল্পবোধে সূচিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধে নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে বলেছেন :

> লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা আর অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয়নি।[১]

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত' – আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত, ১৯৪৪ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দলের বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের অব্যবহিত পর থেকেই মানিকের রাজনৈতিক মনস্কতা ও সমাজচেতনা তীব্রভাবে তাঁকে রাজনীতি সচেতন করে তোলে। এসময় তিনি ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে, সভাপতি, সম্পাদক ও সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মিটিং-মিছিলের সামনের সারিতে থাকতেন। এসব নানা কারণে তাঁর লেখনিতে পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। মানিক-মানসে এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত উপন্যাসসমূহ হচ্ছে : *শহরতলি* (প্রথম খণ্ড : ১৯৪০, দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯৪১), *প্রতিবিম্ব* (১৯৪৩), *দর্পণ* (১৯৪৫), *চিহ্ন* (১৯৪৭), *জীয়ন্ত* (১৯৫০), *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১), *সার্বজনীন* (১৯৫২), *সোনার চেয়ে দামি* (প্রথম খণ্ড : ১৯৫১, দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯৫২), *ইতিকথার পরের কথা* (১৯৫২), *আরোগ্য* (১৯৫৩), *হরফ* (১৯৪৫), *হলুদ নদী সবুজ*, (১৯৫৬) প্রভৃতি।

শহরতলি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতিমুখী ভাবনা-চেতনার প্রথম সচেতন প্রকাশ *শহরতলি* (প্রথম পর্ব-১৯৪০, দ্বিতীয় পর্ব-১৯৪১)[২] উপন্যাস। 'এই উপন্যাসেই মানিক প্রথম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায়

---

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য করার আগে', উদ্ধৃত, ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (সম্পা.), *উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৬৫৪

২. '*শহরতলি* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তম উপন্যাস। উপন্যাসটি দুটি পর্বে বিভক্ত। *শহরতলি* নামে উপন্যাসটি প্রথমে যখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৯৩৯ সালে (১৩৪৬ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যায় সম্পূর্ণরূপে) প্রকাশিত হয় কিংবা ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে কলকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স কর্তৃক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় তখন এটি প্রথম পর্ব বলে উল্লেখ ছিল না।

জীবনের সমস্যাকে বিচার করতে চেয়েছেন। এখান থেকেই যেন তিনি বুঝতে পারলেন যৌনবৃত্তিই মানুষের নিয়তি নয়। আবিষ্কার করলেন যৌনবৃত্তির চেয়েও শক্তিশালী মানুষের অর্থনৈতিক জীবন। প্রজনন প্রবৃত্তির চেয়েও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি অনেক বেশী প্রখর।[১] আর এই আর্থ-রাজনীতির অন্তর্সত্যই *শহরতলি* উপন্যাসে শিল্পরূপ লাভ করেছে।

শহরতলি উপন্যাসে শহরতলির জনজীবনচিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। এই উপন্যাসের একদিকে আছে শহরতলিতে গড়ে ওঠা সত্যপ্রিয় মিলসের মালিক সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী, অন্যদিকে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণির সুখ-দুঃখের একান্ত সহযোগী যশোদা। সত্যপ্রিয় কীভাবে তার কূটচালের মধ্য দিয়ে সাধারণ শ্রমিকদের জীবন থেকে যশোদাকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং তাকে বস্তির কুঁড়েঘর থেকে উচ্ছেদ করেছে তা-ই উপস্থাপিত হয়েছে শহরতলি উপন্যাসে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কীভাবে সাধারণ মানুষকে অনিকেত জীবনে নিক্ষেপ করে, তা মানিক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে এ-উপন্যাসে প্রতিফলিত করেছেন।

শহরতলি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র যশোদা। তার স্বামীর নাম উপন্যাসে নেই। তবে তার সন্তানের নাম চাঁদ। চাঁদ মারা গেছে, তাই যশোদাকে অনেকে চাঁদের মা বলে সম্বোধন করে। যশোদাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের প্রায় সমগ্র ঘটনাপ্রবাহ। যশোদার বাড়িতে অনেক শ্রমিক ভাড়া থাকে। এখানে খাবারও পাওয়া যায় দাম দিলেই। যশোদার ভাড়াটিয়াদের মধ্যে কেউ কাজের সন্ধানে ব্যস্ত, আবার কেউ কাজ হারিয়ে বেকার। এদের মধ্যে কারখানার নিয়মিত কর্মী যেমন আছে, তেমনি আছে রেল ইয়ার্ডের ঠিকা কুলি। সেখানে সপরিবারে বাস করার জন্য রয়েছে ছোট ছোট কুঠরি। বসবাসকারীরাও শ্রমিক ও নিম্নস্তরের কর্মচারী। বাড়িটির আশেপাশের প্রতিবেশিরাও মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির। শহরতলি হওয়ার কারণে নগর সভ্যতার ছোঁয়া এখানে তেমন নেই। মানিক শহরতলির এই অঞ্চলের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

কিন্তু পরে এ উপন্যাসের একটি দ্বিতীয় পর্ব রচিত হলে এর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে প্রথমে রচিত অংশকে প্রথম পর্ব বলে উল্লেখ করা হয়। *শহরতলির* দ্বিতীয় পর্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে।... *শহরতলির* দ্বিতীয় পর্বও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি আট কিস্তিতে (১৯৩৯ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন পর্যন্ত) 'পত্রিকা' নামক একটি মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়।' (দ্রষ্টব্য : সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. নয়-দশ।

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

পথের দু পাশে সচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের, স্বাচ্ছন্দ্য ও দুর্ভোগের, রুচি ও অরুচির, সুন্দর ও কুৎসিতের, পরিচ্ছন্ন ও নোংরামির, সম্মুখ ও পিছনের, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের (যথা – গৃহ-নির্মাণোপকরণের সমাবেশ) কত যে আশ্চর্য সমন্বয় ও গলাগলি ভাব! নাম লেখা গেট, বাগান ও লন, আধুনিক ফ্যাশানের সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি, বিচিত্র শাড়ি, সুন্দরি নারী, রেডিয়োর গান, ইট বাহির করা পুরোনো একতলা বাড়ি, সামনে সিমেন্ট-ফাটা রোয়াকে ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাগজের টুকরা, আধপোড়া বিড়ি, কোমরে ঘুনসি বাঁধা উলঙ্গ শিশু। পথের এদিকে ছবির মতো সাজানো মনিহারি দোকান – সাবান, কেশতৈল, পাউডার, স্নো, ক্রিমে ঠাসা; পথের অপর দিকে নিছক একটা কয়লার আড়ত, খুচরা ও পাইকারি বিক্রয় হয়, মালিক শ্রীভূষণচন্দ্র নন্দী। ... এক রকম গা ঘেঁষিয়াই টিনের চালার নিচে লোচন সাউয়ের মুড়িচিঁড়ার দোকান, কাচবসানো টিনের পাত্রে বাতাসা, দড়িতে ঝুলানো তিলুড়ি, এক ছড়া চাঁপাকলা ...। ছোটো স্যাকরার দোকান, কামারের দোকান, টিনের মগ-বালতি তৈরি আর ঘটিবাটি ঝালাই করার দোকান, সাইকেল মেরামতের দোকান এসবও আছে।

আর কিছু দূরে আছে বড় বড় কারখানা।[১]

এরকম হতশ্রী পরিবেশে যশোদার বসবাস। অবশ্য এ-পরিবেশেই তার স্বস্তি ও আনন্দ। কারণ এখানে সবাই একে অপরের সুখে-দুঃখে সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল। যশোদার সঙ্গে অন্যদের সম্পর্কও সহজ-স্বাভাবিক। শ্রমজীবী মানুষদের দৈনন্দিনতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়। বিভিন্ন কলকারখানায় প্রভাব রয়েছে তার। লেখক যশোদার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড বর্ণনা করেছেন এভাবে :

মানুষকে কাজ জুটাইয়া দিতে যশোদা বড় ওস্তাদ। অনেক বছর ধরিয়া ধীরে ধীরে আপনা হইতে অনেকগুলি ছোটোবড়ো কলকারখানার সঙ্গে তার একটা যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে, অনেক কারখানার ম্যানেজার হইতে সর্দার কুলি পর্যন্ত তাকে চেনে – চোখে না দেখিলেও নাম শুনিয়াছে। অনেক শ্রমিকের সঙ্গে যশোদার মুখোমুখি পরিচয় আছে, অনেকে তাকে কেবল দু-একবার চোখে দেখিয়াছে, অনেকে সহকর্মীদের মুখে তার নাম শুনিয়াছে। কার কাজ নাই, কার কাজ চাই, কে কাজের লোক, কে অকেজো, কোথায় কোন কারখানায় কী ধরনের লোক নেওয়া হইতেছে বা হইবে, এসব খবর ঘরে বসিয়াই এত বেশি পাওয়া যায় যে খাতাপত্রের সাহায্য ছাড়া মনে রাখা অসম্ভব। কিন্তু ওসব হিসাব রাখার বালাই যশোদার নাই, সেটা তার পেশাও নয়! কোনো আদর্শ, উদ্দেশ্য বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করে নাই, শ্রমিক-জগতে আপনা হইতে তার একটা স্থান জুটিয়া গিয়াছে, প্রথমে খুবই সংকীর্ণ ছিল এখন পরিসর বাড়িয়াছে।[২]

---

১. *শহরতলি* (প্রথম পর্ব), সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

শুধু *শহরতলি* উপন্যাসে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র যশোদা। তার বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব শ্রমিক-অঙ্গনে তাকে জনপ্রিয় করেছে। তার মধ্যে যেমন নেতৃত্বের সহজাত গুণ আছে, চারিত্রিক দৃঢ়তা আছে, তেমনি আছে নারীসুলভ নমনীয়তা। এ জন্য শ্রমজীবী মানুষদের সে যেমন ভর্ৎসনা করে, তেমনি তাদের প্রতি তার স্নেহও দুর্নিবার।

যশোদা মধ্যবয়সী নারী। তার প্রতি অন্ধপ্রেমে আচ্ছন্ন মতি ও সুধীর; যদিও ধনঞ্জয়ের প্রতি রয়েছে যশোদার কিঞ্চিৎ টান। সুধীর সরাসরি তার প্রণয়কথা ব্যক্ত করেছে যশোদার কাছে এবং ঈর্ষান্বিত হয়ে রেল ইয়ার্ডে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ধনঞ্জয়ের পা ভেঙে দিয়েছে। উপন্যাসে যশোদা দ্বৈতরূপেই প্রতিষ্ঠিত; কখনও সো প্রণয়ী, আবার কখনও স্নেহময়ী মা। মায়ের ভূমিকায় সে অনন্য।

শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল সম্পর্কের কারণে যশোদার সঙ্গে মিল-মালিক সত্যপ্রিয়র বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে ভাই নন্দকে চাকরি দিয়ে সুচতুর সত্যপ্রিয়র পাতা ফাঁদে পা দেয় যশোদা। সত্যপ্রিয় শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তোলে এই বলে যে, শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যশোদা নিজের ভাই নন্দকে চাকরি দিয়েছে। ফলে শ্রমিকদের সঙ্গে যশোদার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। শ্রমিকরা প্রকৃত ঘটনার তথ্যানুসন্ধান না করেই যশোদার প্রতি বৈরিতা প্রদর্শন করতে শুরু করে। কারণ 'সহরতলীর শ্রমিকরা আদর্শবান নয়। কার্ডবোর্ডের তৈরি চরিত্র নয়, রক্ত-মাংসের জীব। তারা কখনো বা মদ্যপান করে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করে আর শেষ পর্যন্ত মালিক সত্যপ্রিয়র ফাঁদে পড়ে পরম বন্ধু যশোদাকে অবিশ্বাস করে।'[১]

শহরতলি উপন্যাসে সত্যপ্রিয় নব্যধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি। সে অত্যন্ত ধুরন্ধর ও কূটকৌশলী মিল মালিক। সে তার হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে যশোদার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ব্যবহার করেছে। ধনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা যে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে পিষ্ট করে অনৈতিকভাবে ধনিকশ্রেণির স্বার্থকেই বড়ো করে দেখে তা সত্যপ্রিয়র আগ্রাসী আচরণসূত্রে এ-উপন্যাসে প্রদর্শন করেছেন মানিক : তাঁর এ-সময়কার জীবন ও শিল্পবোধ প্রসঙ্গে জনৈক কথাকার স্পষ্ট করে বলেছেন :

---

২. *শহরতলি*, প্রথম পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১. সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও চল্লিশ দশকের মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা', ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

> দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্যবাদের দিকে পদক্ষেপ করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে আকস্মিক বলে মনে হলেও তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনাতেই তার সংকেত ছিল। মধ্যবিত্তের ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদের কোনো মোহ নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে অপজাত এই গোষ্ঠীটি যে ঐতিহাসিক নিয়মেই আত্মবিরোধে জর্জরিত হবে এবং ক্রমে ক্রমে অনিবার্য অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হবে – এই সত্যটি গ্রহণ করতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব বেশি সময় লাগেনি। স্বাভাবিক প্রবণতায় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত সম্পর্কে যে বিদ্বেষ এবং বিরূপতা তিনি লালন করেছিলেন, মার্কসবাদ তাকে যুক্তি ও বুদ্ধিগত সমর্থন দিয়েছিল। আর এই মধ্যবিত্তের সম্বন্ধসূত্রে ধনতন্ত্রের স্বরূপটিকেও তিনি যে ক্রমশ উপলব্ধি করেছিলেন– তার স্বাক্ষর ... তাঁর সহরতলী উপন্যাসে – সত্যপ্রিয় আর জ্যোতির্ময়ের উপাখ্যানের মাধ্যমে।[১]

সত্যপ্রিয় চরিত্রের মধ্যদিয়ে মানিক পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। পুঁজিবাদ যে অর্থকেই জীবনের নিয়ামক উপাদান মনে করে, এবং নীতি-নৈতিকতাকে গুরুত্বহীন সাব্যস্ত করে তা যশোদার প্রতি সত্যপ্রিয়র প্রণয়াকাঙ্ক্ষা ও মানসিক বিকারগ্রস্ততাসূত্রে উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। সত্যপ্রিয় সম্পর্কে যশোদার উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে এভাবে :

> সত্যপ্রিয়কে যশোদা ভালো করিয়াই চেনে, এক এক সময় ব্যাপারটা তার বড়োই কৌতুকজনক মনে হয়, আবার পরক্ষণে সে বুঝিতে পারে এর মধ্যে কৌতুকের কিছু নাই, বিষয়টা অতীব গুরুতর। সত্যপ্রিয় যা কিছু চায়, প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গেই চায়। প্রত্যেকটি কামনার এরকম অস্বাভাবিক প্রচণ্ডতাই সত্যপ্রিয়কে এ রকম হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর করিয়াছে। বিরক্তি বোধ করিলে ভূমিকম্পের জন্য সত্যপ্রিয় পৃথিবীকে পদাঘাত করিয়া ছাড়ে। পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে হয়তো জগতের সমস্ত কাঁটা নষ্ট করিয়া ফেলা সম্ভব কিনা এই কল্পনাকেও সে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু সে ভাববিলাসী নয়, বাস্তবকে সে এড়াইয়া চলে না – তার মতো হিসাবি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফন্দিবাজ, সংযমী আর স্বার্থপর মানুষ যশোদা খুব কমই দেখিয়াছে।[২]

*শহরতলি*র দ্বিতীয় পর্বে সত্যপ্রিয় ও যশোদা – উভয়ের জীবনেই পরিবর্তন এসেছে। প্রথম পর্বের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের পার্থক্য বিস্তর। এই পর্বে শহরতলির জীবনে পরিবর্তন এসেছে। আগের সেই হতশ্রীদশা এখন আর নেই। সর্বত্রই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট :

---

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (সম্পা.), *উত্তরাধিকার* (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২

২. *শহরতলি*, দ্বিতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

শহরতলির রূপান্তর গ্রহণের প্রক্রিয়া দিনদিন দ্রুততর হইয়া ওঠে।

> অদ্ভুত ব্যাপার কিছু নয়, তবু অঅশ্চর্য মনে হয়। মাটির বাসন যেন দেখিওত দেখিতে কৃত্রিম ধাতুতে দাঁড়াইয়া যাইতেছে আর চাকচিক্য বাড়িতেছে প্রতিদিন। কত এবড়োথেবড়ো রাস্তা নূতন পিচের আবরণে গা ঢাকিয়া ঝকঝক করিতেছে, কত আঁকাবাঁকা সরু গলি চওড়া আর সিধা হইয়া যাইতেছে, কত অনামি পথের গায়ে অ৭াটা হইয়া যাইতেছে জমকালো নাম।
>
> চারিদিকে বাড়ি উঠিতেছে অসংখ্য। ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো সেকেলে ধরনের সাদাসিধে একতলা দোতলা অনেক বাড়ি অদৃশ্য হইয়া সেখানে দেখা দিতেছে আধুনিক ফাশনের বাড়ি – শুধু গঠনের মধ্যেই কত কায়দা।...
>
> দোকানপাটের সংখ্যাও হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। ছোটো ছোটো কত পুরোনো দোকান যে উঠিয়া গেল!...

শহরতলির জীবনের এই পরিবর্তনে যশোদার জীবনধারায়ও পরিবর্তন আসে। তার বাড়ির তিনদিকে নতুন বাড়ি উঠেছে। তার বাড়ি বিক্রি করবার জন্য অনেকে তাকে পরামর্শ দিলেও সে বাড়ি বিক্রি করতে চায় না। কারণ সে জানে, সত্যপ্রিয় স্বনামে কিংবা বেনামে এ-অঞ্চলের অনেক জমি ও বাড়ি ক্রয় করে নিয়েছে। যে সত্যপ্রিয় তার অনেক ক্ষতি করেছে তার কাছে সে কিছুতেই নতিস্বীকার করবে না। এ-পর্যায়ে সত্যপ্রিয়র সঙ্গে সে নতুন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। সত্যপ্রিয়র মেয়ে-জামাইকে আশ্রয় দেয়ার কারণে তার বিপদ ঘনিয়ে আসে। এই বিপদের স্বরূপ নিম্নরূপ :

> একদিন সকালে পিয়ন আসিয়া একখানা খাম দিয়া গেল যশোদার নামে। খামের মধ্যে কারো ব্যক্তিগত চিঠি ছিল না, ছিল একটি নোটিশ। শহরতলির উন্নতির জন্য যশোদার বাড়ির উপর দিয়া নূতন রাস্তা যাইবে, যশোদার বাড়ি আর আলগা জমি উপযুক্ত মূল্যে কিনিয়া নেওয়া হইবে।[১]

এভাবে সত্যপ্রিয়র কূটবুদ্ধিতে পরাজিত হয় মানবদরদী যশোদা। কিন্তু সে কখনো অপশক্তির কাছে মাথা নত করেনি। অবশেষে সে পরাজিত হলেও সেটা ছিল সম্মানের ও শ্রদ্ধার।

শহরতলি উপন্যাসে কাহিনিচিত্র এবং কয়েকটি চরিত্র জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। মানিক বাস্তবজীবন থেকেই এসব চরিত্র গ্রহণ করেছেন। এ-কারণেই কোনো চরিত্রের আচরণ কিংবা গতিবিধি কৃত্রিম বলে মনে হয় না। জনৈক সমালোচক এ-প্রসঙ্গে তাই বলেছেন :

---

১. *শহরতলি*, দ্বিতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

> শহরতলী উপন্যাসটি নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ও শিল্পোত্তীর্ণ। শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের যে চমৎকার বিবরণ এ বইয়ে আছে তার তুলনা বাংলাসাহিত্যে বিরল। যশোদা এবং শ্রমিকদের চরিত্র জীবন্ত, বাস্তব, কৌতূহলোদ্দীপক এবং অতিরঞ্জনবর্জিত। এই বইয়ের মূলবক্তব্য রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনের একটা সত্য ট্র্যাজেডি।[১]

উপন্যাসে শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে মতি, সুধীর, জগৎ, ধনঞ্জয়, কালো, চাঁপা প্রমুখ চরিত্রগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনির গতিময়তা সৃষ্টিতে যশোদা ছাড়াও আরও কয়েকটি নারী চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন লেখক। তাদের মধ্যে যশোদার সখি কুমুদিনী, সুবর্ণ, অপরাজিতা, কালো, চাঁপা প্রমুখ অন্যতম। বিষয় ও চরিত্র পরিকল্পনার দিক থেকে উপন্যাসটিতে মানিকের মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্যতা লক্ষণীয়। সাধারণত উপন্যাসে প্রচলিত যে সকল নর-নারীর চরিত্র চিত্রায়ন করা হয়, এখানে সে সকল মানুষের জীবনেতিহাস অনুল্লিখিত। তথাকথিত ভদ্রলোকদের জীবন-যাত্রায় লোক দেখানোর জন্য জাঁক-জমকপূর্ণভাবে নিজেকে উপস্থাপন করার যে একটা প্রাণান্তকর চেষ্টা থাকে, শ্রমিকশ্রেণির জীবন-যাত্রার মধ্যে তা একেবারেই অনুপস্থিত। ধুলো-মাটিমাখা জীবনই তাদের নিত্যসঙ্গী। শ্রম ও সরলতাই এদের জীবনের একমাত্র পরিচয়।

মানিক এ উপন্যাসে মালিক ও শ্রমিক – এই দুই শ্রেণির বাস্তবসম্মত জীবন্তরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষত যশোদা চরিত্রাঙ্কনে মানিক অত্যন্ত সংযম ও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। বস্তিজীবনে যশোদা শ্রমিকদের সঙ্গে যে সহজ ও সাবলীল জীবনযাপন করেছে, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তা যে আর ছিল না তা মানিক যশোদা চরিত্রের অন্তর্গত ভাবনা ও উপলব্ধিসূত্রে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। শ্রমিকসভায় নেতাদের সঙ্গে বক্তৃতা করতে গিয়ে যশোদার মনে হয়েছে :

> নিজের নিজের মতামতটা জাহির করিবার জন্য অনেকে বড়ো ব্যস্ত। বড়ো বড়ো কথাও অনেক বলা হয়, একেবারে নাটকীয় ভঙ্গিতে, অবরুদ্ধ একটা উত্তেজনা যেন বক্তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে সকলে এ রকম নয়, শান্ত ও সংযত মানুষও কয়েকজন আছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়াই যারা কথা বলে। কিন্তু এদেরও আসল বক্তব্যটা যশোদা আগাগোড়া ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ...
>
> এরা সমস্ত জগতের শ্রমিকদের অবস্থা জানে, শ্রমিক সমস্যা এরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছে, এদের সমস্ত তর্কবিতর্ক পরিষ্কার বুঝিবার মতো জ্ঞান সে কোথায় পাইবে? তার মতো ঠেকনা দিয়া দশ-

---

১. অচ্যুত গোস্বামী, *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, ভূমিকা ও সম্পাদনা-আবুল কাশেম ফজলুল হক, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রকাশ কাল : ফেব্রুয়ারি-২০১৮, পৃ. ২৮১

বিশজন শ্রমিককে কোনো রকমে খাড়া করিবার ব্রত এদের নয়, ধনিকতন্ত্রের চোরাবালির গ্রাস হইতে সমস্ত শ্রমিককে বাঁচাইয়া শক্ত মাটিতে তাদের দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা এদের কাজ।

সে কাজের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া যশোদার মাথা ঘুরিয়া যায়। কুলিমজুরের সঙ্গে সে মিশিয়াছিল, তাদের কয়েকজনকে ভালো বাসিয়াছিল, একটা শ্রেণী হিসাবে তাদের কথা কখনো ভাবিয়া দ্যাখে নাই।[১]

মানিক এ উপন্যাসে মালিক ও শ্রমিক অর্থাৎ শাসক ও শোষিত সম্পর্কিত যে-বক্তব্য সত্যপ্রিয়-যশোদার বিরোধ প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন, অথবা যশোদার শ্রেণিসংক্রান্ত উপলব্ধির যে-বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, তা তাঁর এ-পর্যায়ের জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তখনও মানিক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কিত হননি। তাই শ্রেণিসংক্রান্ত অধিক বক্তব্যপ্রদান মানিকের পক্ষে বেমানান হতো। তাঁর পক্ষে 'এর বেশি বিপ্লবাত্মক হয়ে ওঠা ছিল অসম্ভব অবাস্তবতা। মানিকের শৈল্পিক সংযম ও বাস্তবতাবোধের নিবিড় পরিচয় এর মধ্যে আছে।[২] *শহরতলি* উপন্যাসে মানিক এভাবেই তাঁর রাজনীতিচেতনার সংযম সুরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন বলা যায়।

প্রতিবিম্ব

প্রতিবিম্ব (১৯৪৩)[৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম রাজনৈতিক উপন্যাস। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। চল্লিশের দশকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বনে এ-উপন্যাসের গল্পাংশ পরিকল্পিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, জাতীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ এ-উপন্যাসে গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। উপন্যাসটির শুরুতে কেন্দ্রীয় চরিত্র তারক প্রসঙ্গে 'লেখকের বক্তব্য' অংশে মানিক লিখেছেন :

মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী সাধারণ কর্মী-যুবকের মনে নবযুগের নতুন ভাবধারার প্রভাবে কী আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, ভাবপ্রবণতা ও বাস্তববোধের দ্বন্দ্ব কী রূপ নিয়েছে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা উচিত এই নিয়ে যে দ্বিধা ও সংশয়ের ভাবে সে ব্যাকুল হয়েছে, ভবিষ্যৎকে–

---

১. *শহরতলি*, দ্বিতীয় পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২২

২. সৈয়দ আজিজুল হক, কথাশিল্পী মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৩. ১৯৪৩ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রতিবিম্ব উপন্যাস প্রকাশিত হয়। একই বছরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

সোজা ভাষায় বলি। তারকের মতো ছেলেদের মধ্যে যুগ পরিবর্তনের সূচনা কী রূপ নিয়েছে 'প্রতিবিম্ব' তারই একটা দিককে রূপ দেবার চেষ্টা। বলাও কি বাহুল্য নয় যে তারক বাংলার যুবা মনের প্রতীক নয়? তবে বাংলায় যুবকদের একটা বড়ো অংশ তারকের মতোই বিব্রত, বিভ্রান্ত।

বলা বাহুল্য, তারক বদলে যাবে। ইতোমধ্যেই কিছুটা বদলেছে। কিছুকাল পরে 'প্রতিবিম্ব' হয়ে যাবে 'পুরানো ছবি'।[১]

প্রতিবিম্ব উপন্যাস 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হলে এর কাহিনি প্রসঙ্গে একটি রাজনৈতিক দল আক্রমণাত্মক বক্তব্য উত্থাপন করে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এ অভিযোগ খণ্ডন করে মানিক বলেন :

প্রতিবিম্বে রাজনৈতিক পার্টি বা প্রতিষ্ঠান ও মতবাদের বিরুদ্ধে আমার আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রতিবিম্বিত হয়েছে ধরে নিয়ে তারই ভিত্তিতে অভিযোগগুলি দাঁড় করানো হয়েছে। – শুধু অভিযোগ নয়, সমর্থনও। কোনো পার্টি বা সংঘ বা প্রতিষ্ঠান বা আদর্শবাদকে খোঁচা দেবার বা সমর্থন করার উদ্দেশ্য নিয়ে *প্রতিবিম্ব* লেখা হয় নি। এককভাবে কোনো বিশেষ পার্টিকে তো নয়ই – সমগ্রভাবে রক্ষণশীল, প্রগতিবাদী, জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি পর্যায়ের বিভাগকে পর্যন্ত নয়। ...

'প্রতিবিম্বে'র মধ্যে কোনো বিশেষ পার্টির পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো ইঙ্গিত খুঁজবার চেষ্টা করবেন না, কল্পনা করবার চেষ্টা করবেন না যে 'প্রতিবিম্বে' যে পার্টির কথা আছে সেটা 'অমুক' পার্টি।[২]

উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে শিক্ষিত ও সংগ্রামী যুবক তারককে ঘিরে। মহকুমা শহর সংলগ্ন একটি গ্রামে তার বসবাস। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে এ-উপন্যাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও কর্মপ্রক্রিয়ার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

তারক শিক্ষিত জাতীয়তাবাদী যুবক। সে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। পিতার পেনশন ও জমিজমার আয়ে তারকের সংসার চলে। লেখাপড়া শিখলেও তার চাকরিতে আগ্রহ নেই। রামবাবুর সঙ্গে পার্টি-গোছানো আর চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া তার একমাত্র কাজ। একপর্যায়ে কলকাতার এক উকিলের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। স্ত্রীর চাপ ও শ্বশুরের চেষ্টায় সে হিটলার বিরোধী যুদ্ধের অফিসে কেরানির চাকরিতে ইন্টারভিউ দিতে যায়। রামবাবুর কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে সে কলকাতায় একটি পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে

---

১. 'লেখকের বক্তব্য', সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪

২. *প্রতিবিম্ব*, 'লেখকের বক্তব্য', সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩

গিয়ে ওঠে। সেখানে পার্টির সেক্রেটারি, নিশীথ সোমের স্ত্রী ও নারীনেত্রী পুষ্প সোম, স্কুল-শিক্ষিকা মনোজিনী ও দলের কর্মী সীতানাথের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এখানে এসে কংগ্রেসের রাজনীতির প্রতি মুগ্ধ তারক অন্যদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে যায়। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সীমাবদ্ধতার দিকটি তাদের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক পুষ্প ও তারকের কথোপকথনসূত্রে তা উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> শৈশব থেকে সে অন্ধ প্রীতি দিয়ে এসেছে কংগ্রেসকে। নতুন চিন্তার প্রধান ধারা থেকে ঘটি ও কলসি ভরে অনেক নমুনা তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে যুগ, ভাবতে শেখার লাঙল-চষা মন তা শুষে নিতে বিলম্ব করে নি।...
>
> আগস্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করে কংগ্রেস বাইরে আসবে, এসে বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগে একটা বিপ্লব ঘটাবে দেশে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ...
>
> কী বিপ্লব?
>
> যুদ্ধ যে বিপ্লব এনে দিয়েছে চারিদিকে, তাকে আসলে বিপ্লবের রূপ দেওয়া।...
>
> কংগ্রেস করেছিল বিদ্রোহ, শুধু স্বাধীনতা চেয়েছিল। আমরা বলছি কংগ্রেসের উচিত ছিল বিপ্লব ঘোষণা করা –! আজো যদি কংগ্রেস বাইরে আসে, একসঙ্গে ঘোষণা করে যে ভারতবর্ষ ফ্যাসিবিরোধী আর আহ্বান জানায় বিপ্লবের–
>
> তা হলে কী হয় কল্পনায় আসে না তারকের।[১]

কমিউনিস্ট নেতাদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে তারক ভিন্নতর রাজনৈতিক দর্শন লাভ করে। গ্রামের সহজ-সরল শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সে আরো কৌতূহলী হয়। তার চিন্তা-চেতনায় তখন দেশকাল, সমকালীন বিশ্ব রাজনীতির নানা বিষয় ঘুরপাক খায়। সে বুঝতে পারে যে, অনিয়মের বিরুদ্ধে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। লেখক তারকের চিন্তাধারার বিবর্তনের স্বরূপ তুলে ধরেছেন এভাবে :

> তারকের মনে হয়, সত্যিই সে ধাঁধার আবর্তে পাক খাচ্ছে, বিশ্বাসকে যতক্ষণ খাড়া করে তুলতে না পারে ততক্ষণ হাঁসফাঁস করে তারকের মনটা। প্রোডাকশন, ডিস্ট্রিবিউশন, ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম, সোস্যালিস্ট, সিস্টেম ইত্যাদি সব জলের মতো পরিষ্কার তার কাছে – অথচ দেশকে সামনে রেখে ভাবতে গেলে সব তথ্যবোধ তার গুলিয়ে যায়। বিদেশী বণিকের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা স্বদেশী বণিকের হাতে দিতে তারকের আপত্তি নেই, কিন্তু তাও সম্ভব হবে একমাত্র সোস্যালিস্ট রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন পেতে উদ্ভূত বিপ্লবের

১. *প্রতিবিম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯

মারফতে। সে স্বাধীনতার মূল্য তারকের কাছে খুব বেশি না। তবু সে স্বাধীনতাই ক্যাপিটালিস্ট ব্রিটেনকে দুর্বল করবে, ভারতে ক্যাপিটালিজমের ধ্বংস সহজ হবে এবং তারক বিশ্বাস করে ভারতকে সোজাসুজি সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টার চেয়ে এই পন্থায় সেটা অনেক সহজে এবং কম সময়ের মধ্যে হবে।[১]

তারক ছিল বরাবরই 'বন্ধনভীরু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয়'। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সে দলের সদস্য পদ নিতে বরাবরই আপত্তি জানিয়েছে। হৃদরোগের মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছে পিতা-মাতা-স্ত্রীর সঙ্গে। শ্বশুরের দেওয়া একটি সুনিশ্চিত চাকরির জন্য নামমাত্র ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে যে পিছিয়ে আসে, সেই তারেক অবশেষে কলকাতায় গিয়ে সোভিয়েতপন্থি একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে বদলে যেতে শুরু করে। গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষদের জীবনকে নতুন করে আবিষ্কার করে সে; তাদের প্রতি বোধ করে সহানুভূতি। এ-পর্যায়ে তার পরিবর্তিত জীবনদৃষ্টি ও মনোভাবনা লক্ষণীয় :

... আমি সত্যি ওদের ভালো করে জানি না। প্রতিদিন ওদের জীবনযাত্রা দেখেছি, একসঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করেছি কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক ছিল একটা। হয়তো আনমনা হয়ে থাকতাম, লক্ষ করতাম না। আমার নিজস্ব যেন একটা সমস্যা আছে, ওরা এক একজন তার এক একটা টুকরো মাত্র, এই রকম ভাব ছিল মনের। আমার বাড়ির পাশে জৈনুদ্দিনের ঘর, জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত বোধ হয় লাখখানেক কথা ওর সঙ্গে আদান-প্রদান হয়েছে, কিন্তু ভাবতে গিয়ে দেখছি লোকটা কী ভাবে, কেমন করে ভাবে, কিছুই জানি না। মানুষগুলোকে একটু চিনে আসি।[২]

প্রতিবিম্ব উপন্যাসে বেকার সমস্যা, দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের শহর অভিমুখে মিছিল, ত্রাণ বিতরণ, কলকাতার রাস্তায় অনাহারী নারীর মৃত্যু, গ্রামীণ যুবতীর বস্ত্রসংকট ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। 'কম্যুনিজম গ্রহণের আগে মানিক মানসের ভর ও কেন্দ্র ছিল অন্তর্বাস্তবতা, পরে বহির্বাস্তবতা, কিন্তু আগেও যেমন বহির্বাস্তবতাকে গ্রহণ করেছেন তেমনি অন্তর্বাস্তবতাকে অস্বীকার করেননি। *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসের ভিতরে মনোলোক ও বহির্লোকের দু'টি বলয়ই কাজ করে গেছে – কিন্তু তার গতি স্পষ্টতই সাধারণ মানুষের অভিমুখে। উপন্যাসে উল্লিখিত ঘটনাবিল ১৯৪২-৪৩ সালের বলে ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব নয়।[৩]

---

১. *প্রতিবিম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

২. *প্রতিবিম্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

প্রতিবিম্ব উপন্যাসে কোনো রাজনৈতিক দলের নাম নেই, তবে রাজনৈতিক আদর্শের কথা আছে। 'কংগ্রেসের প্রতি প্রীতিস্নিগ্ধ, জাতীয়তাবাদী চেতনাপুষ্ট তারকের শ্রমজীবী জীবনাগ্রহই উপন্যাসের শেষাংশে বড়ো হয়ে উঠেছে। জাতীয়তাবাদী তারকের শ্রেণিদৃষ্টি অর্জনের আলেখ্য রচনাই এ উপন্যাসের মূলকথা।'[১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী চেতনাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং শ্রমজীবীশ্রেণির প্রতি তাঁর আগ্রহের বিষয়টি তারকের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

দর্পণ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক উপন্যাস *দর্পণ* (১৯৪৫)[২]। উপন্যাসটি রচনার প্রাক্কালে 'তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দেন । '১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে মহম্মদ আলি পার্কে যখন চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (এখানেই সর্বভারতীয় সংঘের সঙ্গে নাম মিলিয়ে নামকরণ হল 'প্রগতি লেখক সংঘ')। তখন মানিকবাবু সভাপতিমণ্ডলীর একজন সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর থেকে সংঘ যতদিন সক্রিয় ছিল ততদিনই মানিকবাবু তার নায়কতা করেছেন।'[৩] এই সময় পরিসরে রচিত *দর্পণ* উপন্যাসের প্রতিটি স্তরে মানিক মার্কসবাদী চেতনায় শোষণপীড়িত সমাজের অনবদ্য চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

দর্পণ উপন্যাসের সূচনা হয় ঝুমুরিয়া গ্রামের বীরেশ্বর মাইতি এবং তার সুন্দরী কন্যা রম্ভাকে নিয়ে। স্বদেশীদের সংস্পর্শে এসে বীরেশ্বর বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এ-কারণে পুলিশ তাকে কয়েকবার গ্রেপ্তার করে। একবার তার দু-বছর জেলও হয়। বীরেশ্বর যেদিন জেল থেকে বেরিয়ে আসে, সেদিন তাকে নিয়ে গ্রামবাসী বিরাট শোভাযাত্রা বের করে। গ্রামে এসেই বীরেশ্বর দেখতে পায় – জমিদার হেরম্ব একটা বড় রাস্তা করতে গিয়ে তার অনেক জমি অনাবাদি দেখিয়ে কম দাম দিয়েছে। শুধু তাই নয়, পুকুর থেকে সে জোরপূর্বক

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক, কথাশিল্পী মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বাদশ উপন্যাস *দর্পণ*। এটি ১৯৪৫ সালের জুন মাসে(আষাঢ় ১৩৫২) প্রকাশিত হয়; প্রকাশক : দি বুকএম্পোরিয়াম লি., কলকাতা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে উপন্যাসটি পাটনা থেকে প্রকাশিত 'প্রভাতী' পত্রিকায় 'জাগো জাগো' নামে ১৯৪২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৩ সালের জুন পর্যন্ত মুদ্রিত হয়।

৩. চিন্মোহন সেহানবিশ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ, *উত্তরাধিকার*, পৃ. ৪৫৩ ['পরিচয় ॥ পৌষ, ১৩৫৩; উৎস : মানিক বিচিত্রা]

অনেক মাছ তুলে নিয়েছে এবং চাষিদের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেছে। এসব নিয়ে বীরেশ্বরের সমর্থকদের সাথে হেরম্বের বাহিনীর সংঘর্ষ হয় এবং অজ্ঞাত এক ব্যক্তির বন্দুকের গুলিতে বীরেশ্বর মারা যায়।

বীরেশ্বরের মৃত্যুসংবাদে কৃষ্ণেন্দু ঝুমুরিয়ায় যায়। এদিকে বীরেশ্বরের খুন হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ উল্টো বীরেশ্বরের লোকদের আটক করে। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কৃষ্ণেন্দু ঝুমুরিয়ায় একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করে। কিন্তু সে রাতেই কৃষ্ণেন্দু আর বীরেশ্বরের ছোট ছেলে মোহনলালকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে বীরেশ্বরের সমর্থকরা। এসময় মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে গ্রামে বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। লেখক সেদিনের শোভাযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> বীরেশ্বরের অপমৃত্যুতেও এমন সাড়া জাগেনি। চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু এমন উত্তেজনা দেখা দেয়নি। ও যেন খানিকটা ছিল হেরম্ব ও বীরেশ্বরের ব্যক্তিগত কলহের ব্যাপার। হেরম্ব অত্যাচার করছিল সত্য, বীরেশ্বর একা নিজের জন্য লড়তে যায়নি তাও সত্য, কিন্তু তবু হাঙ্গামাটা হয়েছিল বীরেশ্বরের জন্যই। হেরম্বের মতো অত্যাচারীকে প্রকৃতির একটা অনিবার্য উৎপাতের মতো মেনে নেবার সংস্কার আজো লোকের কেটে যায়নি। জমিদার, ধনী আর প্রতিপত্তিশালীদের সঙ্গে আজো তো লড়াই একরকম হয়নি দেশের লোকের, ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার প্রেরণাও জোগাননি নেতারা। সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য তো নেইই, বরং আছে মুখ বুজে সব সয়ে যাবার অভ্যাস। ...বীরেশ্বরের মৃত্যু নিয়ে তাই হইচই হয়েছিল কিন্তু ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। নেপথ্যে ছিল।
>
> কিন্তু কৃষ্ণেন্দু নেতা। মোহনলাল প্রিয়। এবং একটি জনপ্রিয় দলের নেতা।[১]

কৃষ্ণেন্দু- মোহনলালের জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের গুণে এদিন দুপুর থেকেই দলে দলে লোক জড়ো হতে থাকে বটতলার মাঠে। ঝুমুরিয়ার ইতিহাসে এতবড়ো লোক-সমাগম ইতঃপূর্বে হয়নি। উত্তেজিত মানুষের ভিড়ের মধ্যে রম্ভাও আসে ভৈরবীর বেশে। এখানে হিন্দু-মুসলমান কোনো বিভেদ নেই। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করে পুলিশের দারোগাও নির্বাক হয়ে যান। তাই 'অবস্থা গুরুতর, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে' – বলে তিনি হেরম্বের কাছে একটি চিঠি লেখেন। অবশ্য চিঠি পড়ে হেরম্ব আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। এই হাঙ্গামাই তার কাম্য। এদিনের সভাস্থলের বর্ণনা লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে :

---

১. *দর্পণ*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড*, সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০১০, প্রাগুক্ত, পৃ .৫৫০

সূর্য যখন ডুবু ডুবু, হেরম্বেরই গাঁইতি কোদাল শাবল দিয়ে তৈরি রাস্তা খোঁড়া আরম্ভ হল, পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল তার লরি আর তাঁবুতে, বন্দুকের গুলি খেয়ে হেরম্বের হাতের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে রামপাল মরে গেল, হেরম্বকে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে পোড়ানো হল তার বাড়ির দক্ষিণের চালাঘরের আগুনে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আগুন ধরল বীরেশ্বর ও ঝুমুরিয়ার আরো পাঁচটি বাড়ির চালায়। একদল লোক গিয়ে পাঁচনিখের থানা পুড়িয়ে এল। শৈলেন আগেই বটতলার মাঠে মারা গিয়েছিল। সভায় আরো মরেছিল তেরজন লোক আর দুজন পুলিশ। তার মধ্যে ছিল জগৎ দাসের ছেলে শিশু। জখম হয়েছিল বহুলোক।[১]

উপন্যাসে এভাবে শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত-নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিষয়টি মানিক তুলে ধরেছেন। 'মার্কসবাদ বিপ্লব সম্পর্কে যে ধারণা দেয়, বীরেশ্বর-রামপালদের আত্মত্যাগ এবং হেরম্বদের হত্যার মাধ্যমে 'মৃত্যু-মূল্য' ঘটিয়ে *দর্পণ* উপন্যাসে তা সম্পূর্ণত অনুসরণ করা হয়েছে। ঔপন্যাসিক দেখালেন অন্য সব পর্ব সম্পন্ন না হলে শুধু 'মৃত্যু-মূল্য' পরিণতি পায় কতটুকু। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব যে অনিবার্য এবং সংঘবদ্ধতা ও সঠিক নেতৃত্ব থাকলে শোষিত যে এ দ্বন্দ্বে জয়ী হয়, *দর্পণ*-এ তা দেখানো হয়েছে।'[২]

দর্পণ উপন্যাসের চরিত্রপাত্র এবং তাদের জীবনযাত্রা ও কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যেও শোষক ও শোষিতের প্রতিচ্ছবি রয়েছে। 'উপন্যাসটির নাম দর্পণ। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের এই দর্পণ। একদিকে লোকনাথ, উমাপদ, হেরম্ব, হীরেন, শশাঙ্ক, দিগম্বরী আর অন্যদিকে কৃষ্ণেন্দু, রম্ভা, বীরেশ্বর, মহীউদ্দিন ও শম্ভুর দর্পণ। অত্যাচারী ধনী হেরম্বদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ঝুমুরিয়া গ্রামবাসীর বিক্ষোভের দর্পণ। এককালে আদর্শবাদী, হতাশায় ম্রিয়মান ঘুষখোর দারোগা শৈলেন দাসের দর্পণ। বস্তিজীবনের, বাগ্দীপাড়ার, দেহ-বেচা রূপজীবী অশিক্ষিত নিম্নস্তরের মানুষদের দর্পণ।'[৩]

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কৃষ্ণেন্দু হলেও রম্ভা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে তার পিতা বীরেশ্বরের মতোই তেজস্বী। বয়স হলেও সে যে-কোনো পাত্রকে বিয়ে করতে আগ্রহী নয়। উপন্যাসে তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে এভাবে :

---

১. *দর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭

২. সৌমিত্র শেখর, 'উপন্যাসে বৈজ্ঞানিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯

৩. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে, ভালোমতো পাত্র জোটেনি। চাষির ঘরের পক্ষে তার বেমানান ও নিন্দনীয় রূপ যৌবনটা অবশ্য তার বড়ো কারণ নয়। ঘরে ঘরে না থাক, এমন অনেক রূপসী মেয়ে আছে অনেক চাষির ঘরে, চাষি সমাজে যাকে ভালো পাত্র বলা চলে সেরকম পাত্রেরও তাদের অভাব ঘটেনি। বীরেশ্বরের প্রকৃতি আর পছন্দ ওসব লোকের মতো হলে কবেই হয়তো রম্ভারও বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু কতকগুলি বিচিত্র মানুষ ও ঘটনার সংস্পর্শে বীরেশ্বর জীবনে কতগুলি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। চেতনার যে পরম রসায়ন সকল বিরোধী শক্তির সঙ্গে হার মানার আপস করে কোনোমতে বেঁচে থাকার সন্তোষ নষ্ট করে দেয় তাই ছিটেফোঁটা সঞ্চারিত হয়েছে তার শোণিতে।[১]

একপর্যায়ে কৃষ্ণেন্দুর উদ্যোগে রামপালের সঙ্গে রম্ভার বিয়ে হয়। কৃষ্ণেন্দু, মমতা, হীরেন, আরিফ ও দীনেশসহ মজুর-মিস্ত্রিরা বিয়ের বরযাত্রী হয়ে ঝুমুরিয়ায় আসে। বিয়ের পর রম্ভা নতুন জগত ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়। রম্ভার কাছে বস্তির জগত একেবারেই আলাদা। স্থানের সংকীর্ণতা আর আলো-বাতাসের অভাবে তার দম আটকে আসে। একদিকে নর্দমা ও পঁচা আবর্জনার দুর্গন্ধ, অন্যদিকে 'হৃদয়হীন অদ্ভুত খাপছাড়া' মানুষের কোন্দল, উদাসীনতা, ছলচাতুরি, হীনতা, দীনতা, নির্মম পাশবিকতা তাকে চিন্তিত করে তোলে। সে রামপালকে অন্য কোথাও তাকে নিয়ে যেতে বলে। ঝুমুরিয়ার খোলা মাঠঘাট উন্মুক্ত প্রান্তরের জন্য তার মন কাঁদে। এসময় তার মনের অনুভূতি এরকম :

ভাবপ্রবণতার আক্রমণে রম্ভাও কাবু হয়ে পড়ে। কিন্তু সামলে নেয়, সইয়ে নেয় রম্ভা, চারিদিকের সঙ্কীর্ণ কুঁকড়ে- যাওয়া বিকৃত জীবনের কুৎসিত কদর্যতাকেই একমাত্র চরম সত্য বলে মেনে না নিয়ে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য খুঁজে বার করার চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগে যায়। তখন সে সাহস পায়, তার ধৈর্য আসে। বিরোধ ও বিতৃষ্ণা উবে যায়। কষ্ট থাকে, মনের মধ্যে প্রতিবাদের নিরুপায় নালিশের কষ্ট, কিন্তু তাতে আর তীব্র জ্বালা থাকে না। গাঁয়ের জীবনের নোংরামি কম নেই। তবে সেখানে মানুষ ছড়িয়ে থাকে, ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচে, জীবনের গ্লানি ও আবর্জনা ছড়িয়ে থাকে তফাতে তফাতে। এখানে সংকীর্ণ স্থানে গাদাগাদি করে আছে ঊর্ধ্বশ্বাস স্বার্থপর নিষ্পিষ্ট মানুষ। এই স্তূপীকৃত পাপ ও বিকারের মধ্যে এসে পড়ায় প্রথমে রম্ভা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে সে- ভাবটা তার কেটে যায়।[২]

রম্ভা ধীরে ধীরে রামপালের ওপর হতাশ হয়ে পড়ে এবং তার কাছে মনে হয় কাঠগোলার সেই সুপুরুষ রামপাল এখন আর নেই। কৃষ্ণেন্দু রম্ভার আদর্শের কথা শুনে বিস্মিত হয় এবং রামপালকে উজ্জীবিত ও

১. *দর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১৯

২. *দর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৫৩

অনুপ্রাণিত করে। সে উপলব্ধি করে রম্ভাকেই তাকে তৈরি করে নেওয়া জরুরি। কারণ, দেশের কাজে দশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে আগ্রহী রম্ভা সমাজ-সংসারে নারী-পুরুষ সম্পর্কের গতানুগতিক ধারণাকে লালন করতে চায় না। এ জন্য মদ্যপ অবস্থায় স্বামী রামপাল কর্তৃক মমতাকে আলিঙ্গন করাটাকে রম্ভা 'মাতালের মাতলামি' হিসেবেই দেখেছে। সে সহজভাবেই জীবনকে দেখতে চেয়েছে। রম্ভা কোনো অন্যায় মেনে নিতে রাজি হয়নি। এ জন্য পিতার মৃত্যুতে ভাইদের নিস্পৃহতায় সে হতবাক হয়। পিতার মৃত্যুশোক তার কাছে ক্ষোভে পরিণত হয়। তাই পিতৃহত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে সে অগ্রভাবে অবস্থান নেয় –

> রম্ভার দু-চোখ জ্বলজ্বল করে, সত্যই যেন চোখের আড়ালে মাথার মধ্যে তার আগুন ধরে গেছে। মুখপোড়া ভগবান তাকে মেয়েমানুষ করেছে, তার ভাইগুলোকে করেছে মেয়ে মানুষের বাড়া, নইলে কুকুর বেড়ালের মতো তার বাপকে মেরে হেরম্ব কি আজ বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াতে পারে বুক ফুলিয়ে! রম্ভা তাকে দেখে নিত।...রম্ভার জ্বালা যেন হীরেনের মদের পিপাসার মতোই ক্রমে ক্রমে বেড়ে বেড়ে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।[১]

আরিফ এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। সে শিক্ষকদের কাছে 'ফিউচার ব্রিলিয়ান্ট' হিসেবে সমাদৃত। হঠাৎ করেই ডক্টরেট ডিগ্রির চেয়ে দেশের স্বাধীনতা তার কাছে গুরুত্ব পায়। এজন্য সে গবেষণা বন্ধ করে রাজনীতিতে যোগ দেয়। লেখক তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> আরিফ ভুরু কুঁচকে বলেছিল, ব্রিলিয়ান্ট? ডক্টরেট ডিগ্রি পাব, একটা প্রফেসারি পাব, ছেলে-খেলার একটা ল্যাবরেটরিতে কাজ পাব। হয়ত ভিটামিন সম্পর্কে মস্ত একটা আবিষ্কার করে নবেল প্রাইজ পেয়ে যাব। আমার দেশের কোটি কোটি কঙ্কালের গায়ে এক আউন্স মাংশ বাড়বে?[২]

আরিফের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক বাল্যকাল থেকে। মমতা স্বদেশী আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত। মমতা পার্টির কাজের প্রয়োজনে বস্তিতে গিয়ে বসবাস করতে চায়। কিন্তু বস্তিবাসী তাকে সহজে মেনে নিতে পারে না। মমতা আরিফের কাছে মুসলমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে আরিফ তাতে সম্মতি দেয়। মমতা বলে – 'তা হলে চটপট আমাকে মুসলমান করে নাও। তারপর চলো আমরা একবার ঝুমুরিয়া যাই।'[৩] দুদিন পরে

---

১. *দর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬-৫২৭

২. *দর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬

৩. *দর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯

আরিফ ও মমতা একসঙ্গে ঝুমুরিয়া স্টেশনে পৌঁছায়। একপর্যায়ে কয়েকটি বক্তৃতার জন্য আরিফকে পুলিশ আটক করে।

মমতা এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র। উপন্যাসে হীরেনের সাথে তার বিয়ে হয়। 'হীরেন ও মমতার বিয়ে হয় আশ্বিনের গোড়ায়, পুজোর দিন সাতেক আগে। লোকনাথের বাড়িতে খুব ধুমধামের সঙ্গে পুজো হয়। শিল্পচাতুর্যে অপরূপ দামি প্রতিমা আসে। এবার বিয়ের সমারোহ শেষ হতে না হতে পুজোর সমারোহ আরম্ভ হওয়ায় আনন্দ-ক্লান্ত উৎসব শ্রান্ত বাড়ি-বোঝাই মানুষগুলির কাছে বিজয়া যেন মুক্তির স্বস্তি নিয়ে এল। লোকনাথের কারখানাগুলির সমস্ত লোকেরা এবং মমতার নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসা মজুর ও ধাঙড়রা সবসুদ্ধ তিন দিন পাত পেতে গেল।[১]

একপর্যায়ে মমতা ও আরিফের সম্পর্কে হীরেন সন্দেহপ্রবণ হয় এবং তার এক প্রশ্নের জবাবে মমতা বলে– 'আরিফ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, সকলের চেয়ে ঘনিষ্ঠ, আপন বন্ধু, তার বেশি কিছু নয়। তুমি কি মনে কর ওকে ভালবাসলে ওর বদলে তোমায় বিয়ে করতাম?'[২] মমতাকে হীরেন ঘরোয়া ও স্বামীভক্ত হিসেবে পেতে চেয়েছে। কিন্তু মমতা তাকে তীব্র ভাষায় জানায় :

> দশজন হালকা অপদার্থ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, পার্টি দিয়ে, গান-বাজনা গল্পগুজব পরচর্চা করে আর তোমাদের ফ্যামেলি পলিটিক্স নিয়ে মেতে থেকে জীবন কাটালে তুমি আমার ভালবাসার প্রমাণ পাবে? তুমি তো ভারী সস্তা ভালবাসা চাও। এরকম ভালবাসা দেবার মতো মেয়ের তো অভাব ছিল না হীরেন? ওরকম একজনকে বেছে নিলে না কেন? উথলে-ওঠা ভালবাসায় তোমায় সে ভাসিয়ে দিত।[৩]

উপন্যাসে হেরম্ব খলচরিত্র ও ধনিকশ্রেণির প্রতিনিধি। ঝুমুরিয়া থেকে দুই ক্রোশ দূরে তার 'নয়নাভিরাম প্রাগৈতিহাসিক জন্মচিহ্নের মতো' একটি শালবন রয়েছে। এখানে সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষেরা হেরম্বের ঠিকারিতে বন কাটতে আসে। সেখানে –

> মেয়ে-পুরুষ সাঁওতাল মজুররাই শুধু এখানে অস্থায়ী ঘর-সংসার পেতে বসেছে। ডালপালা লতাপাতা দিয়ে নিজেরাই তারা তিন-চার হাত উঁচু ছোটো ছোটো কুঁড়ে বেঁধে নিয়েছে, ঠিক যেন বয়স্ক শিশুদের খেলার ঘর। ফাঁকায় মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধে, বাঁশের চোঙায় তেল রাখে, পুরু কাগজের মতো ঘন মোটা কাপড়

---

১. *দর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮

২. *দর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬

৩. *দর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

কোমরে জড়ায় আর পিঠে ছেলে বাঁধার বা গায়ে দেবার চাদর করে, কাঠের চিরুনিতে চুল আঁচড়ায়, খোঁপায় ফুল গোঁজে আর বাবরিতে লাল কাপড়ের ফালি জড়ায়। শালপাতার মোটা বিড়ি বানিয়ে টানে, মেয়ে-পুরুষে ভাত বা মহুয়ার মদ খায় আর আগুন জ্বেলে মাদল বাজিয়ে নাচে গায় – সুস্থ সবল সুশ্রী কালো দেহ আর সরল স্বাধীন দৃঢ় মন নিয়ে হিংসাদ্বেষহীন নির্ভয় নিশ্চিন্ত নির্লোভ শান্তিপূর্ণ জীবন কাটায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, ব্যক্তিগত সম্পদের বোধ নেই, ভেদাভেদ বোঝে না। দলের প্রধান দলেরই দান, দলের ইচ্ছায় সে প্রধান, অনিচ্ছায় নয়। মেয়েরা স্বাধীন, সমান, সম্মানীয়া – সভ্যজগতের স্বাধিকারচ্যুতা সমস্ত নারী যখন পরাধীন পণ্য মাত্র।[১]

একদিন হেরম্ব এক সাঁওতাল মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে সাঁওতালরা ক্ষিপ্ত হয়। নিরুপায় হয়ে হেরম্ব ঝুমুরিয়া ফিরে যায়। ফসল কাটার সময় সে অনেক চেষ্টা করেও লোক জোগাড় করতে পারে না। তার ধারণা – বীরেশ্বরের জন্যই শ্রমিকরা কাজে আসে না। হেরম্ব এজন্য প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে বীরেশ্বর ও জালালুদ্দিনকে হয়রানি করে। জেলখানায় নিউমোনিয়ায় জালালুদ্দিনের মৃত্যু হয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনকে একীভূত করেছেন। শহরের শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে গ্রামের কৃষকসমাজের মেলবন্ধনে আন্দোলনকে যে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া যায় – তা লেখক সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন এ-উপন্যাসে। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি শোষক ও শোষিত সমাজের স্বরূপ এ-উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন। 'স্বাধীনতা-পূর্ব জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যের মধ্যে হেরম্বদের বিরুদ্ধে নতুন ঐতিহ্য মানিক এই উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন।'[২] *দর্পণ* উপন্যাসে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা দেখানো না হলেও এ ধরনের সমাজব্যবস্থার বীজ রোপণ করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিহ্ন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্ন একটি নির্ভেজাল রাজনৈতিক উপন্যাস। মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তাঁর কর্মের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। নিজেকে অভিজ্ঞতালোক সমৃদ্ধ করবার জন্যে চল্লিশের দশকের সেই মধ্যকালে মানিক পড়তেন বিজ্ঞানের বই, নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন প্রগতি সংঘের বৈঠকে, কৃষক আন্দোলনের খবর রাখতেন

---

১. *দর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮

২. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

নিয়মিত, নির্জনতা-প্রিয় মানুষটি বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে অতি অনায়াসে মিশতে পারতেন। ছাত্রদের মিছিলে ঢুকে পড়তেন যখন-তখন, পার্টির নির্দেশে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মীরূপে অনলস পরিশ্রম করেন, ১৯৪৬-এর কুখ্যাত দাঙ্গায় শান্তি প্রচারের জন্য উপদ্রুত অঞ্চলে ঘুরে ফেরেন (শুনতে হয় বিদ্রূপ – শ্যালা কমিউনিস্ট, "মুসলমানদের দালাল"), নৌবিদ্রোহের রসিদ আলী দিবসের বা ২৯শে জুলাইয়ের উত্তেজনাময় দিনগুলিতে তাঁকে কখনও দেখা যায় মজদুরদের মিছিলে, কখনও ছাত্রদের সঙ্গে বসে থাকেন রাস্তায়। শিল্পী এভাবেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্য থেকে সংগ্রহ করেন লেখনী-রসদ। সমকালীন বাংলার সেই সংঘাতময় পরিস্থিতির অসামান্য শিল্পস্মারক *চিহ্ন* (১৯৪৭)[১] উপন্যাস।

চিহ্ন উপন্যাসের ঘটনাংশ মানিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। এ-প্রসঙ্গে তিনজন সমালোচকের বর্ণনা-ভাষ্য উল্লেখযোগ্য। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে :

> নৌবিদ্রোহ, রসিদ আলি দিবস ইত্যাদির যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল, তাকেই তিনি ধরতে চাইলেন উপন্যাসের অর্জিত অভিজ্ঞতায়, হয়তো ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি-তে ছাত্রদের অবস্থানের ওপর পুলিশের গুলি চালনার বাস্তব ঘটনাই তাঁর এ উপন্যাসের অব্যবহিত পটভূমি। এর সঙ্গে তাঁর নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও যুক্ত থাকতে পারে।[২]

সরোজমোহন মিত্রের মতে :

> বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের পাশে ধর্মতলার মোড়ে ঐ দিন পুলিশ বিরাট ছাত্র মিছিলের গতিরোধ করে, ফলে শুরু হয় অবস্থান। সারারাত ধরে ঐ অবস্থান চলে। মাঝে মাঝে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশী প্ররোচনা চলে। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে পুলিশ গুলি চালায়। শহীদ হয় রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আবদুস সালাম। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মানিক রচনা করলেন এক নতুন ধরনের উপন্যাস। নতুন আঙ্গিকে লেখা এই উপন্যাস কোন এক ব্যক্তি বিশেষের কাহিনী নয়। রাজপথের নানা মানুষকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে। এ যেন মিছিলের মহাকাব্য।[৩]

হায়দার আকবর খান রনোর মতে :

---

১. 'চিহ্ন' উপন্যাসটি প্রকাশ করেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির। এর প্রকাশকাল মাঘ, ১৩৫৩। উদ্ধৃত, সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৯, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ.৮১

২. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, "*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' ও 'উত্তরণ'*", ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (সম্পা.), *উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৪৮৫

৩. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৯, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ৮২

> ১৯৪৬ সালে কলকাতায় রশিদ আলি দিবসে যে রাজনৈতিক গণজাগরণ ঘটেছিল এবং পাশাপাশি ইংরেজ শাসকরা যে বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, সেই পটভূমিতেই লেখা হয়েছিল চিহ্ন উপন্যাসটি। রাজনৈতিক উপন্যাস।... সংগ্রামের ময়দানে দাঁড়িয়ে মানুষগুলো কেমন বদলে যায়, রাজনীতিবিমুখ মানুষও সক্রিয় রাজনৈতিক যোদ্ধায় পরিণত হয়, উচ্চতর আদর্শ মানুষকে কত মহান করে তোলে। দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্য দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী নেতৃত্বের সম্পর্কে সতর্কতার কথাও তিনি গল্প বলার ছলে উল্লেখ করেছেন।[১]

চিহ্ন উপন্যাসের বিষয় গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক বাস্তবতা। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। এ বছরের নভেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনাসদস্যের দণ্ডের প্রতিবাদে দেশজুড়ে শুরু হয় তীব্র আন্দোলন । '১৯৪৫ সালের ২১-২৩ নভেম্বরে আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস উপলক্ষে কলকাতার ধর্মতলা মোড়ে সংঘটিত সাধারণ ছাত্র-জনতার আন্দোলন, অবস্থান, পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলি, মৃত্যু প্রভৃতি সত্যঘটনা 'চিহ্নে'র পটভূমি। অবশ্য ১৯৪৬ সালের ১১-১৬ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজ সদস্য রসিদ আলির দণ্ডাজ্ঞা বাতিল ও মুক্তির দাবিতে সংঘটিত জনবিদ্রোহও এই উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসে ব্যবহার করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।'[২] এ-প্রসঙ্গে মানিক-গবেষক সৈয়দ আজিজুল হক তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে বলেছেন :

> মানিকের চিহ্ন উপন্যাস প্রধানত নভেম্বর ১৯৪৫-এর ঘটনাকে পটভূমি করে রচিত হলেও এতে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এর উত্তাল প্রসঙ্গগুলির আভাস ক্ষীণ হলেও আছে।[৩]

কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পার্শ্ববর্তী ধর্মতলার মোড় *চিহ্ন* উপন্যাসের পটভূমি। মাত্র দুদিনের সময়-পরিসরকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে এর ঘটনাংশ। ধর্মতলার মোড়ে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট, দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ, পুলিশের লাঠিচার্জ, অশ্বারোহী পুলিশ কর্তৃক সাধারণ জনতার ওপর নির্বিচার হামলা, গুলি, বহু মানুষের হতাহতের ঘটনা, এবং পরিশেষে সংঘশক্তির বিজয় প্রভৃতি ঘটনার চিত্রাঙ্কনে উপন্যাসটি সমৃদ্ধ। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবস্থানটিকে কেন্দ্র করে সমাজেরই একটি

---

১. হায়দার আকবর খান রনো, *'উত্তরকালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮, পৃ. ৩৩১

২. গিয়াস শামীম, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, ভাষাপ্রকাশ, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৮০

৩. সৈয়দ আজিজুল হক, "চিহ্ন' এবং 'ঝড় ও ঝরাপাতা"', *কথাশিল্পী মানিক*, কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ২৩৩

মিনিয়েচার নির্মাণ করেন – প্রায় সব শ্রেণী ও স্তরই উপন্যাসটির কাঠামোয় অঙ্গীভূত হয়। আধুনিক বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের শ্রেণীগত শোষণ, অত্যাচার, কালোবাজারী কুৎসিত ব্যবসা যেমন আসে, তেমনি আসে মানুষের লড়াই, আত্মমর্যাদার জন্য সংগ্রাম।[১]

চিহ্ন উপন্যাসে আদ্যন্ত সমগ্র কোনো প্লট নেই। কোনো একটি কাহিনিকে কেন্দ্র করে এটি গড়ে ওঠেনি। এখানে রক্তমাংসময় কোনো নায়ক চরিত্রও নেই। এখানে আছে অজস্র ধারা, অজস্র চরিত্র। প্রত্যেকটি ধারা এসে পরিশেষে মিশে গেছে ধর্মতলার মোড়ে; বিপুল জনতার অপ্রতিরোধ্য অবস্থানে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্য এইখানে যে, প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হলেও পরিশেষে তারা একটি একক ও নির্দিষ্ট ঐক্যে একীভূত হয়েছে এবং লেখকের জীবনাদর্শের অভিমুখী হয়েছে। 'স্বভাবে বিভিন্ন হলেও প্রত্যেকটি চরিত্র মহৎ মানবিক প্রতিরোধ ও সংগ্রামে আশ্চর্যভাবে ঐক্যবদ্ধ। চরিত্রগুলোর কেউ শিক্ষার্থী, কেউ শ্রমিক, কেউ নারী, কেউ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কিংবা অযুক্ত, কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম; এককথায় সকল স্তরের মানুষ। চরিত্র যে স্তরেরই হোক, অজানা এক আকর্ষণে সবাই ঐক্যবদ্ধ; যারা যুক্ত হতে চায়নি তারাও ঐক্যবদ্ধ।'[২]

চিহ্ন উপন্যাসের কাহিনি আরম্ভ হয়েছে একুশ-বাইশ বছরের যুবক গণেশকে নিয়ে। সে কলকাতায় 'বিদ্যুৎ লিমিটেড' নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী এন. দাশগুপ্ত চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত। তার ছিল অবৈধ মদ ও নারীব্যবসা। এই প্রতিষ্ঠানেই পণ্য সরবরাহের কাজ করে গণেশ। ধর্মঘটের দিনে গণেশকে জেমস স্ট্রিটের এল. ক্যামারন নামক জনৈক বিদেশির কাছে মদ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিয়েছিল দাশগুপ্ত। কিন্তু রাজপথে বিপুল সংখ্যক মানুষের অবস্থান আর পুলিশি মহড়া দেখে সে থমকে যায়। গলির ধারের নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে সে বিপুল বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে তাদের গতিবিধি দেখতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে জনতার এই অবস্থানকে হাঙ্গামা মনে করলেও একপর্যায়ে সে তার অজান্তেই এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। তার মনে হয় :

---

১. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' ও 'উত্তরণ'", ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (সম্পা.), *উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৪৮৭

২. গিয়াস শামীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

> হাঙ্গামা যে এমন অনড় অটল ধীরস্থির হয়, বন্দুকধারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ এদিক-ওদিক এলোমেলো ছুটোছুটি করে না, এ তার ধারণায় আসে না। এ কেমন গণ্ডগোল যেখান থেকে কেউ পালায় না! তাই, চলে যাবার কথা মনে হয়, তার পা কিন্তু অচল। কেউ না পালালে সে পালাবে কেমন করে।[১]

জনতার আন্দোলন-সংগ্রামে একাত্ম গণেশ গুলিবিদ্ধ হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর প্রাক-পর্যায়ে অচেনা ওসমানকে সে ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করে : 'এরা এগোবে না বাবু ?'[২] প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন যদি যৌক্তিক ও গণমুখী হয় তবে তা যে একটি রাজনীতিবিমুখ সাধারণ চরিত্রকেও বদলে দিতে পারে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই গণেশ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রের মাধ্যমে আন্দোলনের গণমুখী চরিত্রের স্বরূপ অসাধারণভাবে চিত্রিত করেছেন।

উপন্যাসে গণেশের মৃত্যুসূত্রে গ্রন্থিত হয়েছে ওসমান-রসুল প্রসঙ্গ। ওসমান কারখানা-শ্রমিক, থাকে শিয়ালদার নিকটবর্তী একটি বস্তিতে। সে-ই গুলিবিদ্ধ গণেশকে পৌঁছে দিয়েছিল হাসপাতালে। তার চেতনায় বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল গণেশের শেষ উচ্চারণ – 'এরা বসে দাঁড়িয়ে থাকবে বাবু? এগোবে না?'[৩]
পরদিন ভোরে ওসমানের ঘুম ভাঙে। এদিন সে ধর্মঘটের সমর্থনে কাজে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বস্তির অন্য শ্রমিকরাও তার সিদ্ধান্তে সায় দিলে বৃদ্ধ ওসমানের মনোবল বেড়ে যায় আরও বহুগুণ –

এক অফুরন্ত বিশ্বাস ও দৃঢ়তা অনুভব করে ওসমান। সবাই যখন এক হয়ে গেছে এগোবার প্রতিজ্ঞায়, নির্দেশ দিতে হয় নি নেতাদের, এমন অকারণ অর্থহীন অত্যাচারের প্রতিবাদও সবাই করবে এক হয়ে, কাউকে বলে দিতে হবে না। এ সিদ্ধান্তের একটা অদ্ভুত সমর্থন অনুভব করে ওসমান, শুধু তার ভিতরের বিশ্বাসে নয়, বাইরে থেকেও যেন বহু লোকের সমর্থন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে।[৪]

অন্যদিকে ধর্মঘটের সুযোগে হানিফ ও বুধুলালের মতো গুণ্ডাশ্রেণি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। তারা দোকানপাট ভাংচুর ও লুটপাট করার চক্রান্ত করে। তবে ওসমানের নেতৃত্বে বস্তিবাসীরা এদের অপচেষ্টা প্রতিহত করে। ওসমান এরপর গণেশের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। হাসপাতালের পথে ওসমান

---

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *চিহ্ন*, উদ্ধৃত : সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, *তৃতীয় খণ্ড*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই-২০১৭, পৃ. ১৬৩

২. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৩. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৪. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

অগণিত মানুষের জটলা দেখে। বিক্ষুব্ধ জনতা গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে এবং স্লোগান দিচ্ছে – 'জয় হিন্দ!' 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ।' 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।'[১]

চিহ্ন উপন্যাসের লেখক সচেতনভাবেই শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক সংগ্রামের কথাও তুলে ধরেছেন। দুর্ভিক্ষের সময় কলেজ-পড়ুয়া রসুল লেখাপড়া ছেড়ে চলে আসে নিজগ্রাম চিরবাগীতে। সে দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত গ্রামবাসীর জন্য 'রিলিফ সেন্টার' খোলার চিন্তা করে। তবে তার কাজের বিরোধিতা করে 'অন্যায় অনাচার নোংরামি চোরাকারবারি'র সঙ্গে যুক্ত জমিদার শ্রীচপলাকান্ত বসু। রসুলকে নিবৃত্ত করতে তিনি তাঁর নায়েব নকুড় ভট্টাচার্যের পরিবর্তে নিয়োগ দেন জিয়াউদ্দীনকে। 'গাঁয়ের শতকরা আশি জন প্রজা মুসলমান। আসল নায়েব নকুড় ভট্টাচার্য, শাসন চালায় জিয়াউদ্দীন – শত অত্যাচার চালালেও কেউ যাতে না বলতে পারে যে হিন্দু অত্যাচার করেছে মুসলমানের উপর।'[২]

রসুল নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকায় জমিদার তার পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেয় এবং তাকে আহত ও রক্তাক্ত করে। তারপরও –

> ... রসুল থামে নি। চালা তুলেছিল, খাদ্য জুগিয়েছিল, ভলান্টিয়ার গড়েছিল – নিজে পেছনে থেকে। খিচুড়ি বিতরণ আরম্ভ করার আগের দিন বিকালে লালদিঘির ধারের মাঠে সভার আয়োজন করেছিল – নিজে পেছনে থেকে। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ডাকা সেই সভায় কি করে দাঙ্গা বেঁধেছিল রসুল জানে না, সভার এক কোণে দাঙ্গা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে লাল পাগড়ির আবির্ভাব হয়েছিল তাও সে বুঝতে পারে নি। লাঠির ঘায়ে কপাল ফাঁক হয়ে হাজার ফুলকি দেখে ঘুরে পড়বার ঠিক আগে এক লহমার জন্য লাল পাগড়ির নিচেকার মুখটি সে দেখেছিল, আজো সেই পৈশাচিক আক্রোশে বিকৃত মুখের ছাপ তার মনে আঁকা হয়ে আছে। কেন এই আক্রোশ? কেন এই বীভৎস হিংসা।[৩]

শোষকশ্রেণির বাস্তব ও বিকৃত রূপকে মানিক তুলে ধরেছেন এখানে। শোষকের চরিত্র গ্রাম কিংবা শহরে অভিন্ন। তারা শোষণপ্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য হীনচক্রান্ত করতেও দ্বিধাবোধ করে না, এমনকি রাষ্ট্রীয় শক্তিকেও তারা নানাভাবে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে দাশগুপ্ত, জমিদার শ্রী চপলাকান্ত ও খান বাহাদুরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন। গণেশ, রসুল, আবদুল, হাবিব তাদের শোষণের শিকার।

---

১. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

২. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

৩. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

কলকাতা শহরেও রসুল থেমে থাকেনি। আন্দোলনের একপর্যায়ে তার ডানহাত গুলিবিদ্ধ হয়। প্রবল যন্ত্রণাকে সামলে নিয়ে এসময় সে নির্বিকারচিত্তে সহযোদ্ধা ওসমানকে উদ্দেশ্য করে বলে :

বাঁ হাতে সব হয়তো আবার অভ্যাস করতে হবে। সাইকেল চালিয়ে কলেজে যেতে অসুবিধে হবে না এক হাতে কিন্তু–'[১]

রাতের অন্ধকারে পুলিশের পাহারা এড়িয়ে রসুল মাকে দেখার জন্য হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসে। সন্তানের রক্তাক্ত হাত দেখে আমিনা বিলাপ শুরু করে। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নেয়। 'ছেলেটা আজাদির জন্য অনায়াসে মরতে পারে, মরবার জন্য তৈরি হয়ে আছে, টের পাবার পর থেকে আমিনার মনের এই জোরটা হু হু করে বেড়ে গেছে।'[২]

শেষরাত্রে আবদুল রসুলকে ফিরিয়ে নিতে এলে মা আমিনার মনে হয় তিনি কেবল রসুলেরই মা নন, আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত সবারই তিনি মা। এ-পর্যায়ে তাঁর আত্মোপলব্ধি লক্ষণীয় :

কে নিজের ছেলে কে পরের ছেলে ভাববার ক্ষমতা নিজের ছেলেই তার লোপ পাইয়ে এনেছে ক্রমে ক্রমে। অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে হতাহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে। আর এমন এক বন্ধুকে সঙ্গে এনেছে রসুল, দুদণ্ড যার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে, রসুলের মতোই সে তার চেনা-জানা, নিজের বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ করা সন্তান![৩]

উপন্যাসে গণেশ প্রসঙ্গে উঠে এসেছে এন. দাশগুপ্তের ব্যবসা প্রসঙ্গ। বিদ্যুৎ লিমিটেডের আড়ালে তার রয়েছে বেনামি ঘরোয়া হোটেল, নাইট ক্লাব ও বার। যুদ্ধকালীন বাস্তবতায় অনৈতিক ব্যবসার মাধ্যমে একশ্রেণির মানুষ কীভাবে সম্পদশালী হয়েছে তা এ-প্রসঙ্গে প্রদর্শন করেছেন মানিক। এসব ব্যবসায়ী মানবিক অনুভূতি হারিয়ে যে পশুত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গণেশের মৃত্যুপরবর্তী পর্যায়ে তার পরিবারের সঙ্গে এন. দাশগুপ্তের বিরূপ আচরণসূত্রে। গণেশের মৃত্যুর জন্য নয়, দাশগুপ্তের সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেবলই তার ব্যবসার ভবিষ্যৎ নিয়ে। দেশ, মানুষ কিংবা মানবমুক্তির আন্দোলনের প্রতি তার কোনো আগ্রহই নেই। বরং –

---

১. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

২. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৩. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

ভাবলেও গা জ্বালা করে দাশগুপ্তের। যে দিক থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা করে নি, ঠিক সেই দিক থেকে এই বিপদ এল! দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলা যায় একে। জ্বালা বেড়ে গেল এই ভেবে যে গেঁয়ো ছেলেটা বোধহয় নিছক কৌতূহলের বশেই রাস্তার হাঙ্গামা হৈচৈ দেখতে দাঁড়িয়েছিল, গুলি লেগে যে বজ্জাত ছোকরাগুলো নিছক বজ্জাতি করার ঝোঁকে গুলির সামনে বাহাদুরি করছে তাদের বদলে সেই গেল মরে! ওর নাম-ঠিকানা আবিষ্কার করতে গিয়ে এখন বেরিয়ে পড়বে তারা চোরা মাল চালান! হাসপাতালে কে তাকে খাতির করে? কে অনুভব করবে যে ব্যাপারটা চাপা দেওয়া দরকার? হয়তো হৈচৈ পড়ে যাবে। হয়তো কোনো উপায় থাকবে না তাকে টানাটানি না করে। নিজেদের বাঁচাবার জন্য বাধ্য হয়ে হয়তো তাকেই বলি দেবে বড় কর্তারা, যাদের হাতে নোট পাবার হাত চুলকানি শান্ত করতে তার প্রাণান্ত।[১]

রাজপথে আন্দোলনরত 'বজ্জাত ছোকরাগুলো'র প্রতি এন. দাশগুপ্তের কোনো আগ্রহ কিংবা সহানুভূতি নেই, বরং সে হাসপাতাল থেকে চোরাই মাল উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে সে পরামর্শ করে 'পরম বিশ্বাসী ধূর্তশ্রেষ্ঠ' কর্মচারী চন্দ্রের সঙ্গে; কারণ তার প্রতিষ্ঠানের অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করে চন্দ্র। যুদ্ধের বাজারে দশগুপ্তের মতো সেও অনৈতিক পন্থায় অঢেল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে। তবে শেষাবধি সিদ্ধান্ত নেয় স্বয়ং দাশগুপ্ত এবং বলে :

> হাসপাতালে হট্টগোল চলছে, সুযোগ বুঝে মালটা সরিয়ে আনা চলতে পারে। যদি ফ্যাকড়া বাঁধে, পিটারের চিঠি দেখালেই হবে। বললেই হবে ফ্রুট্স আছে, খারাপ হয়ে যাবে বলে সরিয়ে নিচ্ছি। তখন গণেশকে আইডেন্টিফাই করব। ফ্যাকড়া কিছু হবে না মনে হয়। দোকানের একটা চাকর, তার জন্য কে মাথা ঘামায়?[২]

যে-মুহূর্তে গণেশ হাসপাতালের মর্গে, ঠিক সে-মুহূর্তে মধুখালী গ্রামে তার পরিবার যাপন করছে ভয়ার্ত ও বিপর্যস্ত জীবন। 'ভাগচাষের বাটোয়ারা আর বেগার খাটা নিয়ে' বিরোধের প্রেক্ষাপটে তার ছোট বোন রাণীকে ধরে নিয়ে গেছে সেনাবাহিনীর ব্যারাকে। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এবং ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দেয়। সহানুভূতিশীল গ্রামবাসী গণেশের পিতা যাদবকে সপরিবারে শহরে চলে যাবার পরামর্শ দেয়। অনন্যোপায় যাদবরা তাই রওনা হয় শহরের পথে; যেখানে অবস্থান করছে গণেশ। গাড়িতেই তারা কলকাতার দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর পায়। এমতাবস্থায় গণেশের মা সন্তানের জন্য বিচলিত হয়ে পড়ে। কলকাতায় এসে তারা দেখতে পায়, 'বড় একটা গাড়ি দাউ দাউ করে পুড়ছে মোড়ের মাথায়, এ পাশে পুড়ে

---

১. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৮

২. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

কালো হয়ে কঙ্কাল পড়ে আছে দুটো ছোট গাড়ির। ইটপাটকেলে ভরে আছে রাস্তা। এ ধারে এক পাশে কয়েকজন মিলিটারি সায়েব আর একদল গুর্খা সেপাই দাঁড়িয়ে দেখছে, ওধারে মোড়ের মাথা থেকে রাস্তার ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত লোকারণ্য, এমন আওয়াজ তুলেছে তারা যেন অনেক গণ্ডা আহত বাঘ ফুঁসছে এক সাথে। স্টেশনের বাইরে তখন একটি গাড়ি দাউ-দাউ করে পুড়ছে। রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে ইট-পাটকেল, পাশেই সেনাবাহিনীর সতর্ক পাহারা। রাস্তার মোড়ে দেখা যায় জনসমাগম, সেখানে তারা এমন আওয়াজ তুলছে যেন 'অনেক গণ্ডা আহত বাঘ ফুঁসছে একসাথে।'[১] অবশেষে গোলযোগময় কলকাতায় অজয় নামের এক যুবকের সহযোগিতায় গণেশের বাবা-মা-বোন পৌঁছে যায় 'বিদ্যুৎ লিমিটেডে'র নির্ধারিত ঠিকানায়।

গণেশের বাবা-মার আগমন সংবাদে দাশগুপ্ত ধূর্ততার আশ্রয় নেয়। গণেশ কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেছে – এমন মিথ্যা গল্পও সে পরিবেশন করে। একইসঙ্গে রাণীর দিকে সে লালসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এবং এদের আশ্রয়দানে মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু লোকটির চাহনি রাণীর ভালো লাগেনি। তাই পিতাকে নিয়ে সে হাওড়ায় প্রতিবেশী কেশব বদ্যির ছেলের ঠিকানায় পাড়ি জমায়।

চিহ্ন উপন্যাসে বহমান অনেকগুলি কাহিনির একটি হেমন্ত-সীতা প্রসঙ্গ। পিতৃহারা হেমন্ত কলেজের মেধাবী ছাত্র। সে কখনও রাজনীতি করেনি। এমনকি রাজনৈতিক আলোচনাও সে সচেতনভাবে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। সীতা তার সহপাঠিনী; রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট চরিত্র। সে চায় হেমন্তও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখুক, রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে যোগ দিক। কিন্তু হেমন্ত মনে করে, 'রাজনৈতিক সভায় যোগ দেওয়া কোনো ছাত্রের উচিত নয়। ছাত্রজীবনে রাজনীতির স্থান নেই। লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার সময় হাতে-কলমে রাজনীতি চর্চা করা তাস পিটে আড্ডা দিয়ে হৈচৈ করে সময় আর এনার্জি নষ্ট করার মতোই অন্যায়। ছাত্রের কাছে রাজনীতি শুধু অধ্যয়নের বিষয়, কোলাহলমত্ততা, দলাদলি, সংঘাত থেকে দূরে থেকে শান্ত সমাহিত চিত্তে তাপসের সংযত শোভন জীবনযাপন করবে ছাত্র।'[২] রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণ হেমন্ত 'নিছক খেয়ালের বশে নয়', এক অজানা আকর্ষণে উজ্জীবিত হয়ে যোগ দেয় ধর্মতলার সমাবেশে; এবং একাত্ম হয়ে যায় সমাবেশের সঙ্গে :

১. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

২. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

প্রদীপ্ত মুখগুলি, নির্ভীক চোখগুলি আশপাশের ছাড়া-ছাড়া কথা ও আলোচনার টুকরোগুলি, সমস্বরে শ্লোগান উচ্চারণের ধ্বনিগুলি আর অনুভূতির এক অদ্ভুত দুরন্তপনা তাকে আটকে রেখেছে।[১]

মায়ের জন্য পিছুটান থাকলেও সে শেষাবধি রাজপথ ছাড়েনি। ফলে এদিন বাড়ি ফিরতে তার বিলম্ব হয়। ইতোমধ্যে রমার মাধ্যমে মা অনুরূপা শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর জানতে পারে। সঙ্গতকারণেই তিনি হেমন্তের জন্য চিন্তিত ও বিচলিত বোধ করেন। সীতার সংস্পর্শে ছেলে তাঁর ছেলে বেপথু হচ্ছে – এমনটি তার ধারণা। এজন্য তিনি সীতাকেই দায়ী করেন। প্রত্যুত্তরে সীতা হেমন্তের মা অনুরূপাকে বলে :

আমার সঙ্গে মেশার জন্য আপনার ছেলে বদলায় নি। অত বড় গৌরব দাবি করবার অধিকার আমার নেই। হেমন্ত নিজেই বদলেছে, স্বাভাবিক নিয়মে। দেশের এই অবস্থা, এটা বুঝতে পারেন না যে সবকিছুর মধ্যে এদেশের রাজনীতি জড়িয়ে আছে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে হলে তাকে তালাবদ্ধ করে রাখা দরকার? শত শত আঘাত এসে ওকে সচেতন করে তুলবে, সামলাবেন কি করে ? স্বাধীনতার প্রেরণাই ওকে জাগিয়েছে, দেশপ্রেমের আলোই ওকে পথ দেখিয়েছে। আপনার কথা সত্যি, আমি পেরে থাকলে আমিই নিজেকে কৃতার্থ ভাবতাম মাসিমা। কিন্তু তা হয়নি। আমি তো তুচ্ছ, নেতাও কি মানুষকে জাগাতে পারেন? মানুষের মধ্যেই জাগরণ আসে, নেতা শুধু তার প্রতিনিধিত্ব করেন।[২]

বাড়ি এসে হেমন্ত নিঃসঙ্কোচে মায়ের মুখোমুখি হয়; তার মধ্যে কোনো ভয়-ডর থাকে না। মা কৈফিয়ত তলব করলে সে অকপটে বলে :

এই ভাবের ভয়ভাবনার জবাবটা আজ পেয়েছি মা, এত দিন পরে। লেখাপড়ার জন্য কি সব ছাড়া যায়? তোমাকে কিংবা রমাকে যদি একটা গুণ্ডা আক্রমণ করে, আমি যদি স্পষ্ট বুঝতে পারি তোমাদের বাঁচাতে গেলে লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে যাবে, ব্রেনটা খারাপ হয়ে যাবে, জীবনে লেখাপড়া কিছু আর হবে না আমার – তাই ভেবে কি তখন চুপ করে থাকব? কি হবে সে লেখাপড়া দিয়ে আমার। তবে এটাও ঠিক যে, ও হল বিশেষ অবস্থা। অবস্থাবিশেষে লেখাপড়ার কথা ভাবারও মানে হয় না। লেখাপড়া করাই যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাই বলে সাধারণ অবস্থায় লেখাপড়া করব না কেন? তাই তো কাজ আমার।[৩]

---

১. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

২. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৩. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

হেমন্তের বক্তব্যের পাল্টা-উত্তর অনুরূপার জানা নেই। তিনি কর্মজীবী ও বুদ্ধিমতী নারী; দুটি ছেলে হেমন্ত-জয়ন্ত ও মেয়ে রমাকে নিয়ে তাঁর সংসার। গানের টিউশনি করে তিনি পারিবারিক ব্যয়নির্বাহ করেন। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, পৃথিবীজুড়ে যুদ্ধের ঘনঘটা তার পরিবারকে আক্রান্ত করুক – এটি তিনি চান না। তাঁর মনে হয়, ওসব 'দূরের বিপদ, বহু দূরের'। তাঁর এ ছোট্ট সংসারে এর আঁচড় লাগবে না। কিন্তু দেশপ্রেমের কাছে তাঁর এই অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষা শেষাবধি তুচ্ছ প্রমাণিত হয়। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জয়ন্তও আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেও তার সমবয়সীদের সঙ্গে রাজপথে 'ইনক্লাব, জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম্' – স্লোগান দিতে থাকে। বড় মোড়ে মিলিটারির চারটা লরি পোড়ানো দেখে সে শিহরিত হয়। আন্দোলকারীরা রাস্তায় একটি গাড়িও চলতে দেবে না – এ বিষয়টি কৌতূহলী করে তোলে নয় বছর বয়সী শিশিরকে। এ-প্রসঙ্গে কিশোরবয়সী জয়ন্ত, শিশির, অশোক, ময়নার কথোপকথনের মাধ্যমে যে-সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে – গণমানুষকেন্দ্রিক এই রাজনীতি কিংবা আন্দোলন এই কিশোরদেরকেও অন্দোলিত করেছে, দেশের কল্যাণকামনায় তাদের উদ্দীপিত করেছে। প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয় :

> শিশির জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন গাড়ি চলবে না ভাই?
> জয়ন্ত – তের বছরের জয়ন্ত, ন' বছরের ছেলের প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, 'জানিস না ? গুলি করবে কেন ? এটা আমাদের দেশ, আমরা যা খুশি করব। ওরা গুলি করবে কেন?'
> অশোক বলেছিল, 'তাছাড়া আমাদের স্বাধীনতা চাই তো। পরাধীন হয়ে থাকব কেন শুনি?'
> মনা সায় দিয়েছিল, 'বাবা বলে, আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি, তাই স্বাধীনতা পাই না। আমরা তাই এক হয়েছি। দেখছিস না? এই দ্যাখ।'[১]

তাদের শিশুমনের স্বপ্ন আর প্রত্যয় নিয়ে ক্ষুধাকাতর দেহ নিয়ে একসময় তার ফিরে আসে গলির মোড়ে, এবং 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম। ইনক্লাব' শ্লোগানে দশদিক মুখরিত করে তোলে। অতঃপর, মুহূর্তেই –

> মনার গায়ে ঢলে জয়ন্ত রাস্তায় আছড়ে পড়ে। উঠবার যেন চেষ্টা করছে এমনি করে নড়েচড়ে কয়েকবার। দুবার কাশে রক্ত তুলে। তারপর নিস্পন্দ হয়ে যায়।[২]

---

১. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

২. চিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

চিহ্ন উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র অক্ষয়। এই চরিত্রটির প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনীকার সরোজমোহন মিত্র বলেছেন :

> এই উপন্যাসে অক্ষয় নামে যে চরিত্র আছে সেই অক্ষয় মানিক নিজে। ধর্মতলার মোড়ে যেদিন ছাত্ররা পথ আটকে পুলিশের মুখোমুখি বসেছিল সেদিন মানিক ওদিকে গিয়েছিলেন রোজকার নিশার তাগিদে। সেদিনের ব্যাপার দেখে তিনি মদ না খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। এই উপন্যাসে মানিকের মদ খাওয়ার জন্য সুন্দর আত্মসমালোচনা ও অনুশোচনা ফুটে উঠেছে।[১]

উপন্যাসে অক্ষয় মদের নেশায় আসক্ত এক ব্যাংক কর্মকর্তা। তিনি প্রতিদিন স্ত্রী সুধার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেন মদ খাবেন না বলে, অথচ প্রতিদিনই বাড়ি ফেরেন নেশায় বুঁদ হয়ে। রাজপথের আন্দোলনে তাঁরও মনোজগতে পরিলক্ষিত হয় বিস্ময়কর পরিবর্তন; প্রাত্যহিকতায় ঘটে ছেদ। অফিস ছুটির পর অবস্থান ধর্মঘটের কেন্দ্রে এসে তিনি দেখতে পান –

> গুলির আওয়াজে কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক আর বাতাস, আহত হয়ে পড়ে যাচ্ছে মরে যাচ্ছে আশপাশের মানুষ, মানুষ তবু নড়ে না, মৃত্যুপণ করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। নিজের চোখে দেখেছে ঘটনা এখনো শেষ হয় নি। রাজপথের রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত নাটকের রোমাঞ্চকর মর্মান্তিক অভিনয়, তবু যেন সে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না এ ব্যাপার সত্যই ঘটেছে, এখনো রাস্তা জুড়ে জেদী মানুষগুলি প্রতীক্ষা করছে এরপর কি ঘটে দেখা যাক! উত্তেজনায় দেহ-মন তার কেমন হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে কেমন করছে। ... আজ এই বিশেষ দিনে এই বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে একটু যদি সে খায়, একটা কি দুটো মাত্র পেগ, এমন কি দোষের হবে সেটা?[২]

অক্ষয়ের মনে হয়, আজকের এই ব্যতিক্রমী দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য হলেও তাঁর মদ্যপান প্রয়োজন। ঠিক নেশার জন্য নয়, মনের জোর বাড়ানোর জন্য –

> ... কি হয় একটু খেলে? আজকের মতো পেগ খাবার এমন দরকার তো তার কোনোদিন আসে নি। শুধু শখ করে নেশার জন্যই খেয়েছে এতদিন। আজ একটু খেয়ে মাথাটা ঠিক করে নেওয়া তার বিশেষ প্রয়োজন, মনের একটু জোর না বাড়ালে তার চলবে না। দরকারের সময় ওষুধ হিসাবেও তো মদ খায় মানুষ?[৩]

---

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *চিহ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

৩. *চিহ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

যে-মুহূর্তে অক্ষয় মদ খাওয়া-না খাওয়ার দ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত ঠিক সে-মুহূর্তে অফিসের সহকর্মী মনমোহনের সঙ্গে ফুটপাথে দেখা হয় তাঁর। অন্যদিনের মতো অক্ষয়কে এড়িয়ে যায় না মনমোহন; বরং একটুখানি মমতা বোধ করে। মদ কীভাবে অক্ষয়কে এলোমেলো করে দিয়েছে তা মুহূর্তের জন্য ভাবিয়ে তোলে তাকে –

> মমতা সে একটু বোধ করে অক্ষয়ের জন্য, তার চেয়ে বেশি হয় তার আফসোস। কোন স্তরে মানুষকে টেনে নিয়ে যায় মদ! এই সেদিনও সুস্থ, সুখী, স্বাভাবিক ছিল এই মানুষটা। ব্যাংকের কাজের অবসরে, ছুটির পরে, কত আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা, চাষী-মজুরের ভবিষ্যৎ এসব বিষয়ে আলোচনা করেছে,স্থায়ী সমস্যা আর সাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে মত ও পথের কথায় ধরা পড়েছে তার ভিতরের একটা জিজ্ঞাসু, উৎসুক, তেজস্বী দিক। কিছুদিনের মধ্যে কিভাবে এলোমেলো হয়ে গেছে তার কথাবার্তা, সব বিষয়ে আগ্রহ আর উৎসাহ গেছে ঝিমিয়ে।[১]

অথচ ঝিমিয়ে পড়া এই মানুষটিই রাজপথে আন্দোলনরত ছাত্র-যুবকদের মধ্যে তারুণ্যের নির্ভীক দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করে হয়ে উঠেছেন উজ্জীবিত; তাঁর অজান্তেই হয়ে উঠেছেন সহানুভূতিশীল। 'তার দীর্ঘদিনের অ্যালকোহল-আচ্ছন্ন মস্তিষ্ককোষগুলি ওইদিনের রাজনৈতিক অভিঘাতের তরিৎস্পর্শে যেন স্বচ্ছ হয়ে যায়।'[২] জনতার ত্যাগের বিপরীতে মদের নেশা তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়। ফলে এদিন তিনি মদ্যপান না করেই বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। শুধু তাই নয়, হিমশীতল এই রাত্রিতে অন্তত একজন আন্দোলনকারীরও শীত নিবারিত হোক, এই প্রত্যাশায় তিনি তাঁর ব্যবহৃত আলোয়ানটিও তাদের দিয়ে যেতে চান।

গৃহ-প্রত্যাবর্তনের পর অক্ষয়ের আচরণ সুধার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে। অক্ষয় মদ্যপান না করার আনন্দে ও কৃতিত্বে মাকে প্রণাম করতে চায়। সুধার মনে হয় অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে অক্ষয় হয়তো এরকম অদ্ভুত ইচ্ছা প্রকাশ করছে। কিন্তু সে যে আজ নেশা করেনি, একথা জ্ঞাপন করার পরও সুধা বিশ্বাস করতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে অক্ষয় যা বলেন তা যেমন অভূতপূর্ব, তেমনি বিস্ময়কর :

> 'সত্যি বলছি, খাইনি আজ। তোমার কাছে কিছু গোপন করব না। খাই নি বটে, কিন্তু তাতে আমার বাহাদুরি নেই। খাব না বলেছিলাম বলে খাই নি, তা সত্যি নয়। খাবার জন্য হোটেলের দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। অন্য দিনের চেয়ে বেশিই হয়তো আজ খেতাম সুধা। কিন্তু এমন ব্যাপার আজ দেখলাম,

---

১. *চিহ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

২. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি-২০২০, পৃ. ১৮৬

যাদের মেয়েশোঁকা ভাবপ্রবণ ফাজিল ছোকরা বলে জানতাম, তাদের এমন অদ্ভুত মনের জোর দেখলাম, আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম সুধা। বুঝলাম যে, আমি যা ভাবি সব ভুল। মদ খেতে হোটেলের দরজা পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু তখনো ভাবছি, গুলি খেলে মরতে হবে জেনেও সাধারণ একটা ছেলে যে গুলি খাবার জন্য তৈরি, ওটা কিসের নেশা? মদ না খেয়েও যদি মানুষের ও-রকম নেশা হতে পারে, আমি তবে কেন বোকার মতো গাঁটের পয়সা খরচ করে এই সস্তা বিশ্রী নেশা করি! ওই ছেলেগুলোর জন্য খেতে পারলাম না। আমার মনের জোরের জন্য নয়।'[১]

চিহ্ন উপন্যাসে অমৃত মজুমদার প্রসঙ্গে সমকালীন কতিপয় রাজনীতিবিদের সুবিধাবাদিতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এরা যশ, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জনের প্রতিযোগিতায় ছিল ব্যস্ত। জনকল্যাণের নামে তারা ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের পাহাড় গড়তে চায়। রাজপথের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তারা নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করলেও নেতৃত্বদানের স্পৃহা তাদের মধ্যে ছিল প্রবল। উপন্যাসে এই নেতাদের একজন বসন্ত রায়। তাঁর বার্তা নিয়ে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট নিবৃত্ত করতে যান অমৃত মজুমদার। ছাত্রদের তিনি পুলিশি নির্যাতনের স্মৃতি ভুলে বাড়ি ফেরার পরামর্শ দেন। পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলিবর্ষণের পর এমন পরামর্শ ছাত্ররা তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করে। তাই অমৃত মজুমদার হতাশ হয়ে রাত দশটায় বাড়ি ফেরেন। এসময় তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দিশেহারা দেখায়। কারণ :

ছাত্রদের বসন্ত রায়ের বাণী শোনাবার জন্য পুলিশ-লরিতে ওঠবার সময় তার রীতিমতো কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নামবার সময় কি করে যেন ব্যথা লেগেছিল বাঁ দিকের কুঁচ্‌কিতে। বিশেষ কিছু নয় তবু ব্যথা তো। বাঁ হাঁটুর বাতের ব্যথাটাও আছে খানিক খানিক। এসব জিমন্যাস্টিক কি পোষায় তার? কি যেন হয়েছে দেশে। এতকাল রাজনীতি করে এসেও আজ যেন তার ধাঁধা লেগে যাচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝেই উঠতে পারছে না হঠাৎ কোন দিকে গতি নিচ্ছে রাজনীতি। কোনো হলে বা পার্কে মিটিং করবে, বক্তৃতা করবে। সংগ্রামের আহবান এলে তখন সংগ্রাম করবে। মোটরে গিয়ে মঞ্চে উঠে যা করার করা যায় সে অবস্থায়। তা নয়, রাস্তায় ওরা এমন কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছে যে, লরিতে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়।[২]

এই পর্যায়ে স্ত্রী অরুণা মজুমদার তাঁকে তিরস্কার করেন এবং বসন্তবাবুর অনুপস্থিতিতে মাঠপর্যায়ের নেতৃত্ব বাগিয়ে নেয়ার জন্য স্বামীকে পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, ছাত্ররা যখন বসন্ত রায়ের নির্দেশ অমান্য করেছে, তখন অমৃত মজুমদারের উচিত ছাত্রদের পক্ষে অবস্থান নেয়া এবং ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা

---

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *চিহ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

২. *চিহ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

পোষণ করা। অরুণার বিশ্বাস, তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলে অমৃত ঠিকই অতিদ্রুত জননন্দিত নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন। এ প্রসঙ্গে অমৃত-অরুণার কথোপকথন লক্ষণীয় :

> সব বৃত্তান্ত শুনে অরুণা তার রোগা করা মোটা দেহটি সোফায় এলিয়ে দিয়ে গভীর হতাশার সঙ্গে বলে, 'তুমি একটা পাগল, তুমি একটা ছাগল। তুমি কোন দিন কিছু করতে পারবে না।'
>
> 'আমি কি করব? বসন্ত বাবু গেলেন না –
>
> 'অরুণা ফোঁস করে ওঠে মনের জ্বালায়, 'বসন্ত বাবু যে গেলেন না, সেটা যে তোমার কত বড় সুযোগ একবার খেয়ালও হল না তোমার? একবার মনেও হল না এই সুযোগে একটু চেষ্টা করলে এক রাত্রে তুমি নেতা হয়ে যেতে পার? একেবারে ফাঁকা ফিল্ড পেলে, কেউ তোমার কম্পিটিটর নেই, আর তুমি কিছু না করেই চলে এলে? তুমি সত্যি পাগল। সত্যি তুমি পাগল। তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না, কোনোদিন কিছু হবে না।'
>
> 'আমার কি করার ছিল ?'
>
> 'আমি বলে দেব তোমার কি করার ছিল? ফুঁসতে থাকে অরুণা ক্ষোভে দুঃখে, 'তুমি না দশ বছর পলিটিক্স করছ? তুমি না সব জান সব বোঝ, অন্যে তোমার বুদ্ধি ভাঙিয়ে খায়? একবার উঠতে পারলে সারা দেশটাকে মুখের কথায় ওঠাকে বসাতে পার? আমার কাছে যত তোমার লম্বা চওড়া কথা, বন গাঁয়ে শ্যাল রাজা। সবাই ওঁকে দাবিয়ে রাখে তাই উনি উঠতে পারলেন না, নামকরাদের তাঁবেদার হয়ে রইলেন। নিজের বুদ্ধি নেই ক্ষমতা নেই, অন্যের দোষ।[১]

স্ত্রীর উপর্যুপরি তাগিদে উৎসাহিত হয়ে অমৃত অতঃপর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং সভাস্থলে গিয়ে পুনরায় বক্তৃতা করার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু পথিমধ্যে স্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদ শুনে তিনি নিবৃত্ত হন। স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর নেতা হওয়ার বাসনা শেষ পর্যন্ত অপূর্ণই থেকে যায়। কোনো উচ্চ আদর্শ নয়, কেবল ছলে ও কৌশলে রাজনীতির মাঠ দখল করাই যে তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল তা অমৃত মজুমদারের জীবন-পরিণামসূত্রে মানিক উপস্থাপন করেছেন এ-উপন্যাসে। অনৈতিক উচ্চাভিলাষই যে অরুণার মৃত্যুর কারণ, তা অমৃত-অরুণার কন্যা বীণার অন্তর্ভাবনা সূত্রে এ-উপন্যাসে চমৎকারভাবে গ্রন্থিত করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় :

> ডাক্তার বার বার বলেছিল, সাবধান সাবধান। এ কোন মরীচিকার লোভে মা সে কথা ভুলে গেল। নিজের মরণ ডেকে আনবার মায়ের অদ্ভুত পাগলামির কথাই বীণা ভাবে, ভাইবোনের সঙ্গে মায়ের মৃতদেহ আগলে বাপের প্রতীক্ষায় বসে থেকে। খাওয়াদাওয়ার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন নিখুঁত সতর্কতা, মনে এত উদ্বেগ অশান্তি ক্ষোভ জমা করবার কি দরকার ছিল? এত পেয়েও সাধ মিটল না, যশ মান প্রতিপত্তির উগ্র

---

১. *চিহ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

কামনায় পুড়তে পুড়তে মরতে হল শেষে? ক্রমে ক্রমে যেন পাগল হয়ে উঠেছিল মা তার বাবাকে বড় একজন নেতা করার জন্য। এতই কি প্রচণ্ড নেতৃত্বের মোহ মানুষের যে বাবার জীবনটা তার ভরে ওঠে আত্মগ্লানি আর হতাশায়, তবু তিনি থামতে পারেন না, মাকে তার জীবনটা দিতে হয়। মা যেন তার আত্মহত্যা করেছে মনে হয় বীণার।[১]

সুস্থ রাজনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়া কীভাবে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ বোধ তৈরি করে দেয় তা এ-উপন্যাসে মানিক দেখিয়েছেন স্কুল-ছাত্র রজতের মাধ্যমে। 'রোগা চেহারা, ফর্সা রং, খুব ঢেঙ্গা' রজতের বয়স পনেরো-ষোল বছরের বেশি হবে না। বিশাল জনতার সঙ্গে সেও রাজপথে অবস্থান নিয়েছে। ঘোড়সওয়ার পুলিশগুলো তাদের নানাভাবে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছে। রজত জানে, পুলিশের শত প্ররোচনা সত্ত্বেও তাদের স্থির ও অনড় থাকতে হবে। সহযোদ্ধা নারায়ণ যখন নিপীড়ক ঘোড়সওয়ার পুলিশের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে, তখন রজত তাকে নিবৃত্ত করবার জন্য যা বলে তাতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার বিচক্ষণতা, সুস্থ রাজনৈতিক বুদ্ধি :

'আমরা মারামারি করতে গেলেই তো ওদের মজা। তাই তো ওরা চায়। আমরা তো আর আমরা নই আর, এখন হলাম সারা দেশের লোক। ওরা জানে, বাড়াবাড়ি করলে চাদ্দিকে কি কাণ্ড বাধবে। দেখছেন না রাগ চেপে শুধু খুচখুচ ঘা মারছে? আমরা যাতে ক্ষেপে যাই? ইচ্ছে করলে তো দু মিনিটে আমাদের তুলোধুনো করে দিতে পারে, দিচ্ছে না কেন? আমরা যেই মারামারি করতে যাব, ব্যস্, আমরা আর দেশের সবাই থাকব না, শুধু আমরা হয়ে যাব। লোকে বলবে আমরা দাঙ্গা করে মরেছি। ... আপনাদের মতো রগচটা লোক নিয়ে হয়েছে মুশকিল। কিছু বোঝেন না, তিড়িং তিড়িং শুধু লাফাতে জানেন।'[২]

রজতের এই বক্তব্য একজন স্থিতপ্রজ্ঞ রাজনীতিকের মতোই। 'সে যেন আয়ত্ত করে ফেলেছে নবযুগের বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ – সেকালের ঋষিবালকদের মতো।'[৩] এ-প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের বক্তব্য লক্ষণীয় :

এ উপন্যাসে রাজনীতির মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানিকের স্বচ্ছ চিন্তার স্ফূরণও লক্ষণীয়। মানিকের চূড়াস্পর্শী রাজনীতি মনস্কতারও উৎকৃষ্ট উদাহরণ এ উপন্যাস। বিশৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতা দিয়ে মহৎ রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ যে অসম্ভব সেই সহজ সত্যটি কিশোর রজতের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। নিপীড়ক ঘোড়সওয়ার

১. *চিহ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

২. *চিহ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

৩. *চিহ্ন*, প্রাগুক্ত. পৃ. ১৭১

পুলিশকে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলার ইচ্ছা যখন নারায়ণের ক্ষুব্ধ মনে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন স্বেচ্ছাচারী ভাবনার বিরুদ্ধে রজতের মনোভাব অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ।[১]

চিহ্ন উপন্যাসে অজয় একজন সামান্য কেরানি। সংসারের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হওয়ায় সে শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রেখে চাকরিতে যোগ দেয়। ধর্মঘটীদের ওপর পুলিশের গুলি সে মেনে নিতে পারেনি। এজন্য অফিসে না গিয়ে সে মিছিলে যোগ দেয়। অজয়েরই বোন মাধু। দরিদ্র পরিবারে মায়ের গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। অবশেষে জীবনকে সে জয় করতে সক্ষম হয়েছে। জীবনের সর্ববিধ বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে সে বুঝে নিয়েছে সংঘ-শক্তিতে জাগ্রত হতে পারলেই কেবল মানবমুক্তি সম্ভব। এজন্য ভাই অজয় ও তার বন্ধু নিরঞ্জনের সঙ্গে সেও প্রতিবাদী জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

চিহ্ন উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রাম ও শহরের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অভিন্ন সূত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে বঞ্চিত মানুষের মুক্তির জন্য শোষিত মানুষের সংগ্রামের অনিবার্যতাকেই শেষাবধি তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। উপন্যাসে যাদবকন্যা শোষকশ্রেণি কর্তৃক নির্যাতিত হলে গ্রামবাসী তাকে উদ্ধার করে। গ্রামবাসীর সম্মিলিত শক্তির কাছে পরাজিত হয় শোষক শক্তি। শোষকশক্তির এ-পরাজয় যে ক্ষণস্থায়ী তাও তিনি স্পষ্ট করেছেন যাদব পরিবারের গ্রামত্যাগের তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে। অবশ্য এর মাধ্যমে যাদবের মনোলোকে উন্মোচিত হয়েছে এক নতুন সত্য :

তার মতো গরিব হাঘরে তুচ্ছ মানুষের জীবনেরও যে দাম আছে দশজনের কাছে, তার মতো লোকের মেয়ের সম্মান যে নিজের মেয়ের সম্মানের মতো হতে পারে দশজনের কাছে, এ জ্ঞান এ অভিজ্ঞতা তাকে প্রায় অভিভূত করে রেখেছে প্রথমাবধি। চিরকাল নিজেকে সে জেনে এসেছে একান্ত অসহায়, দুর্ভিক্ষে হাড়ে মাসে টের পেয়েছে সে বা তার পরিবারের বাঁচন মরণে কিছু এসে যায় না জগতের কারো। আজ সে জেনেছে তা সত্যি নয়। ডান হাতে চোট লেগেছে, মুখে খাবার তুলতে কষ্ট হয়। কিন্তু সে বেদনা যেন গায়ে লাগে না যাদবের। ব্যান্ডেজের নিচে মাথার ক্ষতটা যে দপদপ করছে সে যন্ত্রণাও বাতিল হয়ে গেছে তার কাছে। ভিতরে একটা ক্ষোভ আর আক্রোশকেই যেন জাগিয়ে বাড়িয়ে চলছে শরীরের আঘাতগুলির যন্ত্রণা। সে ফিরে আসবে, বৌ- ছেলে -মেয়েকে গণেশের কাছে রেখে সে ফিরে আসবে তার জন্য যারা লড়ছে তাদের সাথে যোগ দিতে।[২]

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *চিহ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

চিহ্ন উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শোষক শক্তির বিরুদ্ধে সর্বজনীন প্রতিবাদের চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে কোনো চরিত্রকেই এককভাবে প্রাধান্য দেননি। কোনো রক্তমাংসময় নায়ক চরিত্রও এ-উপন্যাসে নেই। রাজপথই হয়ে উঠেছে এ-উপন্যাসের ঘটনাধারার নিয়ন্ত্রক-শক্তি। গণেশ, ওসমান, রসুল, অক্ষয়, রজত, সীতা, হেমন্ত, আমিনা, জয়ন্ত, মনমোহন, নারায়ণ, শান্তি, আবদুল – প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের প্রবল উপস্থিতি ও প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়ে রাজপথে হয়ে গেছে একাকার। অপরদিকে অমৃত মজুমদার, অরুণা মজুমদার, এন. দাশগুপ্ত, চন্দ্র, যাদব, গণেশের মা, সুধা, রাণী, পরীবানু, অলকা, অনন্ত প্রমুখের মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনি অর্জন করেছে বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি। 'মিছিলের ও ব্যাপক গণ-সংগ্রামের জোয়ারকে কেন্দ্র করে এই বইটি রচনা করতে গিয়ে লেখক বহু চরিত্রের উপস্থাপন করেছেন এবং তারা এক একটি স্কেচের মতো মনে হলেও সামগ্রিকভাবে একটি যুগ ও যুগের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করতে পেরেছে।'[১]

চিহ্ন উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির প্রয়োজনে সঙ্ঘশক্তির অনিবার্যতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'ধর্মতলা মোড়ের ওই স্মরণীয় গণধর্মঘট ও রক্তপাতের ঘটনা *চিহ্নের* পটভূমি হিসেবে ব্যহৃত হলেও সে-ঘটনার বিবরণ, ক্রমধারা কিংবা পরিণাম এ-উপন্যাসের প্রতিপাদ্য নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনুধাবন করেছিলেন যে, সামাজিক পুঁজির শোষণ থেকে মুক্তি অর্জন করতে হলে সংঘশক্তির ঐক্যবদ্ধ উত্থান আবশ্যক। তাই রাজপথে প্রতিবাদী সংঘশক্তির প্রতিরোধ ও ঐক্য এবং পরিণাম ও রূপান্তর *চিহ্ন* উপন্যাসে চিহ্নিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক বলতে চান – সচেতন সংঘশক্তির হাতে অশুভ শোষণের পরাভব অনিবার্য; শ্রমিকশ্রেণি, মধ্যবিত্ত কিংবা সমাজের সকল স্তরের মানুষ যদি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ন্যায়যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিরোধে এগিয়ে যায় তবে তার সাফল্য সুনিশ্চিত।'[২] উপন্যাসের অন্তিমে এই ঐক্য ও সাফল্যের জয়গানই বিঘোষিত হয়েছে। গণেশের পিতা যাদবের দৃষ্টিকোণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> চারিদিক লোকারণ্য, ভিড় ঠেলে এগোন অসম্ভব। বিরাট এক শোভাযাত্রার মাথা লালদিঘির ওদিকের মোড় ঘুরছে, সামনে তিনটি তিনরকম বড় পতাকা উত্তুরে হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। শোভাযাত্রার শেষ

---

১. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর-১৯৯৯, পৃ. ১১৫

২. গিয়াস শামীম, *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ৮০-৮১

এখনো দেখা যায় না। ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনি উঠছে হাজারো কণ্ঠে। এবার যাদবের মনে হয়, বাঘ যেন ডাক দিচ্ছে মনের আনন্দে।'[১]

লালদিঘির জনবহুল শোভাযাত্রা দেখে আনন্দে উদ্বেলিত অজয়ও আপন মনে বলছে –

আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারেনি। আমরা এগিয়েছি। ঘাড় উঁচু হয়ে গেছে অজয়ের, দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে আনন্দে, উত্তেজনায়। যাদব চেয়ে দ্যাখে, সে হাসছে। মুখে যেন তার সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে।

উপন্যাসের শুরুতে আহত ও রক্তাক্ত গণেশের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা – 'এরা এগোবে না বাবু?' – পরিশেষে এভাবেই সম্পূর্ণতা পেয়েছে; এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অভীপ্সা অর্জন করেছে যৌক্তিক ভিত্তি। *চিহ্ন* উপন্যাসটি তাই হয়ে উঠেছে সংঘশক্তির চিহ্ন, রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতার চিহ্ন, সর্বস্তরের মানুষের জাগরণের চিহ্ন, এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অভীপ্সার চিহ্ন।

জীয়ন্ত

জীয়ন্ত (১৯৫০)[২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিকায় এটি রচিত। উপন্যাসটি রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সরোজমোহন মিত্র বলেন :

একুশের অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতায় শেষ হয়েছে। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়েছে। কিন্তু যুবচিত্তের বিক্ষোভ থামেনি। তা বহিঃপ্রকাশ করল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্যে। দেশের এখানে সেখানে অত্যাচারী সাহেব খুন হতে লাগল। আর ফাঁসীর মঞ্চে উঠল দেশের কত সাহসী তরুণ যুবক। তারা চৌরিচোরার ঘটনার পর আন্দোলন তুলে নেওয়ায় ক্ষুব্ধ। গান্ধীজীর তারা কড়া সমালোচক। তাদের ধারণা, 'আন্দোলন নেই কিন্তু নেতারা আছেন। সাধারণ খাটিয়ে গরীব মানুষ বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু নেতারা মুনাফা লুটেছেন জনপ্রিয়তার'। এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমিকায় মানিক লিখলেন নতুন উপন্যাস *জীয়ন্ত*।'[৩]

জীয়ন্ত উপন্যাসের কাহিনির সময়কাল ১৯২৬-২৮ সাল। মেদিনীপুর শহর ও এর আশপাশের গ্রাম এ উপন্যাসের প্লট। 'এ-উপন্যাসে মুখ্যস্থান দখল করে আছে সন্ত্রাসবাদী সহিংস স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলি।

---

১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *চিহ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

২. *জীয়ন্ত* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অষ্টাদশ উপন্যাস। ১৩৫৭ সালের আষাঢ় মাসে (জুন ১৯৫০) এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। ইতঃপূর্বে এটে 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৫৩ সনের আশ্বিন থেকে ১৩৫৫ সনের চৈত্র পর্যন্ত বাইশ কিস্তিতে মুদ্রিত হয়।

৩. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

এছাড়া আছে গ্রামে জমিদারের অন্যায়-অত্যাচারবিরোধী বা খাজনাবিরোধী আন্দোলন, জমিদারের পক্ষে পুলিশের অবস্থান গ্রহণ, সন্ত্রাসবাদ দমনে পুলিশের ব্যাপকহারে নির্যাতন, জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা, ব্রিটিশ প্রশাসকদের অহম চরিতার্থতাকল্পে কৌশলী কার্যক্রম পরিচালনা, ধনিক শিল্পপতিদের শোষণের স্বার্থরক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজনৈতিক সহিংসতা সৃষ্টি, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্টির পেছনে শোষণের স্বার্থ প্রভৃতি।'[১]

উপন্যাসের নায়ক পাকা বা প্রকাশ 'হাইস্কুলের সেকেন্ড ক্লাসের' ছাত্র। সে শহরের নামকরা ব্যক্তি রায়বাহাদুর ভৈরবের ভাগ্নে। তার বাবাও সরকারি চাকুরিজীবী। মাতৃহারা পাকা মামাবাড়িতে থেকে লেখাপড়া করে। 'দি ব্যান্ডেন পাবলিক লাইব্রেরি এন্ড ক্লাবে'র লাইব্রেরিয়ান রাখালকে মারার অপরাধে তার বিচার প্রক্রিয়ার বর্ণনাসূত্রে উপন্যাসের সূচনা। এ প্রসঙ্গে তার মামা ভৈরব এবং তার প্রতিপক্ষ ভুবনের মাধ্যমে স্থানীয় রাজনীতি অনিবার্যভাবে এসে গেছে। পাকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপন্যাসসূত্রে জানা যায়, সে 'অত্যন্ত দুরন্ত, সেক্সের বই পড়ে, বিড়ি, সিগারেট, হুকা টানে, অস্পৃশ্য বাগ্‌দি পল্লীতে গিয়ে তাদের সঙ্গে তাড়ি খায়, এমন কি নিষিদ্ধ পল্লীতেও কৌতূহল বশে গমন করে, ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, নির্জন নদী তীরে বাঁশি বাজিয়ে কিংবা নাটক দেখে বা কীর্তন শুনে রাত দুপুর পার করে বাড়ি ফেরে, ব্যায়াম শেখার জন্য সমিতিতে যোগ দেয় ইত্যাদি। অর্থাৎ ওই বয়সের দুরন্তপনার সকল প্রান্তই সে সবলে আঁকড়ে ছিল। আবার মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহায্য করাও তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য। ওই অল্প বয়সেই তার মধ্যে গড়ে উঠেছে কঠোর ব্যক্তিত্ব। গোপন সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও কৌতূহলবশত সে তাদের সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে মারাত্মক ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েও সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের কোন গোপন তথ্য সে প্রকাশ করে না।[২]

সমাজপরিসরে পিতা ও মামার গৌরবজনক অবস্থানের কারণে পাকার মধ্যে নানা অসংলগ্নতা তৈরি হয়। মধ্যবিত্ত জীবনের বিকার ও দুর্বলতা তার মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দেয়। সেজন্য শরীরচর্চা ক্লাবের মালিক কালীনাথ ক্লাব থেকে তার নাম কেটে দিলে সে প্রতিশোধ পরায়ণ হয় না। কারণ–

> সরল হলেও বোকা নয় পাকা। সে জানে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কালীনাথ ভাবছে, এ তার চালাকি। বিশ্বাস করলেও তাতে দোষ কাটানো যায় না। বেশ্যাবাড়ি যাওয়াই কম গুরুতর অপরাধ নয় এবং তাড়ির

১. সৈয়দ আজিজুল হক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬

২. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, পৃ. ১৯৬

ভাঁড় ঠোঁটে ঠেকানো। কিন্তু হৃদয় যে এদিকে তার প্রচণ্ড আবেগে ঠেলে উঠছে, কোনো মতে মানতে চাইছে না আজ থেকে ক্লাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে যাবে। মাঝখানে কয়েকদিন একটু উদাসীন ভাব এসেছিল, খানিক আগে পাকা নিজেও জানত না ক্লাবের জন্য তার এত মায়া, ক্লাব ছাড়তে গিয়ে মনে হবে সব ফুরিয়ে গেল, সর্বনাশ হল তার। দু'হাতে ক্লাবের মাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছা হবে।[১]

একপর্যায়ে পাকা তার বন্ধু পাঁচুর সঙ্গে আটুলিগাঁয়ে যায়। পাঁচুর বাবা ধনদাস সেখানকার অবস্থাপন্ন কৃষক। একদিন পাঁচুর সঙ্গে স্থানীয় জোতদার বসন্ত নন্দীর দিঘিতে স্নান করতে যায় পাকা। লেখক সেখানকার বর্ণনা করেছেন এভাবে :

ঘাটে কাপড় খুলে রেখে গামছা জড়িয়ে পাকা ঝাঁপ দেয় নন্দীদের দিঘিতে। অপর পাড়ে আরো বড় একটি ঘাট দিঘির, শুধু নন্দীদের বাড়ির লোকের জন্য, গ্রামের ব্রাহ্মণদেরও ব্যবহার করার অনুমতি আছে। ঘাটের উপর নন্দীদের মস্ত দালান-বাড়ি। চারিদিকে ঘর তোলা ফটকওলা চার-কোনা ছোটোখাটো ইটের দুর্গের মতো, বহুদিন রঙ, চুনকাম না হওয়ায় কালচে মেরে এসেছে বাইরেটা। পাঁচুর সঙ্গে দিঘি তোলপাড় করে পাকা, যেখানে মাচায় বসে চার দেওয়া জলে ছিপ ফেলে বসে আছে বেঁটে মোটা বড়ো নন্দী বসন্ত, সেখানে ডুবে ডুবে পদ্ম তুলতে গিয়ে মাছ ভাগিয়ে দেয়।[২]

সেখানে বসন্ত নন্দীর সঙ্গে পাকার পরিচয় হয়। রায়বাহাদুর ভৈরববাবুর ভাগ্নে এসেছে শুনে বসন্ত বিস্মিত হন। তবে বসন্ত নন্দীর আন্তরিকতাকে পাঁচু ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ তার চাচা জ্ঞানদাস খাজনাবন্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করায় বসন্তের চক্রান্তে তাকে থানায় মারধর করা হয় –

জ্ঞানদাসের জন্যই তার অহংকার বেশি, কাকাকে সে দেবতার মতো ভক্তি করে। খাজনা বন্ধের ডাকে সর্বাগ্রে সাড়া দিয়েছিল আটুলিগাঁ, সবার আগে ছিল তার বাবা আর কাকা, সকলের চেয়ে বেশি বীরত্ব দেখিয়েছিল জ্ঞানদাস। আজো তার গায়ে পুলিশের অত্যাচারের চিহ্ন আছে, মাথায় লাঠির ক্ষত আর বাঁ উরুতে গুলির ক্ষতের দাগ। হাতের তিনটি আঙুল তার ভাঙা, লক্ষ্য করলে দেখা যায় সে একটু খুঁড়িয়ে চলে।...সারা জেলায় আর তার আটুলিগাঁয়ে খাজনা বন্ধের তোড়জোড় দেখে বসন্ত ও তার অনুগত কয়েকজন কংগ্রেস-কর্মী ভড়কে গিয়েছিল। তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে সাধারণ কংগ্রেস-কর্মীদের উৎসাহ ছিলআরো একটা ভয়ের কারণ, এর আগে কখনো তারাএভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি। আর এমন আশ্চর্য

১. *জীয়ন্ত*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, *তৃতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

২. *জীয়ন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১১

ব্যাপার, বড়োলোক নয়, নাম-করা লোক নয়, গেরস্ত চাষি, ধীর সংযত ধনদাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল আটুলিগাঁর খাজনা বন্ধের নিয়ন্তা। সে যোগ না দিলে ভাগ হয়ে যেত আটুলিগাঁর চাষি সমাজ, অত প্রচণ্ড হত না আন্দোলন, মাথা তুলে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ফেঁসে যেত।[১]

উপন্যাসে 'পাকা প্রথমে রাজনীতির বাইরে থেকে, পরে সন্ত্রাসবাদী দলে সে সক্রিয় করে নিজেকে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী হলেও তার মধ্যে আবেগ অভিমান প্রবল। সে ইংরেজবিদ্বেষ কিংবা স্বার্থপরতা, ন্যাকামি এসবকে ঘৃণা করে। কিন্তু সে নিজে এসব বৈশিষ্ট্যের বাইরে নয়। পাকার সবকিছুই একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ।'[২] পাকা চরিত্রের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলো সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এ বিষয়টি যুগান্তর চক্রবর্তী আরো স্পষ্ট করেছেন এভাবে –

মানিকের মাতৃবিয়োগ ঘটে ১৯২৪ সালে; তখন তাদের পারিবারিক বসবাস ছিল পিতার কর্মস্থল টাঙ্গাইলে। টাঙ্গাইলে মানিকের জীবন ছিল দুরন্ত। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর টাঙ্গাইলের বাস উঠে যায়। অতঃপর মানিক কিছুদিন মধ্যমভ্রাতার নিকটে থেকে কাঁথি মডেল হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন, তারপর যান মেদিনীপুরে বড় বোনের কাছে। তার বাবাও মেদিনীপুরে বদলী হয়ে যান। মানিক সেখানে প্রায় দুবছর থাকেন এবং মেদিনীপুর জিলা স্কুল থেকে ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। মেদিনীপুরে মানিক আখড়ায় কুস্তি শিখতেন, দলবদ্ধ হয়ে আগুন নেভাতে যেতেন, ভালো গান গাইতেন – সে কারণে কখনও কখনও হরিসভায় ডাক পড়ত, বাঁশিও বাজাতেন। ম্যাট্রিক পাশের পর বাঁকুড়া যান। সেখানে হোস্টেলে থেকে ওয়েসলিয়ন মিশন কলেজে পড়েন। ওই কলেজের ছাত্র থাকাকালে সিগারেট খেতেন, মদ্যপান করতেন, বাঁশি বাজাতেন; ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল ওই সময়। ওই সময়ই এক বন্ধুর মাধ্যমে অনুশীলন পার্টির সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। ১৯২৮ সালে মানিক ওই কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করেন। পাকার মতো মানিকের জীবনেও যে কিশোর বয়সে নিষিদ্ধপল্লীর সংসর্গ ঘটেছিল তার ইঙ্গিত ডায়রির পাতায় পাওয়া যায়।[৩]

---

১. জীয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৫

২. শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য*, অন্বেষা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৬০

৩. যুগান্তর চক্রবর্তী (সম্পা.), *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়রি ও অন্যান্য*, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৪০

উপন্যাসে পাকাকে কালীনাথের সমান্তরাল করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে উপন্যাসের কিছুদূর অগ্রসর হলে পাকাকে ছাপিয়ে যায় কালীনাথের সন্ত্রাসবাদী দলের কর্মকাণ্ড। কালীনাথ তার আন্দোলনের নতুন ব্যাখ্যা করে এই বলে যে –

> লোকে আজ অনেক বড় কিছু চায়, ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস, এখানে ওখানে ঘা মেরে গায়ের ঝাল ঝেড়েই তারা সন্তুষ্ট নয়! নলিনী কেন, আজ লাটসায়েবকে মারো, লোকে চমকে উঠবে, বলবে একটা কাণ্ড হল বটে, বাস, তারপর চুপ হয়ে যাবে। এ তো শুধু একটা ঘটনা। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের একটা চাকরকে মারলে, গবর্নমেন্টটা তো মরল না! লোকের মনে যদি বিশ্বাস আনতে পার যে নিছক ঘটনা নয়, এটা বিপ্লবের আহ্বান, প্রস্তুতি, বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা লাভের আয়োজন চলছে, এ রকম ছোটো ঘটনার চেহারাও সঙ্গে সঙ্গে লোকের কাছে বদলে যাবে। নারাণের ছেলেখেলাটুকুর মধ্যেও তখন লোকে দেখতে পাবে, তাদের শহরেও বিপ্লবের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। বিয়ের আসরে অমিতও শুনতে পাবে লোকে ওই কথা কানাকানি করছে।[১]

পাকা বাবার পিস্তল পাঁচুর সাহায্যে কালীনাথের কাছে পাঠিয়ে দেয়। স্বদেশীদের সাহায্যের জন্য সৎমা সরমার কাছে গহনা চাইলে – 'দু-একখানা গয়না নয়, ট্রাঙ্ক খুলে গয়নার বাক্সটা সরমা পাকাকে এনে দেয়। বলে, নাও, আমার যা ছিল সব দিলাম। তুমি আমায় যেমন ভাব, আমি তেমন নই পাকা, আমিও মানুষ। চোখ পেটে জল বেরিয়ে আসে সরমার।'[২]

পাকার সহপাঠী ও বন্ধু পাঁচু। দুজনেই এক সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করে। এ উপন্যাসে শহরের ঘটনা যেমন ঘটেছে পাকাকে আশ্রয় করে, তেমনি গ্রামের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে পাঁচুকে কেন্দ্র করে। গ্রামে পুলিশি নির্যাতনের ফলে পাঁচুর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। গ্রামের কৃষকদের আন্দোলনকে বিপ্লবী সংগ্রামের রূপ দিতে সে নিরন্তর কাজ করে। একপর্যায়ে সে তাদের বাড়ির কাছের পুরোনো বিপ্লবী শ্যামলের শিষ্য হয় এবং গ্রামের ছেলেদের নিয়ে দল গঠন করে কৃষকদের সাহায্য করে।

জীয়ন্ত উপন্যাসে দুটি সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তাদের একটি নারায়ণের নেতৃত্বে থানার দারোগা নলিনীর স্ত্রীর স্বর্ণলঙ্কার লুট, আরেকটি কালীনাথের নেতৃত্বে ভুবনের বাড়ি থেকে ব্রিটিশ শাসক লিটনের স্মৃতিরক্ষার্থে গচ্ছিত ত্রিশ হাজার একাশি টাকা লুট। এ ঘটনার দিনে অমিতাভ

---

১. জীয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫

২. জীয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬

পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এ সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে পাকা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও সে নির্মমভাবে পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়।

বস্তুত, ১৯২১ সালে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলন সহিংস রূপ নিলে তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এর ফলে সারা দেশের স্বাধীনতাকামী যুবসমাজে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়, পরিণতিতে শুরু হয় সশস্ত্র সংগ্রাম। জনগণের একাংশ গান্ধীজিকে মহামানব কল্পনা করে, অন্যদিকে যুবকেরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আর তাই সুরেন ঘোষালের মেয়ের বিয়েতে ডাক্তার রায়চৌধুরী যখন গান্ধীজিকে মহামানব বলে প্রশংসায় উদ্বেলিত, ঠিক তখন তরুণ অমিতাভ ভিন্ন ধারণা ব্যক্ত করে। অমিতাভ বলে :

> গান্ধীজি মহাপুরুষ, নেতা হিসাবে তাঁর তুলনা হয় না, এতে আপনি সন্তুষ্ট নন, তাঁকে অদ্ভুত উদ্ভট কিছু বানাতে চান, তিনি সর্বজ্ঞ দেবতা, মহাঋষি, ম্যাজিশিয়ান, সবকিছু। আমার তাতেই আপত্তি। আপনার ব্যাখ্যা মানতেও আপত্তি হয় না, গান্ধীজি তাতে ছোটো হন না, তাঁকে যদি ধর্মপ্রচারক না করে রাজনৈতিক নেতা বলে ধরেন। আর কিছু হোক বা না হোক, ঘুমন্ত দেশটাকে শুধু জাগাবার জন্যই একটা আন্দোলন দরকার এ বিশ্বাস নিয়ে যদি তিনি আন্দোলন চালিয়ে থাকেন, সে তো ভালো কথা, গৌরবের কথা। তাঁর বিশ্বাস ভুল কি না, সে প্রশ্ন আলাদা। ভাবুন তো তা হলে কত সরল সহজ হয়ে যায় তাঁর অহিংসা, আর সত্য? অহিংসনীতি পরাধীন দেশের শিকল কাটার অস্ত্র, রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি, আর কিছু নয়। বেদান্তের মাপকাঠিতে সত্য হোক বা না হোক, দেশের কোটি কোটি লোকের ভালোমন্দের হিসাব কষে যা করা দরকার, যা বলা দরকার, তাই করা আর বলাই সত্য। হিসাব ভুল কিনা সে প্রশ্ন অবশ্য আলাদা।...
> অমন একটা মানুষের নামে যা-তা রটাতে ভালো লাগে না। ভারতের যুগ-যুগান্তরের জ্ঞানকর্মের সাধনা তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে থাকে, তাঁকে শত শত প্রণাম।[১]

একজন রাজনীতিসচেতন শিল্পী হিসেবে মানিক *জীয়ন্ত* উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ভারতবর্ষের নানাস্তরের মানুষ, বিশেষ করে যুবসমাজ কীভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে জেগে উঠতে শুরু করেছে তারই একটি চিত্র এ-উপন্যাসে সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত করে উপস্থাপন করেছেন তিনি।

১. *জীয়ন্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-৩০২

স্বাধীনতার স্বাদ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক উপন্যাস *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৫১)[১]। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের প্রাকপর্যায়ে কলকাতাসহ বঙ্গভাষী অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে সংঘটিত ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত হয়েছে এ-উপন্যাস। সমগ্র উপন্যাসে এই দাঙ্গার কার্যকারণ মানিক অত্যন্ত নির্মোহ ভঙ্গিতে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রপাত্রের ভূমিকাসূত্রে উপস্থাপন করেছেন।

স্বাধীনতার স্বাদ দেশের সমকালীন বাস্তবতার দলিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে যখন সারা বাংলার মানুষ হতাশা, নৈরাজ্য, অস্থিরতা, ভীতি আর বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলছিল, পূর্বেকার মূল্যবোধগুলো যখন হয়ে পড়ছিল অন্তঃসারশূন্য, তখনকার জীবনবাস্তবতায় ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি কীভাবে সাধারণ মানুষের বোধবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তা স্বাধীনতার স্বাদ উপন্যাসে মানিক আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে একীভূত করে পরিবেশন করেছেন এ-উপন্যাসে। একটি সর্বগ্রাসী ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধ সে-সময় বদলে দিয়েছিল মানুষেরসুদীর্ঘকালের লালিত জীবনভাবনা, চিন্তা-চেতনা। এই বিপর্যয়কালে 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা'য়ের মতো জনজীবনে শুরু হয় আরেক মনুষ্যত্ববিনাশী বিপর্যয়; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফলে মানবিকতার ভিত ধসে যায়, মানুষে-মানুষে পূর্বেকার সেই সৌহার্দ্যময় জীবনযাপনে ছেদ পড়ে, বিনষ্ট হয়ে যায় ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের মিত্রতার বোধ। জীবনে কেবল আতঙ্কই অবশিষ্ট থাকে। ঔপন্যাসিক সেই যাপিত জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন উপন্যাসে :

> আগের দিনের সে ঘরোয়া সুখদুঃখ আর অবশিষ্ট নেই, বাইরের বিরাট দুঃখ-যাতনার বন্যা বেনো জলের মত জবরদস্তি ঘরে ঢুকে ঘোলাটে আবর্ত করে ছেড়ে দিয়েছে ঘরের জীবন। সন্দেহ নেই যে তাই থেকেই এ সহনশীলতা, ব্যাকুলতার এই আত্মনাশের আপস! সেই জাপানি বোমার দিন থেকে পথে ঘাটে ছড়ানো সস্তা অপমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, পুলিশের গুলি, দাঙ্গা হাঙ্গামার ধাক্কা অন্দরে অন্দরে সুরক্ষিত মনগুলি ঘুঁটে দিয়েছে। চরম করেছে এই দাঙ্গা। দিনের পর দিন এক মুহূর্তের শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। বাইরে যে যায়, সে ফিরবে কিনা জানে না বাড়ির লোক। ফিরে এসে বাড়ির লোককে দেখবে কিনা জানে না বাড়ি থেকে যে বাইরে যায়। বাড়িতে সকলে একত্রে উদ্বেগ আতঙ্কের পল গুণে সময়ক্ষেপণ করে, উন্মত্ত

১. *স্বাধীনতার স্বাদ* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশতম উপন্যাস। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালের জুন মাসে। এর প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি 'নগরবাসী' শিরোনামে 'মাসিত বসুমতী' পত্রিকায় ১৩৫৫ সনের বৈশাখ থেকে ১৩৫৭ সনের আষাঢ় সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

কোলাহলের মধ্যে কখন আবির্ভাব ঘটে দলবদ্ধ ধ্বংসের। কখন কারফিউ নামে, কখন বন্ধ হয় রেশন, হাটবাজার, হাঁড়ি চড়া বাতিল হয়ে যায় সংসারে।[১]

প্রণব এই বিপর্যয়কালের একটি চরিত্র; এ-উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সে শ্রেণিসচেতন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী। তার উদারনৈতিক মনোভাবের কারণে তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে দাঙ্গাবিধ্বস্ত কয়েকটি পরিবার। এসব পরিবারের পুরুষ মদস্যরা সারাদিন কর্মোপলক্ষ্যে বাইরে গিয়ে যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তা-ই হয়ে ওঠে ওদের রাত্রিকালীন আলোচনার বিষয়। তাদের আলোচনা-পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমকালীন ভারতবর্ষীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের অভিজ্ঞতা-উৎসারিত কথামালার মাধ্যমে সমকালীন জনজীবনের ধারাপ্রক্রিয়া, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের আচার-আচরণ, মতলবি রাজনীতিকদের হিংস্র দুরভিসন্ধি, সুস্থধারার রাজনীতিকদের মানবমুখী ভূমিকা প্রভৃতি বাস্তবতামণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার স্বাদ উপন্যাসে দাঙ্গাবিধ্বস্ত কয়েকটি পরিবারের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনকাহিনি বর্ণিত হলেও সুশীল-মণিমালা দম্পতি এবং তাদের পুত্র-কন্যা-সংশ্লিষ্ট বৃত্তান্তই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। আত্মস্বার্থে তাড়িত হয়ে একসময় মণিমালা শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করে ভিন্ন বাড়িতে চলে যায়। প্রণবের রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতার কারণে পুলিশ একদিন তাদের বাড়িতে হানা তল্লাশি করতে এলে সেই অজুহাতে তার অধ্যাপক-দাদা সুশীল এবং বউদি মণিমালা বাড়ি ত্যাগ করে। প্রণবের দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপন্যাসিক বিষয়টি জ্ঞাপন করেছেন এভাবে :

> ইংরেজ রাজের পুলিশ একদিন তার ঘরটা সার্চ করেছিল। তাতে সরকারি কলেজের অধ্যাপক পরিবারের কাছে এমন বিপজ্জনক বিপ্লবী যদি হয়ে উঠেই থাকে যে তার সঙ্গে একত্র বসবাস আর উচিত মনে করা যায় নি, সেটা খাপছাড়া কিছু হয়নি। ভাই বলেই বরং বিপদের ভয় ছিল বেশি। স্বদেশী ছেলে স্বদেশী ভাইয়ের শুধু বাপ-ভাই হওয়ার জন্য কেন, আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব হওয়ার জন্যও এদেশে অনেকের ভাগ্যেও কম লাঞ্ছনা জোটে নি। তবে তাকে বাড়ি থেকে তাড়াবার জন্য এরা অমন উঠেপড়ে লেগেছিল কেন প্রণব ভালো বুঝতে পারেনি! শুধু তার সঙ্গ বর্জন করাটাই মণির বাড়ি ছাড়ার একমাত্র কারণ ছিল না। অন্য সবার সাথে থাকার দায়িত্ব ঝক্কি আর বিড়ম্বনা এড়িয়ে নিজেদের রোজগার শুধু নিজেদের জন্য খরচ করে নিজেদের মনের মতো স্বাধীন সুখী নীড় গড়ার প্রবল সাধটাও ছিল। তাকে তাড়ালে তো এ সাধ মিটত না, বরং দায়িত্ব আরো বেড়ে যেত।

---

১. *স্বাধীনতার স্বাদ*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র*, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

পরে মনে হয়েছে, ভিন্ন হবার সংকোচ কাটাতে এরা অত বেশি বাড়াবাড়ি করেছিল তাকে নিয়ে, সকলকে ফেলে সরে যাওয়া যে স্বার্থপরতা নিজেদেরই, এ বোধ থাকায় অজুহাতটা ফেনিয়ে বড়ো করেছিল।[১]

যদিও মণিবৌদির সঙ্গে বরাবরই প্রণবের সুসম্পর্ক ছিল, তবুও স্বার্থমূলক চিন্তায় তাড়িত হয়ে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা অন্যত্র বসবাস করতে শুরু করে। মণিমালার দৃষ্টিকোণ-আশ্রিত বর্ণনাংশ লক্ষ্যণীয় :

প্রণব তখন ভাবপ্রবণ ছিল। গলায় গলায় ভাব ছিল মণির সঙ্গে। তার মনও গভীরভাবে নাড়া খেয়েছিল, এক সুরে বাঁধা দুটি মন হলে একের ঝংকারে অপরটি যেমন সাড়া দেয়। জীবনে বিশ্বাস, মরণে সুখ! কোন জীবন? কী বিশ্বাস? এ প্রশ্নের জবাব মণি কখনো জানেনি। জীবিতের সুখদুঃখকে মরণের সঙ্গে জড়ানো তার অদ্ভুত মনে হয়েছে। বিশ্বাসের জন্য মরেও সুখ আছে, এটা চলতি কথা, সবাই জানে। কিন্তু সে হল বিশ্বাসের জন্যই জীবন আর বিশ্বাসের জন্যই মরণের কথা, তেমন আর কটা লোকের হয়? সংসারে সাধারণ মানুষের যে জীবন, সুখ-দুঃখের যে ঘটা, তাতে বাঁচার মধ্যেই সব, ওটাই সীমা।[২]

শ্বশুর-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের সাতবছর পর যখন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ংকর ছোবলে জনজীবন দিশেহারা হয়ে উঠেছে, তখন মণিমালাকে উদ্ধার করতে সুদূর মধ্যভারত থেকে আসেন তার মামা প্রমথ। কলকাতায় এসে তিনি মণিমালাদের বাড়ির সামনেই দাঙ্গাকারীদের হাতে প্রাণ হারান। এ মৃত্যুসংবাদ প্রণবের কাছ থেকেই জানতে পারে মণিমালা। এ-রাতে পাশের বস্তিতে আগুন লাগার চিৎকার শোনা যায়। প্রণব জানতে পারে, গলির মধ্যে তিনজনকে হত্যার বদলা নিতেই আগুন লাগিয়েছে প্রতিপক্ষ দাঙ্গাবাজরা। পরদিন শহরের কারফিউ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেই মণিদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনে প্রণব। প্রণবদের বাড়িতে সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু-মুসলিম পরিবারের অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে। এমন উদার ও স্বাধীন পরিবেশে মণির জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রণবকে সে বলে :

চুপি চুপি কত কেঁদেছি, কেউ তোমরা টের পেয়েছ কোনোদিন? কেউ কোনোদিন তাকিয়ে দেখেছ আমার দিকে? পরের ঘর থেকে এলাম, মানিয়ে নিতে আমার কত কষ্ট। কী রকম চালচলন সংসারের, কার মনটা কী রকম, কত ঘা খেয়ে তা আমায় জানতে হয়েছে। বুক দুরদুর করেছে দিনরাত, কাউকে বলি নি। সবাই

---

১. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

দেখেছে হাসিখুশি, সবাই জেনেছে যার যা চাই আমার কাছে চাইলেই পাবে, একদিনের তরে কোনো বিষয়ে কেউ আমার নালিশ শুনেছে? আমি একটা মানুষ–'[১]

দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে মণি শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসে। এ যাত্রায় সে রাত জেগে দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভুক্তভোগীদের তর্ক-বিতর্ক শোনে। এরূপ আলোচনায় আকৃষ্ট হয়ে মণির মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। সে রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। স্বামীর বিরোধিতা সত্ত্বেও সে ছেলে সুধীন ও মেয়ে আশাকে নিয়ে 'কদর্য কালা কানুন' আর মেকি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় যোগ দেয়। সভার বক্তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় মণিমালা। সভামঞ্চে উচ্চারিত বক্তব্য মানিক তুলে ধরেছেন এভাবে :

প্রতিবাদ ও সমালোচনা। দেশটা বিভক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে, সব আয়োজন প্রস্তুত। আংশিক আপসিক স্বাধীনতা, রক্তমাংস বাদ দিয়ে ছাড়ানো চামড়ায় খড়-কুটা-জঞ্জাল পোরা মেকি স্বাধীনতা। যে আইন চালু থাকলে চামড়া শুধরে না নেওয়া স্বাধীনতার মৃত প্রতিমূর্তি অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়ায়, জ্যান্ত বাঘ পোষ মানবার সাধ মেটার বদলে চামড়ার মরা বাঘে ঘর সাজিয়ে শখ মেটানো পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে যায় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনা।[২]

এদিন আহূত প্রতিবাদী সভায় পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলি চলে। এতে মণির মেয়ে আশা, গিরীন ও ভূপেন আহত হয়। সৌভাগ্যক্রমে পাড়ার অসীম ডাক্তার সভায় উপস্থিত থাকায় তিনি ভূপেন ও গিরীনকে চিকিৎসা করেন। মেয়ে আশাকে হাসপাতালে রেখে মণি সেদিন বাড়ি ফেরে। পথিমধ্যে গোকুলকে সে বলে :

... সন্তানের রক্তপাতের মধ্যে স্বাধীনতা পেলাম। ...

তোমাদের বলি নি, আজ বলছি। না বলে পারব না। স্বামী-দেবতা বড়োলোক বন্ধুর চোরাকারবারের এজেন্ট হবেন, বন্ধু বাড়ি জুটিয়ে দিয়েছে। আমি বলেছিলাম যাব না, স্বামী-দেবতা নোটিশ দ্যান, না গেলে ত্যাগ করবেন, বিয়ের গয়না দানসামগ্রী ছাড়া যা কিছু দান করেছেন সব বাজেয়াপ্ত করবেন। ...

আমি ভয় পেয়ে হার মানি। পায়ে ধরে দুটি দিনের সময় চেয়ে নিই। আজ বুঝতে পারছি, তোমরা কেন আমার চোরাবাজারে কেনা চাল খেতে চাও নি। তখন ভেবেছিলাম বাড়াবাড়ি। ...

১. স্বাধীনতার স্বাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

আমিই আজ তোমার সুশীলদাকে নোটিশ দেব গোকুল, ভালো বাড়িতে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বজ্জাতি করার মতলব যদি না ছাড়ে, আমিই ওকে জন্মের মত ত্যাগ করব।[১]

মণিমালার এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তার দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থান্ধতার ঘেরাটোপ থেকে সে বেরিয়ে আসে। গণমানুষের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় সে নিজেকে শরিক করে ফেলে।

এ উপন্যাসে দেশের স্বাধীনতার জন্য এক পর্যায়ে মণি স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, এমনকি স্বামী পরিত্যাগেরও সে সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সম্পর্কের এ টানাপড়েন আদালত পর্যন্ত গড়ায়। অবশেষে 'পুরোনো দিনের গতানুগতিক দাসীত্বের জের টেনে চলা খতম করে দিয়ে একেবারে নতুন পথে চলার বিপ্লবী পরিকল্পনা যেন পরিণত হল নিছক চলার পথের দিক পরিবর্তনে।'[২]

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র নাজিম। সে যোগ দেয় শহরে নবগঠিত 'দাঙ্গা বিরোধী শান্তি কমিটি'তে। একদিন একটি সভায় নাজিম বলে :

এই দাঙ্গার পিছনে, ধর্মের নামে এই খুনোখুনির পিছনে কী কারসাজি আছে, এখনো না সমঝালে গরিব মানুষকে – খাটুয়ে মানুষকে হাড়ে-হাড়ে টের পেতে হবে। তাদের কত খুন কত জান দিয়ে কারা কী বাগিয়ে নিল, তাদের নসিবে কী জুটল। ইংরেজ বাদশা, কংগ্রেসি বড়বাবুরা আর লিগের বড় সায়েবরা উপরতলায় মরিয়া হয়ে খেলছে আপস লড়াই আদায় – নিকাশের ব্যবসাদারি খেলা – খেটেও যারা খেতে পায় না। তাদের জাত-ধর্ম হয়েছে এই জুয়াবাজির এক বড়ো চাল। মজুর চাষি গরিব খেপে গেছে, খেপে গেছে জাহাজের দেশি ফৌজ, ইংরেজ চোখে অন্ধকার দেখছে। কংগ্রেসি বড় বাবুদের লিগের বড় সায়েবদের বুক ধড়ফড় করছে। মজুর চাষি, গরিব মানুষ একবার চোখ মেলে মাথা তুললে, নিজেদের ক্ষমতা টের পেলে, তিন পক্ষের সর্বনাশ। ইংরেজ বাদশার অবস্থা কাহিল বটে, দেশের মানুষ তাকে সাগর-পারে তাড়াবেই তাড়াবে, কিন্তু সে জয়টা যে হবে গরিব খাটুয়ের – সর্বনাশ! তার চেয়ে ইংরেজ বাদশার সাথেই আদায় নিকাশের ঘরোয়া আপস ভালো।

দাঙ্গা হল এই আপোসের একটা দর কষাকষি! ইংরেজের সেরা চালবাজি।[৩]

---

১. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

২. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৩. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

এইদিন সভাশেষে শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় শ্লোগান ধ্বনিত হয় – 'হিন্দু–মুসলিম ভাই–ভাই, দাঙ্গা চাই না, রুজি চাই; সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক; আপসকারীরা ব্রিটিশের গোলাম, মোদের খুন ওদের শরবৎ...।[১] বিশাল মিছিল দেখে ভাড়াটে গুণ্ডারা গা ঢাকা দেয়। এই জনসভা ও শোভাযাত্রা করার পর সমস্ত এলাকায় পরিবর্তন আসে। দিনের বেলা যেসব স্থানে সাধারণ মানুষ যেতে ভয় পেত, সেসব জায়গা দিয়ে তারা নিশ্চিন্তে চলাচল করে, হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদও কমে আসে। 'নাজিম যেন নতুন একটা ধর্ম প্রচার করছে – জগতে হিন্দুও নেই মুসলমানও নেই, আছে শুধু বড়োলোক আর গরিবলোক। জগতে আছে শুধু গুণ্ডা আর তাদের শিকার লাখ লাখ কুলিমজুর, বাস্ খতম। ঈশ্বর আল্লা তাদের নয়, স্রেফ ধনী আর গুণ্ডাদের ঈশ্বর আল্লা।'[২] সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের এমন চিত্রই লেখকের চেতনায় ফুটে উঠেছে এভাবে :

> প্রতিদিন এদিকে-ওদিকে অলিতে গলিতে দু–একটা খুন–জখম হয়ে আসছিল, মাঝে মাঝে ছোটোখাটো সংঘর্ষ বাধছিল। দিনের বেলাও একপাড়ার মানুষ অন্য পাড়ায় যেতে ভয় পেত, বাজার আর ট্রামেবাসে বড়ো রাস্তার সীমাবদ্ধ একটা অংশ ছাড়া দুই ধর্মের মানুষকে একত্র চলাফেরা করতে দেখা যেত না। আজ চারিদিকের অদৃশ্য ভয়ের দেয়ালগুলি চুরমার হয়ে যেতে থাকে, ভয়ার্ত মানুষ পথে নেমে আসে, আর এই ভয় যারা সৃষ্টি করেছে – জিইয়ে রেখেছে, তারা ভয় পেয়ে আড়াল খোঁজে, খুন-জখমের মতলব আর হাঙ্গামার ষড়যন্ত্র বাতিল করে দেয়। মানুষ জানতেও পারে না আগামীর কত বড়ো একটা কুৎসিত দুর্ঘটনাকে আজকেরই সভা আর শোভাযাত্রা কাঁচিয়ে দিয়েছে।[৩]

উপন্যাসে মনসুর প্রগতিশীল কবি। সে রাত জেগে কবিতা লেখে। গিরীনের বন্ধু হওয়ায় সে গিরীনের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখে। এরপর মনসুর মুসলিম লীগপন্থী পত্রিকায় চাকরি নেয় এবং ধীরে ধীরে হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে যায়। একদিন সে দাঙ্গাবাজদের রোষানলের শিকার হয় এবং গিরীন তাকে রক্ষা করে। এসময় ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত গিরীন বলে – 'এঁকে মারবেন না, ইনি কবি, ইনি – কবি!...আমার নাম গিরীন রায়। আমি বই লিখি, ইনিও বই লেখেন। এঁর নাম কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রব ওঠে : ছেড়ে দাও।'[৪] পরে গিরীন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। এ যাত্রায় মনসুর প্রাণে বেঁচে গেলেও মনসুরের স্ত্রী রশৌনা

---

১. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

২. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৩. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

৪. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

গিরীনকেই দায়ী করে। তাদের বাড়িতে গিয়ে সে প্রচণ্ড গালিগালাজ করে। পরদিন গিরীন হাসপাতালে গেলে মনসুরও অনুরূপ আচরণ করে। গিরীন বুঝতে পারে – এজন্য মনসুর দায়ী নয়, সে পরিস্থিতির শিকার মাত্র।

গিরীন একটি ইংরেজি দৈনিকের সহকারী সম্পাদক। উপন্যাসে গিরীনের ভূমিকা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। সে আন্দোলনে সামনের সারির নেতা। উপন্যাসে তার স্ত্রী নীলিমাও রাজনীতিসচেতন চরিত্র। এরা প্রণবদের বাড়িতে থাকে। প্রণবের দাদা সুশীলের পরিবার এ বাড়িতে ফিরে আসলে একটি ছোটো ঘরে স্থান হয় নীলিমাদের। এতে নীলিমার মনে কোনো দুঃখবোধ ছিল না। সে এ বাড়ির অন্যদের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয় এবং রাজনীতিই তার জীবনের একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

গোকুল এ উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। মণির সঙ্গে দেশের চলমান রাজনীতি নিয়ে গোকুলের আলোচনা হয়। গোকুল বলে–

> কংগ্রেস বা লীগ সেরকম স্বাধীনতা চায় না যা মজুর-চাষি সাধারণ লোককে স্বাধীন করবে। ইংরেজের আপসে ওরকম স্বাধীনতা মিলতেই পারে না। নইলে ইংরেজের ভারত ছাড়া নিয়ে এত মারামারি কেন? এত শর্ত কীসের? বিদেশী তোমরা ভাগো, আমাদের যা হবার হবে, আমরা বুঝব – এই একটি মাত্র শর্ত ছাড়া স্বাধীনতা খাঁটি হয়? ফাঁকির স্বাধীনতা, তাই নানা রকম শর্ত নিয়ে দরদস্তুর।[১]

প্রকৃতপক্ষে দেশের ক্ষমতা লাভের আশায় একটি সুবিধাপ্রিয়গোষ্ঠী সবসময়ই সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিক্রয় করেছে। এজন্য তারা আপস-মীমাংসার ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থ নয়, নিজেদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়। দেশে রাজনীতির হালচাল দেখে গোকুল তাই বলে :

> দেশে আগুন জ্বলছে, সৈন্যরা পর্যন্ত বিদ্রোহী। সোজাসুজি এদেশের ঘাড়ে চেপে বসে রক্ত শোষার সাধ্য আর ইংরেজের নেই, তাই প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা দিয়ে পরোক্ষ দাসত্বে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা চলছে। সে ব্যবস্থা মেনে নিয়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছে কংগ্রেস আর লিগ।[২]

একপর্যায়ে দেশে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসতে শুরু করে। চারিদিকে বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। পুলিশ আর সৈন্যের মধ্যে এ বিদ্রোহ তীব্রভাবে দেখা দেয়। 'এমনই অবস্থা দেশের যে নেতা মশায়েরা একটিবার কোমর বেঁধে হাঁক দিলেই ব্রিটিশ শাসন জনতার ফুৎকারে উড়ে যায়। জনতার ফুৎকারের হলকায় ব্রিটিশ পাছে

---

১. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

২. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

ঝলসে পুড়ে উড়ে যায় এই ভয়ে নেতারাই হয়েছে সন্ত্রস্ত, মুশকিল হয়েছে ওইখানে। এতবেশি বিদ্রোহ দেখে নেতারা খুশি নন। বিদ্রোহ হবে মৃদু, অহিংস – আয়ত্তে থাকবে। নইলে নেতৃত্ব থাকে কীসে?[১]

স্বাধীনতার স্বাদ উপন্যাসে কয়েকটি পরিবারের মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া সমকালীন রাজনৈতিক সভা, সমাবেশ, রেশন দোকান, শুঁড়িখানা, চোরাকারবারের দোকান, পত্রিকা অফিস প্রভৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা শহরের নানা হালচাল তুলে ধরেছেন।

বস্তুত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে মানিক *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসটি রচনা করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। *'চিহ্ন* –এরপর *স্বাধীনতার স্বাদ* মানিকের এমন একটি রাজনৈতিক পটভূমি-সম্বলিত উপন্যাস যা রাষ্ট্রের, সমাজের, সমাজ-অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের এবং সমসাময়িক যুগের সামাজিক দলিল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।'[২] তদুপরি 'এ উপন্যাসে মানিকের স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তার স্ফুরণও লক্ষযোগ্য। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার এ সম্প্রদায়গত দাঙ্গার মূলে যে প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক শাসকশক্তির পরাজয়ের জ্বালা সক্রিয় – নানাভাবে সে বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত সৌহার্দ্যমূলক সম্প্রীতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। তাদের মধ্যে অকস্মাৎ এই সংঘর্ষের কারণ তাই রাজনৈতিক ও চক্রান্তমূলক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরিকল্পনা থেকেই শাসকশক্তি এর উস্কানিদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।[৩] প্রকৃতপক্ষে সমকালীন রাজনীতি এবং এর গতিবিধি সম্পর্কে মানিকের পর্যবেক্ষণ যে কতোবেশি নিখুঁত ছিল তা *স্বাধীনতার স্বাদ* উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সার্বজনীন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সার্বজনীন* (১৯৫২)[৪] উপন্যাসের বিষয় উদ্বাস্তুসংকট। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবিভাগকে কেন্দ্র করে ১৯৪৬ ও ১৯৫০ সালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাভাষী অঞ্চলে যে উদ্বাস্তু সংকট তৈরি হয় তার স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। প্রকৃতপক্ষে বিভাগোত্তর পর্যায়ে

---

১. *স্বাধীনতার স্বাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

২. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

৩. *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসসমগ্র চতুর্থ খণ্ড*, সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. বার

৪. গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক থেকে *সার্বজনীন* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চব্বিশতম উপন্যাস। এটি ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ডি. এ. লাইব্রেরি, কলকাতা।

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে উদ্বাস্তুসংকটে ব্যাপক বিপর্যয় উদ্ভূত হলেও মানিক এ-উপন্যাসে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের অমানবিক সংকটকেই শিল্পরূপ দিয়েছেন।

উপন্যাসে দেখা যায়, পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি বেজায় সস্তাদরে বিক্রি করে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছে। কলকাতাগামী ট্রেনে তাই উদ্বাস্তুদের প্রচণ্ড ভিড়। শেয়ালদহ স্টেশনে শত শত উদ্বাস্তু পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে প্রতারকরাও ভিড় জমিয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মহেশ্বর নামমাত্র মূল্যে জায়গাজমি বিক্রি করে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে কলকাতায়। তার আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। কলকাতায় একটি ছোটো বাড়ি কিনে তারা কোনোরকম জীবনযাপনের চেষ্টা করে। তবে জমানো টাকায় যে বেশিদিন সংসার চালানো সম্ভব নয় – তা মহেশ্বর জানে। তাই তার বাড়িতে সেবারের পূজা আয়োজন বন্ধ থাকে। যদিও পাড়ার ছেলেরা একটি 'সার্বজনীন পূজা উৎসবে'র কথা চিন্তা করে এবং সেই 'পূজা উদ্‌যাপন কমিটি'র সভাপতি হিসেবে তার নাম প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবের কথা শোনার পর মহেশ্বরের আত্মদহন শুরু হয়; নিকট অতীতের ঘটনা তাকে তাড়িত করে। সে বলে :

> বাপ-ঠাকুর্দার পুজো বন্ধ করলাম, তাঁরা আমায় স্বর্গ থেকে অভিশাপ দিচ্ছেন। এমন কুলাঙ্গার আমি, কোন মুখে তোমাদের পুজোয় প্রেসিডেন্ট হব? না বাবা, আমায় রেহাই দাও। আমার জ্বালা বাড়িয়ো না।...পুজোর ক-দিন আমি ঘর থেকেই বেরোব না। দরজা জানালা বন্ধ করে শুধু মাকে ডাকব স্থির করেছি।[১]

পারিবারিক পূজা আয়োজনের ব্যর্থতা মহেশ্বরকে অত্যন্ত মর্মাহত করে। সে ভাবে – তার এ অপরাধ পূর্বপুরুষদের কাছে কোনোভাবেই মার্জনীয় নয়। লেখক তার মনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> পূর্বপুরুষের দুর্গা পূজা বন্ধ করে দেবার জ্বালাটা সত্যই কত তীব্র হতে পারে। সাধন আর বুড়ো মহেশ্বরের পার্থক্যটা এখন সে বুঝতে পারে। সব গেছে মহেশ্বরের কিন্তু তবু সে ভাবেনি সব শেষ হয়েছে। বছরকার পুজোর পালা শেষ হবার সঙ্গে তাঁর কাছে বেঁচে থাকার মানেই শুধু শেষ হয়ে যায়নি, জীবনটা হয়ে গেছে ব্যর্থ, অভিশপ্ত।[২]

মহেশ্বর এজন্য প্রচণ্ড হতাশয় ভুগতে থাকে। তার মনে হয় – 'তিন পুরুষ ধরে তাদের মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করে আসা বন্ধ করে দেবার মতো গুরুতর ব্যাপারটা এরা একটু দরদ দেখিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়,

---

১. *সার্বজনীন*, চিহ্ন, পৃ-৪৮০

২. *সার্বজনীন*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮০

একটা ছেলেখেলার পূজার ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে ভোলাতে চায়। খেলনা দিয়ে ছেলে ভোলানোর মতো।'[১] প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাড়ার যুবকরা যেভাবে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন করে, সেটা যেন একটা সংগ্রাম। লেখকের উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> বিষণ্ন ম্লানমুখে মহেশ্বর এসে বৈঠকে বসেছিল। পূজা নিয়ে এলোমেলো কথায় মুখর হয়ে উঠেছে বৈঠক, কিন্তু তার নির্জীব বিষণ্নভাব ঘোচে না। যার নিজের ছেলে মারা গেছে তাকে যেন টেনে আনা হয়েছে অন্যের ছেলের বিয়ের উৎসবে। মা ফাঁদে ফেলেছেন, উপায় কী। মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার সাধ হয়েছে মার। বৈঠকের কাজ আরম্ভ হয়, তাকে প্রেসিডেন্ট করে পূজাকমিটি গঠিত হয়, প্রত্যেকের নাম ধরে চাঁদার অঙ্ক ফেলা হয়, উদ্বাস্তু কলোনির প্রতিনিধি কলোনি থেকে চাঁদা তুলবার ভার নেয়, একজন পূজা মণ্ডপের জন্য ত্রিপল আর বাঁশ দেবে জানায়, নানা প্রশ্ন ওঠে, তর্ক বাঁধে– একেবারে জমে যায় বৈঠক। সদাশিব আর বিনোদবিহারী পর্যন্ত কখন আলোচনায় যোগ দিয়ে বসে নিজেরাই টের পায় না।[২]

অবশেষে পারিবারিক ঐতিহ্যকে ম্লান করে মহেশ্বর 'সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের কবলমুক্ত সার্বজনীন দুর্গোৎসবে'র সভায় অংশ নেয় এবং পূজা আয়োজন কমিটির সভাপতির পদে আসীন হয়। তবে দুর্গোৎসবের শুরুতে মহেশ্বর হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ – 'পূজামণ্ডপে পাড়ার প্রথমবার্ষিকী সার্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধনের দিন মহেশ্বরকে দেখে টেরও পাওয়া যায় না এটা তার নিজের বাড়ির সাত পুরুষের পূজা নয় – বাড়ির কর্তা হিসেবে করার বদলে পূজাকমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে সে সব দেখাশোনা করছে, সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।[৩]

এই দুর্গাপূজা কোনো একক পূজা নয় – এটি একটি জাতীয় আনন্দ উৎসব। মহেশ্বরের অংশগ্রহণের মাধ্যমে লেখক এটিকে সার্বজনীন করে তুলেছেন।

পরমেশ্বর এ উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে মহেশ্বরের দাদা – 'সদানন্দ পুরুষ'। অনেকে তাকে ঈশ্বরবাবু বলে ডাকে। সে মানুষকে ঠাট্টা-তামাশার গল্প শুনিয়ে হাসানোর চেষ্টা করে। পরমেশ্বর বিয়ে পর্যন্ত করেনি। ছোটভাই মহেশ্বরের পাঠানো পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পেয়ে সে কলকাতা শহরের একটি ভাড়াবাড়িতে বাস করে। মানিক পরমেশ্বর সম্পর্কে বলেন :

---

১. *সার্বজনীন*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮৩

২. *সার্বজনীন*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮৪

৩. *সার্বজনীন*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮৫

হাসিখুশি সদানন্দ মানুষ। কিন্তু একেবারেই সৃষ্টি ছাড়া। এই নিরানন্দ জগতে হাসিখুশি সদানন্দ হলেই অবশ্য সৃষ্টিছাড়া হয় – শুধু সেদিক দিয়ে নয়। লোকটি সে সন্ন্যাসী নয়। কেউ কোনোদিন তাকে জপ–তম পূজা–অর্চনা করেতে দ্যাখে নি – কোনোরকম গোপন সাধন-ভজন আছে কি না চেষ্টা করেও জানা যায় নি। শুধু গভীর রাতে নয়, বিশেষ বিশেষ তিথিতেই শুধু নয়, বহুদিন ধরে দিবারাত্রির নানারকম সময়ে তার ঘরে হানা দিয়ে দেখা গেছে, ওসব ধার সে ধারে না। বিয়ে করেনি। কিন্তু এতকালের মধ্যে কামিনি সম্পর্কিত কোনোরকম ভজকট কেউ তার বেলা কল্পনা করারও সুযোগ পায় নি। নেশাও করে না। শুধু খইনি খায়। ভোজন বিলাশী নয়। খাওয়াদাওয়া অতি সাধারণ এবং বিশেষ কোনো বাছবিচার নেই। ভোগীও নয়, ত্যাগীও নয়, এ কেমন মানুষ? খায়-দায় ঘুরে বেড়ায় আর দশজনের সঙ্গে হাসিমুখে মেলেমেশে – অন্তরঙ্গ না হয়ে নিছক শুধু মেলেমেশে– এ কিরকম মানুষ?[১]

ছোটভাই মহেশ্বর সপরিবারে কলকাতায় আসলে শুরু হয় পরমেশ্বরের নতুন জীবন। সে তাদের সঙ্গে একটি দোতলা বাড়ি কিনে একত্রে বসবাস করে। মহেশ্বর তাকে নিচতলার রুমগুলি দিতে চাইলে সে তা অস্বীকার করে। সে বলে – 'তুমি আজো আমায় বুঝলে না মহেশ্বর! এতদিন পয়সা ছিল, একতলাটা ভাড়া নিয়ে একলা ছিলাম। এখন এটা আমাদের নিজের বাড়ি, তোমাদের ওপরে পাঠিয়ে আমি ওভাবে থাকতে পারি? প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হবে না একটা খাপছাড়া অদ্ভুত অবস্থায় আছি?'[২] একপর্যায়ে পরিবারের আর্থিক অনটন দূর করতে পরমেশ্বর চাকরি শুরু করে এবং মহেশ্বরের জন্যও চাকুরির খোঁজ করে। উদ্বাস্তু সমস্যার কারণেই পরমেশ্বরের মধ্যে এ পরিবর্তন হয় –

তারপর একদিন সকালে পরমেশ্বর মহেশ্বরকে ডাকে। বলে, মহেশ, এসো আমরা বসে একটু পরামর্শ করি। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে কি ব্যবস্থা করা যায় দেখা যাক। মহেশ্বর খাটের প্রান্তে বসে। বাড়ির পুজো বন্ধ করে তাকে সার্বজনীন পুজোর দায়িত্ব নেবার পরামর্শ অথবা নির্দেশ অবশ্য পরমেশ্বর দিয়েছিল – চিরকালের গা বাঁচানো ভাব ছেড়ে দিয়ে সে নিজে থেকে যেচে তার সঙ্গে পরামর্শ করবে সংসারের অচল অবস্থা সম্পর্কে – এটা মহেশ্বর কল্পনাও করে নি।[৩]

সবিতা এ উপন্যাসে অতুলনীয় চরিত্র। সে গণেশ সেজে দেশ থেকে পালিয়ে আসে। প্রথম থেকেই সে আপসহীন ও স্বাধীনচেতা নারী। উদ্বাস্তু হলে সে রোজগারের জন্য বাইরে যেতো না। কিন্তু বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে সে অনায়াসে সংস্কারকে বিসর্জন দিতে পেরেছে এবং উপার্জনমুখী হয়েছে। পদ্মাও শ্রমজীবী শ্রেণির

১. *সার্বজনীন*, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৩

২. সার্বজনীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৪২৮

৩. সার্বজনীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০৯

প্রতিনিধি। সে বিভূতিভূষণের মেয়ে। পদ্মা নিঃসঙ্গ পরমেশ্বরকে জয় করতে চায়। সে ভাবে – 'পরমেশ্বর নিশ্চয় তাকে দেখে নিজেকে সামলাতে পারবে না। নভেল পড়ে পড়ে আর সিনেমা দেখে দেখে তার ধারণা হয়েছিল নিজের বাপ-ভাই ছাড়া এ জগতে কোনো বয়সের এমন পুরুষ থাকা অসম্ভব, নির্জন দুপুরে তাকে এভাবে যেচে ঘরে আসতে দেখে যার আত্মসংবরণ করা সম্ভব। কিন্তু –

> 'পরমেশ্বর বলেছিল এসো মা এসো! আমার মা জননী এসো। আজকে বুঝি মারও মনে পড়ল ছেলে একলাটি আছে, তার সাথে দুটো কথাবার্তা বলে আসতে হবে? এমন জব্দ পদ্মা আর হয় নি।'[১]

পরিশেষে ড্রাইভার কান্তিলালের সঙ্গে পদ্মার বিয়ে হয়। বিয়ের পর কান্তিলালের একার আয়ে যখন সংসার চালানো কঠিন, তখন পদ্মা সেলাইয়ের কাজ শুরু করল। এতে তার কোনো প্রকার গ্লানিবোধ ছিল না, বরং সে এর মধ্যেই খুঁচে পেয়েছে সুখ :

> সেলাইয়ের কাজ করি। আসল দর্জি বনে গেছি– শুধু দোকান খুলিনি এই যা। পাড়ার অনেক বাড়ি থেকে কাজ দেয়, ও জানা লোকদের কাছ থেকে কাজ নিয়ে আসে। শুধু মাইনের টাকায় কি কুলোয় বাড়ি ভাড়াটাড়া দিয়ে?[২]

উপন্যাসে সাধনের পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রেখে সে ব্যবসায়ের চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়। পরে সে জুতার সোল বিক্রির মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথ খোঁজে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় 'সাধন আর সবিতা ভাটিয়ালি সুরে গান গাইছে– দেশের দুঃখ-দুর্দশার গান, সবাই মিলে তার প্রতিকার করার গান। আনন্দের মূল্য আছে, কিন্তু শুধু গান শুনিয়ে তারা রোজগার করছে না। সাধন বিক্রি করছে জুতোর সোল, সবিতা কীসের মোড়ক।'[৩]

পদ্মা, সাধন ও সবিতার জীবন-চরিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে মানিক প্রকৃত অর্থে মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্য দ্বন্দ্বময় জীবন প্রকাশ করেছেন। 'এমনিভাবে সদাশিব বা বিনোদের অধিকারবোধ, সাধন-সবিতার সংগ্রামী জীবন, পঙ্কজ-প্রতিমার সম্পর্ক, সমীর-সরমার দাম্পত্যজীবনের জটিলতা বা পদ্মা-কান্তিলালের জীবনকে ঘিরে যে ঘটনাপ্রবাহ, তারমধ্যেই ক্ষয়িষ্ণু , ধ্বংসোন্মুখ সমাজ বা পারিবারিক জীবনের এক নতুন ইতিহাস বিধৃত হয়ে যায় এবং এই ভাঙনের মধ্যেই নতুন ভবিষ্যৎ উকি দেয়।'[৪]

---

১. সার্বজনীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৪১৮

২. *সার্বজনীন*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০৫

৩. সার্বজনীন, প্রাগুক্ত, পৃ-৫১০

৪. মুহম্মদ রেজাউল হক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস, প্রাগুক্ত, পৃ-১১১

বাস্তুহারাদের জীবন সংগ্রামের মধ্যে মানিক একটি বিশেষ জীবনদর্শন আবিষ্কার করেন। *সার্বজনীন* উপন্যাসে দেখা যায় : 'তীব্রতম বেকার সমস্যায়, খাদ্য-বস্ত্রের নিদারুণ অভাব ও মহার্ঘতায়, কালো-বাজারিদের সামাজিক নেতৃত্ব দখল করায় দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার কথা বারবার এসেছে। অভাবে-অভিযোগে-দুর্নীতিতে জীবনের সব রস শুকিয়ে গেছে, হাস্য-কৌতুক হয়ে পড়েছে অবান্তর ও পরিহার্য। এই নিয়ে কিছু দার্শনিকতাও আছে উপন্যাসে পরমেশ্বরকে আশ্রয় করে। লেখক এই-সমাজ বাস্তবতাকে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তবে কাহিনিতে কেন্দ্রে উদ্বাস্তু জীবন, চারধারে তাকে ঘিরে এই বঙ্গের মানুষের জীবন। আর এ দুয়ের মধ্যে অবাধ যাতায়াত ও মিশ্রণ। তবে শিয়ালদার প্লাটফর্ম যেন অন্য বাস্তবতা। সেখান থেকে জন্মেছে লেখকের আশাবাদের তত্ত্ব।[১]

পূর্ববঙ্গের বাস্তুভূমি ছেড়ে পশিশ্চম বঙ্গে উদ্বাস্তুরূপে আসা নারীপুরুষের জীবনযাপনের চিত্রই মূলত এ-উপন্যাসে মানিক চিত্রিত করেছেন। উন্মূলিত এসব মানুষ এখানে এসে কীভাবে সমষ্টির সুখ-দুঃখ-উৎসব-অনুষ্ঠানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে এ-উপন্যাসে মানিক তা দেখিয়েছেন। 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংকীর্ণতার গণ্ডী ভেঙে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠার শ্যেষ্ঠ উপায় সম্ভব। এই উপন্যাসে উদ্বাস্তু সমস্যার এক বাস্তব চিত্রণের মধ্যে মানিক তা সুন্দর রূপায়িত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে অনেকেই গল্প উপন্যাস রচনা করেছেনকিন্তু মানিকের এই বলিষ্ঠ প্রত্যয় আর কোন লেখকের মধ্যে পাওয়া যায় না।[২] এদিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে একক ও অনন্য।

সোনার চেয়ে দামি

সোনার চেয়ে দামি (প্রথম খণ্ড-১৯৫১, দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৫২)[৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এর প্রকম খণ্ডের শিরোনাম 'বেকার' এবং দ্বিতীয় খণ্ডের 'আপস'। এ-উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন:

---

১. ক্ষেত্র গুপ্ত, *ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭০

২. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৩. সোনার চেয়ে দামি শিরোনামে দুই খণ্ডে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালের মে মাসে; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি মানিকের উনিশ ও একুশতম উপন্যাস। দুই খণ্ডের প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

> উপন্যাসটির মধ্যে স্বাধীনতা তথা দেশভাগের অব্যবহিত পরে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন নিয়ে যে বিরাট সমস্যা দেখা দেয়, তাকে কেন্দ্র করে প্রধানত কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন সূচিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার ইতিহাসে তার স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। মানিক প্রথম যে উপন্যাসে সেই আন্দোলনকে অবলম্বন করলেন তা হল *সোনার চেয়ে দামী*।[১]

মানিক এ উপন্যাসে একটি উদ্বাস্তু কলোনির কয়েকটি পরিবারের জীবনচিত্র উপস্থাপন করেছেন। তাদের জীবনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা প্রভৃতি এর উপজীব্য। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাখাল চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে বেকার জীবনকে বরণ করতে বাধ্য হয়। তবে 'গুণহীন অপদার্থ মানুষ তো রাখাল নয়। নিজের খেয়ালখুশিতে সে তো বেকারত্ব বরণ করে ঘরে বসে নেই। বাপের জমিদারি বা নিজের যথাসর্বস্ব বদখেয়ালে উড়িয়ে দিয়ে সে তো এই দুরবস্থা ডেকে আনে নি। খাটতে সে অরাজি নয়। যেমন প্রাণপণে খেটে কলেজে সে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল তেমনি মন দিয়ে প্রাণপণে খেটে সে করে যাচ্ছিল অফিসের কাজ। বিনা দোষে ছাঁটাই হওয়ার জন্য সে তো দায়ী হতে পারে না।'[২] এ পর্যায়ে টিউশনি করে সে কোনোরকমে টিকে থাকার চেষ্টা করে।

রাখাল একাই বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, স্ত্রী সাধনাকে সে আড়ালে রাখতে চেয়েছে। এমনকি স্ত্রীকে খুশি করতে সে তার ছাত্র বিশুর মায়ের গহনা পর্যন্ত চুরি করে। দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাখাল স্ত্রী সাধনাকে দেশ বিদেশের অনেক কথা শুনিয়েছে, 'দেশের আজ কেন এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা সেটা ব্যাখ্যা করেছে অনেকটা নিজের বেকারত্বের সাফাই হিসাবে। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে নিজের দোষে সে বেকার নয়, সাধনা যে কষ্ট পাচ্ছে সেটা তার অপরাধ নয়, দেশের মানুষ যাদের বিশ্বাস করেছিল, যারা সত্যিকারের মুক্তি এনে দেবে ভেবেছিল, এটা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল।'[৩]

কলোনি-মালিক প্রভাতবাবুর প্রবঞ্চনায় রাখাল মানসিকভাবে আঘাত পায়। রাখালকে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব দিয়েছিল প্রভাত। কারখানা নির্মাণের জমির জন্য উদ্বাস্তুদের সঙ্গে রাখালের মধ্যস্থতার জন্য তাকে প্রদান করা হয়েছিল চাকরির প্রলোভন। এরপর 'প্রভাতের কারখানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। কবে কারখানায় কাজ শুরু হবে, কবে দুর্গা বিষ্ণুরা ফিরে আসবে, তারই প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে থাকে

---

১. ক্ষেত্র গুপ্ত, *ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

২. *সোনার চেয়ে দামি* (প্রথম খণ্ড), সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*,, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৩. *সোনার চেয়ে দামি, প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

বলে মনে হয় যেন ধীরেধীরে গড়ে উঠছে শেডটা।'[১] কিন্তু কারখানাটি দেখতে আসা এক ভদ্রলোককে দেখে রাখালের সন্দেহ হয়। তার সঙ্গে কথা বলে সে জানতে পারে :

> কারখানা করবার কোনো মতলব প্রভাতের ছিল না। সব এই ভদ্রলোককে বেচে দিয়েছে। ওদের উঠিয়ে না দিলে জমি বিক্রি হয় না, তাই ওসব ভাঁওতা দিয়েছিল। ফ্যাক্টরি করবে, সকলকে কাজ দেবে, থাকবার ঘর দেবে – সব বাজে কথা। বামাচরণ মাঝখানে ছিল, দুজনের কাছে কমিশন বাগিয়েছে।[২]

রাখালের স্ত্রী সাধনা স্বাধীনচেতা নারী। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে দেখা যায়, সোনার গহনার প্রতি তার দুর্বলতা সীমাহীন। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তার অনেক আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয় না। ফলে রাখালের সঙ্গে তার টানাপড়েন চরম পর্যায়ে পৌঁছে। লেখক তাদের দারিদ্র্যের চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে :

> জানালা দিয়ে দেখা যায় পাড়ার ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। ছেলেরা একলা অথবা দু-তিন জন একসাথে, মেয়েরা আট দশ জন দল বেঁধে। সেও এমনিভাবে স্কুলে যেত, বেশি দিনের কথা নয়। তখনো টের পায়নি বাপের তার অভাবের সংসার। ওই ছেলেমেয়েরাও কি টের পায় আজকের সংসারের ভয়াবহ অভাব– দুচার জন ছাড়া? কোনো মতে বয়স কমে গিয়ে একবার যদি সে ভিড়ে পড়তে পারত ওদের দলে! নিদারুণ অস্থিরতা জাগে সাধনার, একটু ছটফট করে বেড়াবার জায়গা পর্যন্ত তার নেই। এই একখানা ঘরে সে একা। তার কাজ নেই, বেঁচে থাকার মানে নেই। এক পোয়া দুধ জ্বাল দিয়ে আর একমুটো ডাল সিদ্ধ করে উনানটা নিভতে দিয়ে তার শুধু প্রতীক্ষা করে থাকা যে কতক্ষণে দুটি চাল আসবে শাকপাতা আসবে, আবার উনান ধরিয়ে ভাত তরকারি রাঁধবার সুযোগ পাবে।[৩]

রাখালের দিদি অণিমার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর সংকট তীব্র হয়। একপর্যায়ে রাখালকে না জানিয়েই সাধনা তার গলার হার বিক্রি করে দেয়। পরবর্তীকালে নতুন হার তৈরির অর্থ থাকলেও তার ইচ্ছে হয় না। কারণ পার্শ্ববর্তী বস্তির উদ্বাস্তুদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন দেখে তার মধ্যে পরিবর্তন আসে –

> কোথায় যেন একটা বড় ফাঁকি রয়ে গেছে জীবনে। শাড়ি গয়না দিয়ে দশজনের কাছে বড়লোক সাজবে, স্বামী সোহাগিনী সাজবে – এ চিন্তাটাও আজ হাস্যকর হয়ে গেছে। সকলের সঙ্গে অতল ফাঁকিতে হাবুডুবু

---

১. *সোনার চেয়ে দামি, দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

২. *সোনার চেয়ে দামি, দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৩. *সোনার চেয়ে দামি, প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

> খেতে খেতে এসব ছেলেমানুষী ফাঁকির খেলায় আর মন মজে না, সারা গায়ে গয়না চাপানো বাসন্তীকে দেখলে শুধু হাসি পায় না, গাও ঘিনঘিন করে। অথচ রাখাল তার গলা খালি করে হারটা বেচে দিয়েছে – দশজনের এই ভুল ধারণাটা অসহ্য ঠেকছে তার।[১]

উপন্যাসে সাধনা প্রগতিশীল নারীর প্রতীক। সে উদ্বাস্তুদের প্রতি সহমর্মিতাসূত্রে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয় এবং আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তার দ্বিমত হয় এবং পরিশেষে স্বামীকে পরিত্যাগ করে সে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয়। 'কলোনীর নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষগুলির মধ্যে অর্থনীতি সংক্রান্ত ভাঙনের জন্য কিভাবে অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে সাধনা তা লক্ষ্য করে। যৌথ পরিবারের সকলের স্বার্থে কীভাবে শোভাকে বিবাহ না দিয়ে অবৈতনিক দাসী বানানো হয়েছে তাও তার দৃষ্টি এড়ায় না।'[২] সাধনার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তৃতা প্রদানের জন্য তার কাছে প্রস্তাব আসে।

কলোনি-মালিক প্রভাতবাবু এ উপন্যাসে ধনতান্ত্রিকশ্রেণির প্রতিনিধি। দরিদ্র মানুষের সামান্য আশ্রয়ের জন্য যে স্থান নির্ধারিত হয়েছিল, প্রভাতবাবু সেখানে একটি কারখানা গড়ে তুলতে চান। কলোনিবাসীর প্রতিরোধে পিছু হটলেও, পরে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে তিনি তাদের শান্ত করেন।

প্রভা সচ্ছল পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে। সে সমাজ সচেতন এবং নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। রাখাল তার গৃহশিক্ষক। নারীমুক্তির বিষয়ে রাখালের সঙ্গে প্রভার নানা আলোচনা হয়। রাখালের সম্পর্কে তার মূল্যায়ন হলো –

> বেকার জীবনের দারিদ্র্য কি পরিবর্তন এনেছে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কের। যদি এনে থাকে সে পরিবর্তনের মর্মকথা কী? জানে যে দারিদ্র্য রসকষ শুষে নেয় জীবনের, জ্বালা আর অশান্তির রুক্ষতা এনে দেয় মাধুর্য কোমলতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে। কিন্তু ঠিক কী রকম হয় তার ভিতরের রূপটা? পরস্পরের সম্পর্কে মিষ্টতার অভাব ঘটে, কারণে অকারণে তিক্ততার সৃষ্টি হয় – কিন্তু এসব সত্ত্বেও পরস্পরকে গ্রহণ তো তাদের করতে হয়। মানিয়ে চলতে হয় দুজনকে, মেনে নিতে হয় পরস্পরকে।[৩]

---

১. *সোনার চেয়ে দামি*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

২. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৩. *সোনার চেয়ে দামি*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

আশা এ উপন্যাসে অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির। তার ব্যবহারে সৌজন্যের চিহ্নমাত্র নেই। সাধনার স্বামী বেকার বলে সে তাকে বারবার অপমান করেছে। আবার চরম বিপদে সে তাদেরই সাহায্য কামনা করেছে। স্ত্রী-আশার মনোরঞ্জনের জন্য তার স্বামী সঞ্জীব দেনাগ্রস্ত হয়। প্রতিফলে তারা অত্যন্ত কষ্টকর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। এমনকি কয়েক মাসের বাড়িভাড়াও তাদের বাকি থাকে। একপর্যায়ে রাখালের সাহায্যপ্রার্থী হয় আশা। তখন –

> সব কথা মনে পড়ে কিন্তু তুচ্ছ হয়ে যায়। এখন সে বিপদে পড়েছে, এখন তো বিচারের সময় নয় আশার। ... সঞ্জীব পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রাখাল কথা বলে পাওনাদার লোকটির সঙ্গে। গায়ের গয়না পুঁটলি করে এনে আশা হাতে তুলে দেয় রাখালের![১]

জটিল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এ উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহকে গতিময় করে তুলেছে। 'রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক পরিবর্তন কিংবা অর্থনৈতিক সংকট যে কারণেই হোক সমাজে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে রূপান্তরের চিহ্ন। এরূপ বাস্তবতায় সংসারে অনিবার্য হয়ে উঠেছে নারী-পুরুষের সমান ভূমিকা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুজনের সমানাধিকার – এ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মানিক পাঠকের কাছে এই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছে।'[২] এছাড়া মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণির অনেক চরিত্রের উপস্থিতি উপন্যাসের কাহিনিকে সমৃদ্ধ করেছে। রাখাল, সাধনা, শোভা, নির্মলা, বিশুর মা, ভোলার মা, বাসন্তী, সঞ্জীব, আশা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সমকালীন আর্থ-সামাজিক সংকটকেই চিত্রিত করেছেন। জীবন যে আসলে স্বর্ণমূল্যের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ; আশা-সঞ্জীব এবং বাসন্তী-রাজীব সম্পর্কের মাধ্যমে তা মানিক স্পষ্টতায় আভাসিত করে তুলেছেন। আশা বিত্তশালী বলে রাখাল ও সাধনাকে সে উপেক্ষা করতো; আশার স্বামী সঞ্জীব এত প্রচুর পরিমাণে অর্থঋণ করেছিল যে, আদালত থেকে লোক এসে তার মালপত্র ক্রোক করে তার দেনার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। অথচ মানব সম্পর্কের এমনই কারুকৃতি যে, সঞ্জীব-আশার অবজ্ঞাত রাখাল-সাধনার কাছেই তাদের দুরবস্থার সময় সাহায্যের প্রয়োজনে তাদেরকে ছুটে আসতে হয়েছে। প্রচণ্ড বিত্তশালী মানুষও যে অকস্মাৎ সর্বস্বান্ত হয়ে যেতে পারে, রাজীবের আর্থনীতিক নেতিবাচক মোড়ের মধ্যে তা আমরা আভাসিত দেখি।[৩]

সোনার চেয়ে দামি উপন্যাসে মানিক দেখাতে চেয়েছেন সংগ্রাম কেবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধেই নয়, বরং তা পুরনো চিন্তা-চেতনা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে। পুরনো সংস্কার ভেঙে উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো অন্বেষণ করেছে

---

১. *সোনার চেয়ে দামি*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭০

২. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মনিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩

৩. রহমান হাবিব, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, নবযুগ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৮৮

সোনার চেয়ে দামি বিষয়টিকে। আশা আর বাসন্তীর কাছে সোনার চেয়ে দামি হয়ে উঠেছে তাদের স্বামী তথা দাম্পত্যজীবন। অন্যদিকে সাধনার কাছে বড় হয়ে উঠেছে রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কার। এই অভিজ্ঞানই এ-উপন্যাসের নারী-পুরুষের জীবনকে আলোকে আলোকময় করে তুলেছে। তারা উপলব্ধি করেছে, 'আজ সংগ্রাম কেবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধেই নয়, সংগ্রাম পুরোনো ভাবধারার বিরুদ্ধে, পুরানো সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেই সংগ্রাম শুরু হয়েছে ঘরে ঘরে। এই উপন্যাসে মানিক তারই এক সুন্দর আলেখ্য রচনা করেছেন। [১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ ও রাজনীতিচেতনার অলোকসামান্য দীপ্তিতে উপন্যাসটি উজ্জ্বল।

ইতিকথার পরের কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ইতিকথার পরের কথা* (১৯৫২)[২] পুরোমাত্রায় রাজনৈতিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে জমিদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে কৃষকদের শোষণমুক্তির সংগ্রাম পরিবেশিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বারতলা গ্রামের জমিদার জগদীশের পুত্র শুভময়। সে বৃটেনে গিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেছে; কিন্তু উপনিবেশবাদ তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। 'সেখান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের মাধ্যমে রাজনীতির বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করে এসেছে। দেশে ফিরে দেশের মানুষের কল্যাণে যন্ত্রশিল্পের উন্নতি সাধন করতে গিয়ে প্রথমে সে উপলব্ধি করে তার জাতীয়তাবাদী চেতনার সীমাবদ্ধতাকে। অতঃপর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে বুঝতে পারে, দেশের মঙ্গল আসলে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণের মধ্যেই নিহিত। এই নতুনতর বোধই তাকে শোষক জমিদার-পিতার সঙ্গে বিরোধের দিকে অনিবার্য ঠেলে দেয়।'[৩] সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেশগড়ার সংগ্রামে অংশ নেয়ায় পিতার সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধে।

শুভময় জমিদারনন্দন হলেও জমিদারের শোষণ-নির্যাতনের বিরোধী। জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারে সর্বস্বহারা মানুষের প্রতি সে সহানুভূতিশীল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত শুভ চায় এদেশের মানুষের জীবনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসুক; কৃষকরা বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ-প্রক্রিয়া রপ্ত করে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করুক। সে নন্দ ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে আড়ালে থেকে সংগ্রামী কৃষকসমাজের আন্দোলন-সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা শোনে, এবং বুঝতে পারে, দিন বদলাতে শুরু করেছে। শুভ মানুষের দুঃখ-দুর্দশায়

---

১. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

২. *ইতিকথার পরের কথা* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে। এর প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এটি 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩৫৭ সনের মাঘ সংখ্যা থেকে ১৩৫৮ সনের চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত মোট তেরো কিস্তিতে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক থেকে এটি মানিকের বাইশতম উপন্যাস।

৩. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

পাশে দাঁড়াতে চায়। এ বিষয়ে সে পরামর্শ করে তার সহপাঠী নন্দের সঙ্গে। শুভ গ্রামে কামারশালা ও তাঁতশিল্প বানাতে চায়, গণমানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে চায়।। কিন্তু তার ভাবনা নন্দ পুরোপুরি বুঝতে পারে না। শুভ তাকে বুঝিয়ে বলে :

> শিল্পে পিছানো দেশ। বহুকালের পরাধীন দেশ। এশিয়া নামক বিশেষ অবস্থানের মহাদেশটির অন্তর্গত দেশ। শিল্প কম, চাষ বেশি – দরিদ্র অন্নহীন কর্মহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিরাট জনশক্তি। এখান থেকে শুভ যখন শুরু করে সব জলের মত পরিষ্কার লাগে। তারপর শুভ যখন আসে শিল্পোন্নতির ধরাবাঁধা পথের বদলে দেশের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিশেষ প্রাথমিক ব্যবস্থার প্রয়োজনের কথায়, তখনো নানা প্রশ্ন মনে এলেও কথাটা মোটামুটি বোঝা যায়।[১]

শুভ আরও বলে :

> আমি কি সারাদেশের কুটিরশিল্প কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় করার কথা ভাবছিলাম? চারদিকে এসব যতটা দরকার ছড়িয়ে আছে এবং থাকবেও। আমি বলছিলাম বাড়তি যে ম্যানপাওয়ার স্রেফ অপচয় হয়ে যাচ্ছে সেটাকে এই রকম প্রাথমিক শিল্প প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধ করা, কাজে লাগানো। বড় বড় মডার্ন কারখানা না গড়লে এই লাখ লাখ লোকের বেকারত্ব ঘুচবে না, আমার মতে এটা ভুল ধারণা। এটা হচ্ছে পরের স্টেজ। মডার্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে মডার্ন ইন্ডস্ট্রি আমরা যখর এখনই বাড়াতে পারছি না – কুটিরশিল্পের স্টেজের প্রাথমিক ইন্ডাস্ট্রি আমরা গড়তে পারি। ইওরোপ আমেরিকায় এটা হয় না, এ দেশে সম্ভব।[২]

এরকম একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে সকলকে আস্থায় নিতে হবে. এবং তাদেরকে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে হবে, সচেতন করতে হবে। শুভ তার আশা ও স্বপ্নের কথা বলে যায় :

> আমি ওরকম আন্দোলনের কথা বলছি? যা করব নিজে করব, নিজের জন্য করব– নতুন রকম কিছু। আমার সাক্সেস দেখে দশজনে আমায় ফলো করবে। একেই আমি বলছি ইন্ডাষ্ট্রিতে নতুন একটা আন্দোলন সৃষ্টি করা। এদেশের বিশেষ অবস্থায় যেটা উপযোগী হবে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বুঝতে পারছ কথাটা? কোন কাজে আমাকে লাগতে হবেই। বাপের জমিদারি আছে বলে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারবো না।[৩]

---

১. *ইতিকথার পরের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

২. *ইতিকথার পরের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

৩. *ইতিকথার পরের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে লক্ষ্মীর আলোচনা শুনে শুভ অবাক হয়ে যায়। গজেনের বাল-বিধবা স্ত্রী লক্ষ্মী এখন কৃষক আন্দোলনের নেত্রী। ভবিষ্যেতের কাজ আর দায়িত্ব নিয়ে সেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। লক্ষ্মীর সম্পর্কে লেখক বলেছেন :

> শহর আর গাঁয়ের নানা আন্দোলনে সে যোগ দেয় প্রাণের তাগিদেই, কিন্তু দো-মনা ভাবটা নাকি তার ঘোচে না। সে বুঝে উঠতে পারে না কীসে আর কীভাবে কী হবে। উৎসাহ তার ঝিমিয়ে আসে– মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়ে। নানা কথা নানা মত শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে যায়। না জেনে না বুঝে অন্ধের মত কাজ করতে পারে কেউ? শুধু বুকের জ্বালা সম্বল করে? আর পাঁচজন লড়ছে– শুধু এই উৎসাহ নিয়ে? কেউ যদি সহজ সরল ভাবে তার বোধগম্য করে দিত ঠিক কীভাবে শত রকমের দুর্দশা ঘুচবে মানুষের?[১]

কৈলাশ ও লক্ষ্মী চিন্তায় পড়ে যায়। তারা ভাবে কিন্তু কীসে কী হবে তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। দুঃখ, দুর্দশা এই গ্রামের লোকদের নিত্যসঙ্গী। তাই তারা নিজেদেরকে দুর্ভাগা মনে করে। ভূষণ ও শ্রীনাথ মাইতি হা-হুতাশ করে তাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে। অথচ এসব মানুষকে যদি সঠিক পথের দিশা দেওয়া যায় তাহলে দেশেরই মঙ্গল। এদের হতদশাকে অশ্রদ্ধা না করে বরং এদেরকে দেশের প্রয়োজনে কাজে লাগানোর অদম্য একটা প্রত্যয় শুভকে আন্দোলিত করে :

> দেশের মানুষকে সে মোটেই হীন জ্ঞান করে না। আদর্শের জোরে, দেশকে ভালোবাসার জোরে এসব মানুষের উপর শ্রদ্ধা ঠেলেঠুলে খাড়া রাখবার প্রয়োজনও তার হয় না– শিক্ষিত সমাজে এই সহজ সত্যটা থিয়োরিতে স্বীকৃত হয়ে থাকার বদলে সাধারণ বাস্তব উপলব্ধির চারা হয়ে মাথা তুলেছে। অনেক স্বপ্ন আর কল্পনা গুঁড়ো হয়ে গিয়ে অনেক ব্যর্থতার জ্বালায় পুড়ে পুড়ে বোধ জন্মাচ্ছে যে এইসব সাধারণ মানুষেরা তাদেরও ভবিষ্যতের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় নয়, একেবারে অপরিহার্য। নিজের শ্রেণীর ভবিষ্যৎ স্বার্থ– এই বাস্তববোধটাই কিনা ভিত্তি সকল আত্মীয়তাবোধের, তাই শুভও স্বাভাবিক মমতা আর আত্মীয়তাবোধ দিয়েই শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার প্রশ্নটাকে বাতিল করে দিতে পেরেছে। যে কারণে এদের সংকীর্ণ নিজস্ব কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, শিক্ষাহীন ভোঁতা মন– সেই কারণের বিরুদ্ধে যে জ্বালা স্থায়ীভাবে জ্বলছে তার মধ্যে তাতেই অসম্ভব হয়ে গিয়েছে এদের পরের মতো হীন ভাবা, অনাত্মীয়ের মতো নিচু স্তরের অশ্রদ্ধেয় জীব মনে করা। সে কথা নয়। দেশের মানুষকে আপন মানুষ ভাবতে পারার পর এদের পিছনের অন্ধকারে ঠেলে রাখা বোকাহাবা নোংরা ভাঙা মানুষ আর কুসংস্কারের ডিপো ভাবার জন্য নিজের কাছে লজ্জা পাবার কারণ ঘটে না। দেশের

১. *ইতিকথার পরের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

মানুষ যেমন তাকে ঠিক সেরকম জেনে রাখা ভেবে নেওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই।[১]

সাধারণ মানুষের জন্য শুভর অন্তর্জাগতিক সমবেদনা ও ইতিবাচক উদ্যোগের কারণে পিতা জগদীশের সঙ্গে তার বিরোধ তৈরি হয়। জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য দেওয়ার জন্য পিতা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় এই বলে যে,

এই মুহূর্তে তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি আমার খাবে পরবে আর সভায় দাঁড়িয়ে আমায় গালাগালি দেবে! এত বড় নচ্ছার হারামজাদা ছেলে দিয়ে আমার দরকার নেই।...এক ঘণ্টার মধ্যে যদি তুমি বেরিয়ে না যাও এ বাড়ি থেকে, চাকর-দারোয়ান দিয়ে জুতো মেরে তোমায় আমি খেদিয়ে দেব।[২]

তাতে শুভ দমে যায়নি। সে চলে যায় কলকাতার হোস্টেলে। সেখানে আত্মীয়-স্বজন অনেকেই তার সঙ্গে দেখা করে নিয়মিত। তার মনে হয়, সে যেন এক নতুন জগতে বসবাস করছে। এ-পর্যায়ে পিতা জগদীশ হার মানেন পুত্রের কাছে। পুরো জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব শুভর উপর অর্পণ করতে চান তিনি, এমন কি কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করে তিনি অবসরে যেতে চান। কিন্তু শুভ তাতে রাজি হয়নি। কারণ শুভ জানে এতে এ সমস্যার সমাধান হবে না। উপরন্তু সে তার পিতাকে জমিদারি প্রথা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে বলে। শুভর বক্তব্যে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ভগ্নচিত্তে তিনি বাড়ি ফেরেন এবং নতুন করে প্রজাদের ওপর শুরু করেন শোষণ, নির্যাতন। গ্রামবাসীর উপর পিতার অত্যাচারের তীব্রতা শুনে এ-পর্যায়ে শুভ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। সে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়, এজন্য পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। সে অকপটে গজেনকে বলে :

আমায় দোষী করছ? তোমরা জান না বাবা আমায় ত্যাগ করেছেন, খেদিয়ে দিয়েছেন? কথাটা বলেই শুভর খেয়াল হয় ইচ্ছে করে না হলেও সে মিথ্যা কথা বলেছে। জগদীশ তো তাকে ত্যাগ করেনি, তাড়িয়ে দেয়নি। সে-ই ত্যাগ করেছে জগদীশকে, তার স্বাধীন স্বতন্ত্র আগামী জীবনের বর্তমান সীমানারও বাইরে। [৩]

---

১. *ইতিকথার পরের কথা*, প্রাগুক্ত, ৩২৬

২. *ইতিকথার পরের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১-৩৮২

৩. *ইতিকথার পরের কথা*, প্রাগুক্ত, ৩৯২

জমিদারতন্ত্র যে প্রকৃতপক্ষে নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতার নামান্তর তা বুঝতে পেরেছে বলেই শুভ পিতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কাতারে শামিল হয়ে যায়। লক্ষ্মী, মায়া আর শ্রমজীবী মানুষের সান্নিধ্যে শুরু হয় তার নতুন জীবন।

ইতিহাসের বিচারে দেখা যায়, সদ্য স্বাধীন দেশে গরিব চাষিদের ভাগ্যের তেমন পরিবর্তন আসেনি। শোষণ-পীড়নও আগের মতোই রয়ে গেছে। কংগ্রেস সরকার এবং সরকারের পেটোয়া বাহিনী শোষকদের পক্ষে কাজ করেছে, গরিব চাষিদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে, তাদের ধরে জেলে দিয়েছে। গুলির আঘাতে গজেন পঙ্গুত্ববরণ করেছে।

বস্তুত, *ইতিকথার পরের কথা* উপন্যাসের কাহিনিতে কৈলাশ এবং লক্ষ্মীর কথা প্রাধান্য পেয়েছে। কৈলাশ কালিসাধক ত্রিভুবন দত্তের ছেলে। কৈলাশের সঙ্গে লক্ষ্মীর দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা। এই কৈলাশ-লক্ষ্মী অধিকাররক্ষায় দৃঢ়সংকল্প কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। তারা সোভিয়েত আর চীনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। শুভও এই নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ। গ্রামের জমিদার পিতা জগদীশ সেখানে অবজ্ঞার পাত্র। লেখক শুভ চরিত্রের মধ্য দিয়ে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও সে হয়ে উঠেছে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অনুসারী। দিন বদলাতে শুরু করেছে। আগামির বদলে যাওয়া সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে তরুণ সমাজ; যারা পুরোনো সমাজব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনা ও কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে বদলে দেবে।

ইতিকথার পরের কথা উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, নতুন সমাজসৃষ্টির জন্য কেবল আত্ম-নিবেদিত হলে হয় না, তাকে বিজ্ঞানমনস্কও হতে হয়। পুরনো ক্ষয়িষ্ণু শোষণক্লিষ্ট ব্যবস্থার মধ্য থেকেই জন্ম নেয় নতুন কালের, নতুন চেতনার মানুষ। শুভ সেই শ্রেণিরই প্রতিনিধি। তার এই নবতর চেতনাই তাকে তার শোষক জমিদার-পিতার সঙ্গে বিরোধের দিকে ঠেলে দিয়েছে অবশ্যম্ভাবীরূপে। আর এই অন্তর্গত উপলব্ধিই *ইতিকথার পরের কথার* মূল উপজীব্য, যা মানিক অতি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মূলত, জগদীশ আর শুভর সঙ্গে আদর্শের, ব্যক্তিত্বের যে বিরোধ, শুভর যে শোষিত কৃষকদের দিকে ঝোঁক তৈরি হওয়া, তার মধ্যেই লেখকের একটা বিশেষ রাজনৈতিক ভাবনা রয়েছে। উপন্যাসে শুভর শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্যোগ একটি বিশেষ মাত্রা সংযোজন করেছে। সোভিয়েত ধাঁচের পরিকল্পিত অর্থনীতি ছাড়া যে বাঁচার বা উন্নয়নের পথ নেই – মানিকের এ অভিপ্রায় উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আরোগ্য

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের *আরোগ্য* (১৯৫৩)[১] উপন্যাসে প্রত্যক্ষ রাজনীতি নয়, বরং রাজনৈতিক শিক্ষার বিবরণ রয়েছে। উপন্যাসটিতে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মানিকের মমত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মানিক দেখিয়েছেন, 'অবস্থার চাপে পড়ে অনেক মধ্যবিত্ত যুবককে শ্রমিকজীবন গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং চরম ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়েও তারা তাদের পুরনো সংস্কারকে বর্জন করতে পারে না। ফলে নিজের বর্তমান অবস্থাকে সহজভাবে গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং তারা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে।'[২]

কলকাতার ব্যস্ততম রাজপথের একটি দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়। আর জীবন-পথের একটি নতুন প্রত্যয় দিয়ে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে; মাঝখানে রয়েছে শাহরিক মানুষের বিকারগ্রস্ততার বৃত্তান্ত। 'এ উপন্যাসে গল্প আছে অনেক। সে অর্থে বৃত্তও আছে বেশ কয়েকটা। মূল বৃত্তটি কেশবের এবং তার কেন্দ্রও সে। কিন্তু অন্য যে বৃত্তগুলো আছে তার কেন্দ্র নির্দিষ্ট নয়। যেমন ললনার বৃত্ত, কানুর বৃত্ত, মায়ার বৃত্ত, মোহিনীর বৃত্ত। ললনার বৃত্তে একবার অনিমেষ চলে আসছে কেন্দ্রে, আরেকবার ললনাই থাকছে কেন্দ্রে, প্রান্তে চলে যাচ্ছে অনিমেষ। মোহিনী তার বৃত্তের কেন্দ্র ভাগ করে নিচ্ছে ভুবনের সঙ্গে। সব মিলিয়ে যে বৃত্তটি তার নাম নগর ও এর বিকারকে আবিষ্কার।'[৩]

আরোগ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কেশব ড্রাইভার। সে চোরাকারবারিসহ নানা অপকর্মের হোতা অনিমেষের গাড়ি চালায়। পুরো উপন্যাসে কেশবের সপ্রতিভ উপস্থিতি লক্ষণীয়। ড্রাইভারির সূত্রে সে অনিমেষের মেয়ে ললনা ও তার বান্ধবীকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে। ললনার কাছ থেকে সে বই নিয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তার জীবনানুভূতির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় দুই নারীকে কেন্দ্র করে : একদিকে প্রেমিকা মায়া এবং অন্যদিকে মালিককন্যা ললনা। দুজনের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি এমন : 'মায়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শহরতলীর নিজগৃহ প্রতিবেশ, সেটা এক সচেতন বাস্তবতার জগৎ। ললনা মালিক কন্যা, সেটা এক স্বপ্নের জগৎ, অবচেতন পৃথিবী। রাত তাকে টানে গৃহে। মায়ার সান্নিধ্য কামনায় সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হলেই সে হয়ে পড়ে

---

১. *আরোগ্য* উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০)। এর প্রকাশক ক্যালকাটা বুক ক্লাব লি.। গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক থেকে এটি মানিকের ছাব্বিশতম উপন্যাস।

২. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬

৩. হামীম কামরুল হক, 'সমাজের আরোগ্য ব্যক্তির সুস্থতা', সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (সম্পা.), *উত্তরাধিকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮

অস্থির। আর রাত পোহালেই শহরের প্রতি তার আকর্ষণ। গাড়ি চালনার নিয়মিত চাকরির বিষয়টি এর বাহ্যিক উপাদান মাত্র; কিন্তু অবচেতন মনে শিক্ষিতা ধনীকন্যা ললনার উন্নত রুচিশীল সংস্কৃত আচরণের প্রতি রয়েছে তার এক দুর্বার মোহ। এই মোহ বা আকর্ষণের মূলে প্রণয় আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করার কোন সুযোগ পায়নি কেশব। এটি মনোরোগ বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণে আবিষ্কৃত হয়।[১]

কেশব বুঝতে পারে – নানা রোগ-শোক নিয়েই তার একঘেয়ে জীবন। চিকিৎসার খরচ মেটাতে বাড়ি বন্ধক দিয়ে সে পরিবারের সকলের কাছে অপ্রিয় হয়। তারপরও চিকিৎসায় তার বিশেষ লাভ হয়নি। ডাক্তার দত্ত তাকে বলেন – 'তেজ আর একগুঁয়েমির জন্য তোমার হল মুশকিল। তুমি আপস করলে না – দুটো জীবনকেই ভোগ করতে চাইলে। অসম্ভবকে চাইলে, স্বপ্নকে বাস্তব করার সাধটা আঁকড়ে ধরলে। ফল দাঁড়ালো হিস্টিরিয়া।'[২]

রোগমুক্তির জন্য বন্ধু কানু মিস্ত্রির সঙ্গে কেশবের আলাপ হয়। সে বুঝতে পারে – সংসারটা যতদিন না পাল্টাচ্ছে, ততদিন তার রোগ নিরাময়ের কোনো পথ নেই। কেশব তার বন্ধু কানুকে বলে –

> আমার অসুখ কেন জানিস? সংসারটা বদখত হয়ে আছে বলে। সংসারটা পাল্টে দেবার লড়াই করব ঠিক করেছি।
>
> কানু বলে, বটে! তা ও লড়াইতো কত লোকেই করছে। সংসারটা যদ্দিন না পাল্টাচ্ছে তদ্দিন তোর রোগ সারবে না।
>
> কেশব বলে, শোন না, সেই কথাই বলছি। সবার জীবন শুধরে দেবার লড়াই করব ঠিক করতে রোগ যেন অর্ধেক কমে গেছে। লড়াই আরম্ভ করলে নিশ্চয় আরোগ্য।[৩]

উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ললনা। সে গণসংগীত শিল্পী। জীবনকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ করার জন্য সে সিনেমার অভিনয় ছেড়ে গণসংগীতের ধারায় এসেছে। পরিবারের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সংকটে সে যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয় তা অভাবনীয়। গানের টিউশনি থেকে শুরু করে সিনেমায় অভিনয় ও গান পরিবেশনের মতো কাজেও সে নির্দ্বিধায় অংশগ্রহণ করে বৃহত্তর পারিবারিক কর্তব্য পালনের আন্তর্গরজে। সিনেমার কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে সে বজায় রাখে তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ। সে নতি স্বীকার করে

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ষোল

২. *আরোগ্য*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

৩. *আরোগ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

না দ্রুততম উন্নতির প্রলোভনের কাছে। জীবন সম্পর্কে সচেতন, উদার ও মানবিক গুণসম্পন্ন, সুস্থ ও ইতিবাচক মনের অধিকারী নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাদের কল্যাণে আত্মনিবেদিত চরিত্র হিসেবে ললনার বক্তব্যক্রমধর্মী।[১]

ললনা প্রসঙ্গে সমালোচকের আরেকটি উক্ত স্মরণীয় :

> ধনীকন্যা হলেও ললনা চরিত্রটিকে মানিক নিজ আদর্শের উপযোগী করে নির্মাণ করেছেন। গাড়িচালক হওয়া সত্ত্বেও কেশবের প্রতি আচরণে ললনা বন্ধুভাবাপন্ন। তার সঙ্গীতসাধনা ধনাঢ্য যুবকের বিকারতপ্ত জীবন ধারায় মনোরঞ্জনের জন্য নিবেদিত নয়। বরং সে মানবমুক্তির লড়াইয়ে অনুপ্রেরণামূলক গান পরিবেশন করেই নিজ শিল্পীজীবনের পরিতৃপ্তি খোঁজে। এমনকি রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ উপেক্ষা করেও সে লড়াইয়ের গান গায়। বিত্তবান যুবকের ভোগবাদী জীবনের উচ্ছৃঙ্খল বিলাসিতায় সে মোটেই স্বস্তিবোধ করে না। বরং নিজ গাড়ির চালককে অপরিচিতজনদের কাছে নিঃসংকোচে বন্ধু বলে পরিচয় দেয়। এই আচরণের মধ্যে তার কোন বিকারগ্রস্ততা নেই, আছে ঔদার্য, শ্রেণিগত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের প্রতি মর্যাদাবোধ।[২]

উপন্যাসের বঙ্কিম নামের একটি ক্ষমতাধর ও প্রতিপত্তিশালী চরিত্র রয়েছে। স্থানীয় সভা-সমাবেশ-সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছাড়া সে অংশগ্রহণ করে না। ক্ষমতার কারণে সে বিভিন্ন চোরাকারবারির মুনাফার ভাগ পায়। বাড়িতে তার আগমন ঘটলে সকলে তটস্থ থাকে। তবে পঞ্চাশোর্ধ বয়সেও সে বিয়ে করেনি। ঘটনাচক্রে ললনার গান শুনে বঙ্কিম ব্যাকুল হয় এবং সিনেমা দেখার পাস পেয়ে ললনাকে সাথে নিয়ে যায়। ললনাকে কাছে পাওয়ার জন্য বঙ্কিম প্রতিমাসে তার বাড়িতে গানের আসর বসায়। একদিন বঙ্কিম বিশেষভাবে ললনাকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ করে। এদিন বঙ্কিম তার সাথে অশোভন আচরণ করলে সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।

কেশবের বন্ধু কানু মিস্ত্রি এ উপন্যাসের একটি জীবন্ত চরিত্র। কেশবের মতো সে বিকারগ্রস্ততায় আচ্ছন্ন নয়। সে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বাস্তবতাবোধ সম্পন্ন মানুষ। কেশবের জন্য কানু নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করে।

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. উনিশ

২. প্রাগুক্ত

এ উপন্যাসে সুস্থ সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা কীভাবে বাধাগ্রস্ত হয় – তারও নিদর্শন রয়েছে। অর্থের কাছে প্রতিভা নষ্ট করে ললনা সিনেমায় গান গায়। নায়িকা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে স্বামী ভুবনের সংসার ত্যাগ করে মোহিনী। এসবই সমকালীন সমাজে চর্চিত অপসংস্কৃতির বাস্তবচিত্র। উপন্যাসের চরিত্রপাত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেছেন মানিক :

> সিনেমা-জগৎটাকে কদর্য করে রাখা হয়েছে সত্যি, কিন্তু সেটা শুধু মাতাল আর বেশ্যাদের জগৎ নয়। টাকার চেয়ে কিছুই বড় নয় সেখানে, মনুষ্যত্বের কেনাবেচা চলে কিন্তু রূপ আর গুণেরও খানিকটা কদর আছে বইকি?
>
> কারিগর আর কাঁচামাল ছাড়া তো কিছুই তৈরি হয় না। যতই সস্তা করা হোক ছবি, যতই চেষ্টা চলুক সস্তায় রূপ ও গুণ ভাড়া করার রূপসী আর গুণীদের বাদ দিয়ে ছবি তোলা কর্তাদের সাধ্য নয়।
>
> শুধু রূপও ওরা কেনে। রূপসী অভিনয় একেবারে না জানুক, ডায়লগ বেশি নেই, অ্যাকশন বেশি নেই, রূপসী মেয়েটিকে এখানে-ওখানে গুঁজে দিয়ে ছবি জমাবার সস্তা কায়দায় ওরা নিজেদের ওস্তাদ ভাবে।[১]

মানিক এ উপন্যাসের মাধ্যমে কেবল অর্থনৈতিক মুক্তি নয়, সাংস্কৃতিক মুক্তির কথাও বলেছেন। 'মানিকের মতো লেখকের উপন্যাস-কে একালে বিচার করতে গেলে তাকে কেবল সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে বা রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক হিসেবে তকমা পরিয়ে দেওয়া যাবে না। আরোগ্য উপন্যাসটির গতিপথ খেয়াল করলে দেখা যাবে – এটি তথাকথিত সামাজিক উপন্যাসের গতি নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হয়ে শেষাবধি যে জায়গাটিতে এসে থামে তার পেছনে যেন একটা রাজনৈতিক প্রণোদনাই প্রধান হয়ে ওঠে। সমাজকে সুস্থ করে তুলতে হবে, সবাইকে শুধরে দেওয়ার জন্য লড়াইয়ে নামতে হবে – এমন একটা ধারায় একে মুক্ত করে দিয়েছেন মানিক।'[২] এ পর্যায়ে মানিক এ-বিশ্বাসেও স্থিত হয়েছেন যে, 'সামাজিক কারণেই মানসিক রোগ দেখা দেয়। অতএব সামাজিকভাবেই তার আরোগ্য করতে হবে। কেশবের সমস্যা সমাজের একটি ব্যাপক সমস্যারই অনুলিপি।'[৩] পরিশেষে বলা যায়, *আরোগ্য* উপন্যাসে সামাজিক ও রাজনৈতিক আরোগ্য লাভের এক নবতর বোধের উপলব্ধি ঘটিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

১. *আরোগ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

২. হামীম কামরুল হক, *সমাজের আরোগ্য ব্যক্তির সুস্থতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২

৩. সরোজ মোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২

হরফ

হরফ (১৯৫৪)[১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর আড়াই বছর পূর্বের রচনা। এ উপন্যাসে পত্রিকা ও প্রেস ব্যবসায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতিশীল আন্দোলনের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, মানিক নিজেও প্রেসের সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত ছিলেন। সম্ভবত এ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি *হরফ* উপন্যাস রচনায় উৎসাহী হন।

হরফ উপন্যাসে একটি প্রেসের অবহেলিত ও দরিদ্র কম্পোজিটর কালাচাঁদের দৈনন্দিন জীবনাচার ও অসামান্য প্রাণশক্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রেসটির মালিক ধনদাস। এ প্রতিষ্ঠানে চাকরিকালে কালাচাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রগতিশীল লেখক মানব, কবি খালেক, জহর ও প্রখ্যাত লেখক উমাকান্তের। এসময় অর্থাভাবে উমাকান্ত তার স্ত্রী পুতুলের চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে ব্যর্থ হয়। ধনদাস উমাকান্তের অসহায়ত্বের সুযোগে মাত্র দেড়শ টাকায় তার উপন্যাসের স্বত্ব কিনে নেয়। কিন্তু অর্থপ্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় উমাকান্ত স্ত্রীকে বাঁচাতে পারে না। এতে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে সে এই প্রেসেই চাকরি নেয় এবং ধনদাসের 'রসসাহিত্য' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তবে উমাকান্ত শেষপর্যন্ত ধনদাসের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের উপলব্ধি থেকে লেখকদের সম্পর্কে 'কেন লিখি' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> লেখকের অভিমান হওয়া আমার কাছে হাস্যকর ঠেকে। পাওয়ার জন্য অন্যে যত না ব্যাকুল, পাইয়ে দেওয়ার জন্য লেখকের ব্যাকুলতা তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। পাইয়ে দিতে পারলে পাঠকের চেয়ে লেখকের সার্থকতাই বেশি। লেখক নিছক কলমপেষা মজুর। কলমপেষা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।
>
> কলমপেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসার আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনও মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধকরি বলে আফশোস জাগে যে খাঁটি লেখক কবে হব।[২]

উপন্যাসের একপর্যায়ে কম্পোজিটর কালাচাঁদের মধ্যে সাহিত্য রচনার আগ্রহ জন্মে এবং সে হয়ে ওঠে একজন প্রতিবাদী লেখক। রসসাহিত্য পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হরফ নামের একটি পত্রিকা প্রকাশিত হলে

---

১. *হরফ* উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালের ১৭ মে। এটি প্রকাশ করে কলকাতার সাহিত্য জগৎ। গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক থেকে এটি মানিকের ঊনত্রিশতম উপন্যাস।

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কেন লিখি', সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভময় মণ্ডল (সম্পা.), *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০১৮, পৃ. ১১৯

সেখানে কালাচাঁদের লেখা স্থান পায়। তার এসব লেখায় উন্মোচিত হয় ধনদাসের মুখোশ। উপন্যাসে রসসাহিত্য পত্রিকার পরিবেশ এবং কালাচাঁদ প্রসঙ্গ মানিক বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> প্রেসের মালিক ধনদাস বসে, কোণের দিকে কাঠের ঘেরা কুঠুরিটাতে, প্রেসের খোলা হলের মধ্যে একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার নিয়ে মহেশের দপ্তর। এইখানে বসে সে *রসসাহিত্য* পত্রিকার সম্পাদনাও করে। প্রেসের কাজ দেখাশোনাও করে। লেখকদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, কম্পোজিটরদের সঙ্গে কাজের কথা, আর ছাপার কাজ করিয়ে যারা পয়সা দেবে তাদের বাতাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন চালানো,– সব সে একসাথে চালিয়ে যায়। কোনোকাজেই এতটুকু রোমাঞ্চ নেই। মানব ও খালেক মহেশের জন্য অপেক্ষা করছিল, শুকনো মুখে উমাকান্ত এসে চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে পড়ে। একটি কথা বলে না। যেন চেনেই না মানব ও খালেককে! তারাও চুপ করে থাকে। কে জানে কোন জ্বালায় জ্বলছে উমাকান্তের প্রাণটা! পদে পদে উমাকান্তের প্রাণের জ্বালা টের পাওয়া যায়।[১]

হরফের লেখাগুলো পড়ে ধনদাস বুঝতে পারে, ছদ্মনামে মূলত কালাচাঁদই তার চরিত্র হননের কৌশল অবলম্বন করেছে। এ পরিস্থিতিতে ধনদাসের মনের অবস্থা লেখক প্রকাশ করেছেন এভাবে –

> ধনদাসের বুকটা আবার ধড়াস করে ওঠে। প্রথম সংখ্যা হরফ কাগজে কালাচাঁদের প্রথম লেখা হরফ পড়ে যেমন ধড়াস করে উঠেছিল।
>
> এবার আরো স্পষ্ট – আরো সাংঘাতিক আক্রমণ।
>
> দুর্গানাথ অর্থাৎ উমাকান্তের স্ত্রী খেলনা অর্থাৎ পুতুলের কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য অতিকষ্টে সংগ্রহ করা টাকা ধনেশ অর্থাৎ সে চুরি করে বন্ধুর স্ত্রীকে খুন করেছে।
>
> কারো কি বাকি থাকবে কোন ব্যাপার নিয়ে এ গল্প লেখা হয়েছে?
>
> কে এই গল্পের লেখক? স্বয়ং উমাকান্ত কি? কাউকে ফরমাশ করে টাকা দিয়ে ওটা লিখিয়ে নেওয়া হয়ে থাকলে লেখককে নিয়ে ধনদাস মাথা ঘামাবে না। কিন্তু উমাকান্ত নিজেই যদি ওটা ছদ্মনামে লিখে থাকে, তার মাসিকের মুদ্রাকর হবার সম্মান পেয়েও তাকে এভাবে আঘাত করে যে লেখা ছাপতে পারে, তাকে শুধু তাড়াবে না – ঘা মেরে ওকে সে কাঁদিয়ে ছাড়বে – চুরমার করে দেবে! ভালো করে বুঝিয়ে দেবে যে পিঁপড়ার পাখা গজালে কি হয়।[২]

---

১. *হরফ*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসসমগ্র পঞ্চম খণ্ড*, সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩৯

২. *হরফ*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫১৩

ধনদাসের *রসসাহিত্যের* সঙ্গে বামপন্থী পত্রিকা *হরফের* লড়াই উপন্যাসে বেশ আকর্ষণীয়। কালাচাঁদের লেখা সর্বমহলে প্রশংসিত হলেও ধনদাস হয়ে ওঠেন প্রতিশোধপরায়ণ, এবং কালাচাঁদের ওপর নেমে আসে দুর্যোগ।

প্রেসের মালিক 'ধনদাস এখানে শোষক-শ্রেণির প্রতিনিধি যার নিষ্ঠুর স্বার্থপরতায় লেখকদের জীবন দুর্দশাময়। এদের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য-জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এ উপন্যাসের আখ্যান। বিশেষত এ উপন্যাসে উদ্ঘাটিত হয়েছে প্রকাশক ও পত্রিকা-মালিকদের দ্বারা লেখকদের নির্মমভাবে শোষণের এক ভয়াবহ চিত্র।[১]

মানব এ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তিনি একজন প্রথিতযশা লেখক। তিনি ভাবেন – শোষিত বঞ্চিত মানুষের জীবনযন্ত্রণার মধ্যেই প্রকৃত সাহিত্য নিহিত। তিনি নিজেও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। স্পষ্টত 'মানিকের ব্যক্তিগত জীবন এখানে প্রতিফলিত। মানিক এ পর্বে বস্তিবাসী না হলেও লেখক-জীবনের শুরুতে মেসে থেকে অনাহার-অর্ধাহারের মধ্যে সাহিত্য চর্চা করেছেন।...এ-কালপর্বে তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও বাবাকে নিয়ে সংকীর্ণ পরিসরের ভাড়া বাড়িতে বসবাস করলেও দারিদ্র্যের যন্ত্রণাকে প্রতিনিয়ত সহ্য করে চলেছেন।'[২] লেখক এ উপন্যাসে মানব ও কালাচাঁদের মেয়ে আত্তির প্রেমের সম্পর্কও নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানব শেষপর্যন্ত আত্তিকে জীবনসঙ্গিনী করে নিয়েছেন। মানব চরিত্র সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেন :

> এই উপন্যাসের উজ্জ্বল দিক হল, নিম্নবর্গীয় জীবনের সঙ্গে লেখকদের একাত্মতা। মানব-চরিত্রটি এর উত্তম দৃষ্টান্ত। সে তার উচ্চবর্গীয় জীবন পরিবেশকে এ জন্য প্রত্যাখান করে আশ্রয় নেয় বস্তিজীবনে। নিম্নবর্গের শোষিতবঞ্চিত মানুষের জীবনসত্যকে উপলব্ধি করে তাকে সাহিত্যে রূপদানের লক্ষ্যে সে ওই জীবনের সুগভীর স্পন্দনকে নিজজীবনে অঙ্গীকার করতে চায়, ওই জীবনের সঙ্গে লগ্ন হতে চায়। নিজ শ্রেণিবৈশিষ্ট্যকে এ কারণে সে জলাঞ্জলি দেয় এবং নিজের অনিবার্য অনাহারী জীবনের উপলব্ধি দিয়ে ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে রূপায়িত করতে চায়। ওই জীবনকে সে যথার্থভাবে সাহিত্যে চিত্রিত করতে পারছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য সে বস্তিবাসী অশিক্ষিত মানুষের কাছে তার রচিত সাহিত্য পাঠ করে তাদের মতামত গ্রহণ করে।[৩]

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড*, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. পঁচিশ

২. সৈয়দ আজিজুল হক, কথাশিল্পী মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

৩. সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.) *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড*, ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ছাব্বিশ

হরফ উপন্যাসে মানিক কালাচাঁদের মাধ্যমে জীবন ও শিল্পের একটি বাস্তব রূপ চিত্রিত করেছেন। যথার্থ অনুভূতিশীল সত্তা ছাড়া প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টি যে অসম্ভব তা কালাচাঁদের মাধ্যমে প্রমাণিত। ধনদাসের প্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা সূত্রে সে লেখক-জীবনের প্রকৃত যন্ত্রণা অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। প্রেসের মালিক কিংবা প্রকাশকরা দিনের পর দিন লেখকদের সঙ্গে কীভাবে প্রতারণা করে তাও সে অবলোকন ও উপলবিব্ধ করেছে। সে অভিজ্ঞতার যথার্থ বয়ানই লিপিবদ্ধ হয়েছে হরফ পত্রিকায়; এবং সেজন্যই এটি হয়ে উঠেছে জনপ্রিয় পত্রিকা।

হলুদ নদী সবুজ বন

হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)[১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দর্শন-প্রভাবিত উপন্যাস। জনৈক সমালোচক উপন্যাসটিকে মানিকের 'সায়াহ্নকালের দ্যুতি'[২] হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এটিতে শ্রেণি-বিভাজিত সমাজের শোষণ ও সংঘাতের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। হলুদ নদী আর সবুজ বনকে ঘিরে গড়ে ওঠা কল-কারখানা আর শহরকে কেন্দ্র করে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের চিত্র শিল্পরূপ লাভ করেছে। মানিকের এ পর্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে এ উপন্যাসটি স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। মার্কসবাদের দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি যে রাজনৈতিক শ্লোগানসর্বস্ব উপন্যাস লেখেননি – *হলুদ নদী সবুজ বন* তার স্বাক্ষর বহন করে।

হলুদ নদীর দুপাশে পুরোনো ও আদিম অরণ্য। নদীর এপারের তিন মাইল দূরে পাশাপাশি গ্রামগুলিতে গড়ে উঠেছে কয়েকটি কারখানা। কারখানাকে উপলক্ষ করে গড়ে-ওঠা ছোট শহরটিকে ঘিরে আছে নদী আর বনের পরিবেশে এলোমেলো এ গ্রামগুলি। এখানে হাটের বদলে বসে বাজার; আছে কয়েকটি মনিহারি মুদিখানার দোকানও। সেখানেই নির্মিত হয়েছে একতলা একটি পাকা ক্লাব, যেখানে প্রেট্রোম্যাক্সের আলোয় ম্লান করে দেয় ডিবরি আর ধোঁয়াপড়া লণ্ঠনের মিটিমিটি আলো। এখানকার কিছু সাহেব আর গণ্যমান্য ধনী ও উচ্চপদস্থ বাবুদের প্রতিষ্ঠিত ক্লাবজীবনের নানা কাহিনি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এ-উপন্যাস। উপন্যাসে আছে কারখানার মালিক ও ম্যানেজারের কার্যকলাপ। লেখক সেখানকার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

---

১. *হলুদ নদী সবুজ বন* প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১৩৬২)। উপন্যাসটির প্রকাশক নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা। গ্রন্থাকারে প্রকাশের দিক থেকে এটি মানিকের বত্রিশতম উপন্যাস।

২. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

বন ও নদীর এই আদিম বুনো অঞ্চলে দু-একটা শহর গড়ে উঠে থাক, স্বার্থান্বেষীদের প্রাণপণ চেষ্টায় এখানে ওখানে দু-একটা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে গিয়ে থাক – এ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান বহুদিন থেকে পীর আর দেবদেবীকে মিলিয়ে মিশিয়ে ধর্মকর্ম করে আসছে।

তার মানে আবার এও নয় যে, মুসলমান হিন্দুর মন্দিরে পূজা দিতে যায়, হিন্দু মুসলমানের মসজিদে নামাজ পড়তে যায়।

নদী বন তাদের জীবন শত শত বছর ধরে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে, তাদের কি উপায় আছে পৃথক হয়ে যাবার – কোনো কিছুর নামে?[১]

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ঈশ্বর একজন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। সে জমিজমাহীন চাষির ছেলে, সুযোগ পেলে কারখানায় দিনমজুর খাটে। আবার কখনও ধনীদের বাড়িতে পাহারাদারের কাজ করে। তবে সে 'নাম করা মস্ত শিকারিও বটে। তাই সুযোগ পেলে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটি বন্দুক নিয়ে ইংরেজ সাহেব ও দেশীয় কারখানা মালিকদের সঙ্গে শিকার করতে যায়। বাঘ শিকারে তার লক্ষ্য দ্ব্যর্থহীন।

হলুদ নদী আর সবুজ বনবেষ্টিত এই পরিবেশ ভয়ার্তসঙ্কুল। এখানেকার বনে বাঘের বিচরণ, নদীতে কুমিরের বসবাস। এই পরিবেশে গ্রামের লক্ষ্মণের গোরু মেরে পালিয়ে যাওয়া বাঘটি আবার ফিরে আসে। এসময় স্থানীয় জমিদার ও শিল্পমালিক প্রভাস, শ্বেতাঙ্গ পুঁজিপতি বরার্টসন ও ঈশ্বর – তিন জন মিলে বাঘটিকে গুলি করে। বাঘ মারার কৃতিত্বের দাবি নিয়ে প্রভাস এবং রবার্টসনের মধ্যে বিতর্কের পর গুলির ধরন পরীক্ষা করে জানা যায় বাঘটি আসলে ঈশ্বরের গুলিতে মরেছিল। তবে দুজনই টাকার বিনিময়ে গোপনে ঈশ্বরের কাছ থেকে লিখিতভাবে বাঘ শিকারের স্বীকৃতি আদায় করে বোকা বনে যায়। ঈশ্বর উভয়ের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে স্রেফ স্ত্রী গৌরীর চিকিৎসার খরচ মেটানোর জন্য। অথচ, তারা প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে ঈশ্বরের উপর গোপন নির্যাতন চালানোর সকল পরিকল্পনা করে বসে। ঈশ্বর চাকুরিচ্যুত হয় এবং গুরুতরভাবে প্রহৃত হয়। তবে, 'সীমাহীন শত্রুতার পরও প্রভাসকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় ঈশ্বর। লোকদেখানো বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, একান্তই অন্তরের মানবিকবোধের তাগিদে ঈশ্বর নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রভাসকে উদ্ধার করে। ঈশ্বরের এ মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে প্রভাস তাকে চাকরিতে বহাল করে। কিন্তু দ্বিতীয় বাঘ

১. *হলুদ নদী সবুজ বন*, সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাস সমগ্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

শিকারের ঘটনায় মিথ্যা কৃতিত্ব জাহিরের লোভে সে বিস্মৃত হয় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা।'[১] আবারও প্রভাস ও রবার্টসনের বিরোধ বাঁধে লঞ্চ ধার করার ঘটনা নিয়ে। সরগরম হয়ে ওঠে ক্লাব ঘর :

> লঞ্চ নিয়ে আবার নাকি প্রভাস আর রবার্টসনের মধ্যে ফাটাফাটি হয়ে গিয়েছে। কার গুলিতে বাঘ মরেছে সেই ধরনের বিবাদ নয়। একেবারে নাকি ফাটাফাটি ব্যাপার। কথা কাটাকাটি থেকে নেশার ঝোঁকে ঘুসোঘুসি পর্যন্ত গড়িয়ে থমকে থেমে থেকে, বাঘটা যে আসলে ঈশ্বরের গুলিতে মরেছিল এই সত্যটা টাকা দিয়ে কিনে মনের সাধে বিকৃত করতে গিয়ে বিশ্রী রকম জব্দ হয়ে আবার দুজনের ভাব হওয়ার মতো ব্যাপার নয়। আসল স্বার্থঘটিত মারাত্মক ব্যাপার।[২]

এদিকে শ্রমিকদের মধ্যে ঘনিয়ে আসা অসন্তোষের কথা টের পেয়ে জনসনদের সহায়তায় আবার তারা মিলিত হয়। কিন্তু প্রহৃত হয় ঈশ্বর, তার ঘরে আগুন লাগে। সবাই মিলে চাঁদা তুলে ঈশ্বরের ঘর বানিয়ে দেয়। এদিকে ঈশ্বরের চাকরি যাবার পর কারখানার অন্য শ্রমিকরা প্রতিবাদ জানাতে চাইলে ঈশ্বর তাদের বাধা দেয়।

ঈশ্বর এ সকল শ্রমিকদের নেতা। তার নেতৃত্বেই শ্রেণিআন্দোলন গড়ে ওঠে। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই। তার দায়িত্ব বেড়ে যায়। কিন্তু সে চিন্তিত হয় এই ভেবে যে, একটি বড় হাঙ্গামার জন্য যখন কারখানার সকলে প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন ছোটোখাটো হাঙ্গামা প্রতিদিনই হবে। তাকে একটি বন্দুক দিয়ে এ হাঙ্গামা দমনের দায় চাপিয়ে দিলে সেটা সুখকর হবে না। তাই তাকে প্রথম থেকেই চিন্তিত হতে দেখা যায়। প্রথম দিন কাজে যোগদান করে ঈশ্বর চাকরির মেয়াদ নিয়েই ভাবে। পিছিয়ে গেলেও সামনে বড়ো ধর্মঘট হতে পারে সেটা তারা ধারণা করে। সকলের মধ্যেই অসন্তোষ বিরাজ করে। অধিকাংশ শ্রমিকের সমর্থন আছে দাবি-দাওয়া আদায় ও অন্যায় অবিচারের জন্য লড়াই করার পক্ষেও। কিন্তু তারপরও লড়াই জমে না। মানিক বলেন :

> বড় ধর্মঘট কিন্তু ঘটবে ঘটবে করেও পিছিয়ে পিছিয়ে যায়। অসন্তোষ ধোঁয়াচ্ছে প্রায় সকলের প্রাণেই। দাবিদাওয়া আদায় আর অন্যায় অবিচারের প্রতিকারের জন্যে লড়াই করার পক্ষে সমর্থনও আছে অধিকাংশ শ্রমিকের কিন্তু কাজের বেলা একটা অঙ্ক কিছুতেই জোটে আনা যাচ্ছে না।

---

১. সৈয়দ আজিজুল হক, *কথাশিল্পী মানিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

২. *হলুদ নদী সবুজ বন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

সেটা আশ্চর্য কিছুই নয়। কারখানার মেশিন অয়েলের গন্ধ ঘিরে থেকেই মজুরদের বড় একটা অংশের নাক থেকে সোঁদা মাটির গন্ধ নিয়ে ঢেকে দিতে পারে না।

ছুটকো হাঙ্গামা লেগেই থাকে – অসন্তোষের বারুদের স্তূপে আর প্রত্যেকটির অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করার কথা। কিন্তু ভিজে বারুদের মতো বনের ছায়া মাটির মায়ায় নরম স্যাঁতস্যাঁতে প্রাণে তা ঘটে না![১]

একপর্যায়ে জ্বরে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ঈশ্বরকে বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য লখার মা-সহ অনেকেই মুহূর্তের মধ্যে হাজির হয় ঈশ্বরের পাশে। ঈশ্বরকে তারা সুস্থ করে তুলতে চায়। 'বনের মধ্যে তাকে নিয়ে অনেকের টানাটানি, হলুদ নদীর খেয়াঘাটে তার খাটুনি, তার চেনা লোকের এটা ওটা দায় চাপানো – সব গড়িয়ে গেলে ঈশ্বরের হয়েছিল বিষম জ্বর। শালীর বিয়েতে নিজের যাওয়ার সাধ্য ছিল না। গৌরীকেও সে যেতে দিতে চায়নি। জ্বরের ঘোরে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করেছিল – শুধু গৌরীকে নয়, তার যে ভাই তাকে নিতে এসেছিল তাকেও।'[২]

অথচ ঈশ্বরের জ্ঞান ফিরবে কিনা বা তাকে বাঁচানোর জন্য আগতরা নিজেরা নিরাপদ কিনা, তারা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে পারবে কিনা– সে বিষয়ে লেখকের তেমন কোনো আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয় না। মানিক-মানসে শুধু একটি জিনিসই এখানে কাজ করেছে আর সেটা হলো – ঈশ্বরের জন্য এতগুলো তাজা প্রাণ নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে প্রতিরোধের একটি বিন্দুতে সমবেত হয়েছে, হাল ছাড়ছে না – এটাই যেন প্রধান্য লাভ করেছে। আর এ কাজে অগ্রভাবে দায়িত্ব পালন করে লখার মা :

হেলে-পড়া চাল দেখে লখার মা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কোন নৌকায় যাবি লো গৌরী?'

'কোথা নিয়ে যাবে?'

'যেখানে উঁচু জমি আছে, যেখানে ঘর-বাড়ি খাড়া আছে।'

'খাড়া কি উঁচু আছে ঘরবাড়ি জমি জায়গা? মানুষটার ইদিকে যায় যায় অবস্থা।'

লখার মা এসে গলা চড়িয়ে বলে, 'বড্ড তুই নরম মানুষ, নইলে এই দশা হয়? চালটা পড়ে গিয়েছে, উপায় কি? পায়ের নিচের মাটি তো সরে যায় নি। আয় সবাই মিলে ধরাধরি করে মানুষটাকে নৌকায় নামিয়ে আনি। মানুষের আশ্রয় মিলবেই, বন্যা হোক আর ভূমিকম্প হোক।[৩]

---

১. *হলুদ নদী সবুজ বন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

২. *হলুদ নদী সবুজ বন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

৩. *হলুদ নদী সবুজ বন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

উপন্যাসে মানিক উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি আধা গ্রাম আধা শহরে শ্রেণিআন্দোলনের মতো একটি প্লাটফরম দাঁড় করানো হয়তো সম্ভব নয়। একজন প্রগতিশীল চিন্তাধারার সর্বাধুনিক শিল্পী হিসেবে তিনি এ উপন্যাসে এক নবতর আবহ সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব আসলে ঈশ্বরসহ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ আর পুঁজিপতি প্রভাস-রবার্টসনদের মধ্যে। 'এই অঞ্চলের মালিক শ্রমিক বা এলিট নেটিভদের মাঝখানের এরকম একটি সম্পর্কের বাইরে আরও একটি সম্পর্ক আছে, আছে একটি সমাজ ব্যবস্থাও। যে সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি আর আবহাওয়ার দ্বারা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বাস্তবতাকে বুঝেছিলেন। যতদূর সম্ভব শ্রেণীবিপ্লব নিয়ে যারা সরাসরি কাজ করেছেন, মার্কসীয় দর্শনের রাজনৈতিক রূপটি যারা রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেখতে চেয়েছিলেন, তারা এই গূঢ় কথাটি বুঝতে পারেননি। ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় যে সম্ভাবনা ছিল তা বাস্তব রূপ পায়নি একারণেই।'[১]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এ-উপন্যাসে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এভাবে :

> একবার লিখছি ঈশ্বর, গৌরী, আজিজ, শান সায়েব, ফুলজান, মন্টা, সাধুদের কাহিনী আবার আসছি প্রভাস, বনানী, ইভা, রবার্টসনের কথায়।
>
> ঈশ্বরের কাঁচা ঘর, লক্ষ্মণের খেয়াঘাট, উড়িয়া মালী আর অহল্যায় মিলেমিশে প্রভাসের বাগানটিকে এমন করার প্রাণপণ সাধনা যে কোনো সায়েবের বাগান তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না, ক্লাবে সন্ধ্যার দিকে নাচ, গান, হাসি-আনন্দ, তাস, বিলিয়ার্ড খেলা – বেশি রাত্রে হৈ-হুল্লোড়।
>
> একেই বলে প্যারালাল মানে সমান্তরাল কাহিনী? বুদ্ধি খাটিয়ে, চালাকি করে উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন অর্থাৎ চাষী মজুরদের হাজির করে ছককাটা গল্প রচনা করা?
>
> সাহিত্যচর্চা করে আমার কাণ্ডজ্ঞান তাহলে নিশ্চয় লোপ পেয়েছে বলতে হবে।
>
> শ্রেণীবিভক্ত জীবন কোনো দেশে কস্মিনকালে প্যারালাল বা সমান্তরাল ছিল না, এখনো নেই, সোনার পাথরের বাটির মতোই সেটা অসম্ভব ব্যাপার।
>
> কথ্টা ভুল বোঝা সম্ভব – আরো স্পষ্ট করার চেষ্টা করি। আমি বলছি জীবনের কথা – শ্রেণিতে শ্রেণিতে ভাগ হয়ে হয়েও একত্র সংগঠিত সমগ্র সমাজের কথা। সমান্তরাল কাহিনী খুবই সম্ভব, একটু কায়দা করে বানিয়ে লিখলেই হল – কিন্তু সম্পর্কহীন সমান্তরাল জীবন?

---

১. অনন্ত মাহফুজ, *হলুদ নদী সবুজ বন : শ্রেণী বিভাজন, শ্রেণী শত্রু বনাম শ্রেণী আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*, সৈয়দ মোহাম্মাদ শাহেদ সম্পাদিত, *উত্তরাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

ঈশ্বর আজিজরা থাকে এক স্তরে, প্রভাস রবার্টসনরা আরেক স্তরে। তাই বলে জীবন কি তাদের সম্পর্কহীন? পরস্পকে বাদ দিয়ে তাদের কারো জীবনযাত্রা সম্ভব?
সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়? '[১]

উপন্যাসে সুন্দরবন ঘেঁষা সোনাতলা গ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থার যে বর্ণনা করা হয়েছে তা ভারতীয় উপমহাদেশের হাজার বছরের পুরনো সমাজের প্রতিচ্ছবি। অন্য আর দশটা গ্রাম থেকে এ গ্রাম আলাদা নয়। এই যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা তার থেকে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রভাসের আদি ইতিহাস ইরানি হলেও সে এখন ভারতীয়। তার স্ত্রী বনানী খাঁটি বাঙালি। রবার্টসন সুদূরের দেশ থেকে এসে বনের ধার ঘেঁষে কারখানা চালায়। সে বিয়ে করেছে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ানকে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে *হলুদ নদী সবুজ বন* উপন্যাসের চরিত্রসমূহ সমান্তরাল হলেও এদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য বিস্তর। কারখানায় হাঙ্গামা হলে জোয়ান মজুরের একটি হাত জখম হয়। ক্ষেতের ফসল নিয়ে গোলমালকে কেন্দ্র করে জোয়ান চাষি ছেলেটির পা খোঁড়া হয়। মূলত, উপন্যাসে সমাজের ধনী ও দরিদ্রশ্রেণির মধ্যে যে ব্যবধান তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

মানিক প্রথম থেকেই মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতার প্রতি বিরূপ থেকে চাষি-মজুরের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। উপন্যাসে একদিকে সুন্দরবনের নদী ও জঙ্গলময় পটভূমিতে কৃষকের দারিদ্র্য, বিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রা; অন্যদিকে সায়েব-সুবোদের বিনোদনের খোরাক – বাঘশিকার স্থান পেয়েছে। আপাত সমান্তরাল এই জীবনযাত্রার অঙ্কনের মাধ্যমে মানিক শ্রেণিবিরোধ ও সংঘাতকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তবে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে–

কল্লোলীয় লেখকদের সঙ্গে মানিকের পার্থক্য শুধু শ্রেণিচেতনা ও মধ্যবিত্তসুলভ রোমান্টিকতার প্রতি ঘৃণা নয়, বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণার গভীরতা থেকে; কারণ মানিক হয়তো বুঝেছিলেন, সমাজবাদী রাষ্ট্র ও সাধারণ জনতার ভবিষ্যৎ জীবন অনুভূতি ফ্রয়েডীয় চিন্তা থেকে উত্তরণ ঘটবেই, এমনকি 'ঘামের ফোঁটার গন্ধ'-ও তাকে ধরে রাখতে পারবে না। কারণ মানিকের সাহিত্য শিল্পকে আশ্রয় করেছে; সে ক্ষেত্রে 'কমিটেড' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী মানিকের চেয়ে বড় নয়।[২]

---

১. *হলুদ নদী সবুজ বন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭-২৭৮

২. শামসুল আলম সাঈদ, *মূল্যবোধ ও বাংলা উপন্যাস*, গ্লোব লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ২৪৯

মানিক জানতেন, সমাজের অধিকাংশ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার মূলে রয়েছে স্বল্পসংখক ধনিকশ্রেণি বা তাদের প্রতিনিধিদের শোষণ, পীড়ন বা অবিচার। তাদের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগে সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুশাসনের আবরণে চলে জমিদার-জোতদার, মহাজনশ্রেণি ও রাষ্ট্রীয়যন্ত্রের শোষণ, নির্যাতন-নিপীড়ন ও অত্যাচার। আর এ ক্ষেত্রে অনেক সময় তারা সহায়-সম্বল হারিয়ে আশ্রয় নেয় শহর বা শহরতলিতে। এ উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র প্রাধান্য পেলেও জীবনার্থসন্ধানেরর সংকেত রয়েছে খেটে খাওয়া মানুষদের ক্রিয়াকলাপেই।

বিশ থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অতি আধুনিকের ধারায় *চিন্তামণি*, *দর্পণ*, *চিহ্ন*, *স্বাধীনতার স্বাদ* এবং *হলুদ নদী সবুজ বন*সহ অন্যান্য উপন্যাস লিখে যে আনুপূর্বিকতা দেখিয়েছেন, তার তুলনা নেই। উপন্যাসের সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি নিয়ে তিনি শিল্পরূপের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। তাঁর এ অভিনবত্ব বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসসমূহে সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এ কারণেই তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসসমূহ যেমন হয়ে উঠেছে সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশ্বস্ত দলিল।

উপসংহার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অসঙ্গতি ও অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে ভেঙে পড়ে উনিশ শতকীয় বাঙালির জীবনপ্যাটার্ন। এ ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই সংঘটিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে গ্রাম ও শহরের মানুষের চিরায়ত বিশ্বাসে ফাটল ধরে। তারা জড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন অনৈতিক ক্রিয়াকলাপে; ফলে সৃষ্টি হয় মূল্যবোধের অবক্ষয়। বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ আন্দোলন, আগস্ট আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা এ-সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সকল ঘটনার বৃহত্তর অংশই প্রত্যক্ষ করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসেও।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিসচেতন শিল্পী। তাঁর উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন, উপকরণ সংগ্রহ ও প্রকাশভঙ্গিতে ঈর্ষণীয় দক্ষতা পরিদৃষ্ট হয়। সমকালীন সমাজের অভাব, দারিদ্র্য, শোষণ, নির্যাতন, দুর্ভিক্ষসহ নানা চিত্র তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মানিকের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস *জননী* ও *দিবারাত্রির কাব্যে* গ্রামীণ জীবন ছিল অনেকটাই উপেক্ষিত। সেদিক দিয়ে *পুতুলনাচের ইতিকাথা* ও *পদ্মনদীর মাঝি* পুরোপুরি গ্রামনির্ভর। পরবর্তীকালের উপন্যাসে তিনি শহর বা শহরতলির জীবনালেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে গ্রামীণ জীবননির্ভর কাহিনি রচনায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

মানিকের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নায়করা অন্তর্দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত। তাঁর *জননী*, *দিবারাত্রির কাব্য*, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, *পদ্মানদীর মাঝি* প্রভৃতি উপন্যাসে ব্যক্তির নিয়তিই শেষপর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে। *পুতুলনাচের ইতিকথার* শশী চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত জীবনের চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব প্রকটিত হয়েছে। *জীবনের জটিলতা* ও *অমৃতস্য পুত্রাঃ* উপন্যাসে লেখক সমকালীন কলকাতার আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা অন্বেষণ করেছেন। *অহিংসায়* অঙ্কিত হয়েছে সমাজ পরিসরের নানা ভাঙনের চিত্র। *চতুষ্কোণে* মানিক মনোব্যাধি নিয়ে স্থিত হয়েছেন জীবনের নতুন জিজ্ঞাসায়। *ধরাবাঁধা জীবনে* প্রতিফলিত হয়েছে মধ্যবিত্তের জীবনবাস্তবতা। *শহরবাসের ইতিকথা* শ্রমজীবী মানুষের সামষ্টিক জীবনচেতনার প্রতিচ্ছবি। *শুভাশুভতে* ফুটে উঠেছে যুদ্ধোত্তরকালে শিল্প-বাণিজ্যের ওপর নেমে আসা বিপর্যয়ের কাহিনি। *আদায়ের ইতিহাসে* রয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ইঙ্গিত।

মানিক তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে তিনি নরনারীর যৌনজীবনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে জীবন বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। এ যুগের প্রেমও যে অর্থনীতির যাঁতাকলে আবদ্ধ, তা চিত্রিত হয়েছে *পরাধীন প্রেম* উপন্যাসে। এছাড়া *পাশাপাশি*, *নাগপাশ*, *মাশুল*, *খুনি*, *পেশা*, *প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান*, *মাটিঘেঁষা মানুষ*, *শান্তিলতা* প্রভৃতি উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কের জটিলতার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক টানাপড়েনকে দায়ী করা হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার অব্যবহিত পরে শ্রমজীবীদের নিয়ে কালজয়ী কিছু উপন্যাস রচনা করেন। এ-পর্বে রচিত *শহরতলি* উপন্যাসে তিনি মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষের বিবরণ শিল্পসফলভাবে উপস্থাপন করেছেন। *প্রতিবিম্ব* উপন্যাসে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনকে একীভূত করা হয়েছে। *দর্পণে* সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার স্বরূপ চিত্রায়িত হয়েছে। *চিন্তামণি* ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সমাজের বাস্তবতার নিরিখে রচিত। *চিহ্ন* উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত হয়েছে ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সদস্যের বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং ১৯৪৬ সালের নৌ ধর্মঘটের সমর্থনে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে। *জীয়ন্ত* উপন্যাসটি নতুন সমাজসৃষ্টির দীক্ষা লাভে আগ্রহীদের নিয়ে রচিত। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিরোধ-সংগ্রাম নিয়ে রচিত হয়েছে *স্বাধীনতার স্বাদ* । *সার্বজনীন* উপন্যাসটি দাঙ্গা ও দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে রচিত। *সোনার চেয়ে দামী*তে অঙ্কিত হয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা জর্জরিত সমাজের বাস্তব চিত্র । *ইতিকথার পরের কথায়* লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, নতুন সমাজসৃষ্টির জন্য বিজ্ঞানমনস্ক হতে হয়। উপন্যাসে জমিদারতন্ত্রের শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। *আরোগ্য* শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মানিকের মমত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ। *হরফে* পত্রিকা ও প্রেস ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে লেখকদের ওপর প্রকাশকদের শোষণ এবং প্রগতিশীল আন্দোলন প্রকৃত চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

মানিক বন্দোপাধ্যায় সমকালীন সমাজ ও জীবনের বৈচিত্র্যময় জিজ্ঞাসার রূপায়ণে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছেন। শিল্পপ্রকরণেও তিনি বহুমাত্রিক জীবনজিজ্ঞাসার অনুধ্যান ও অনুশীলনের স্বাক্ষর রেখেছেন। ফলে, বিষয় ও প্রকরণগত দিক বিবেচনায় তাঁর উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলা উপন্যাসের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে যেমন নবতর ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, তেমনি তা হয়ে উঠেছে সমাজপ্রকরণের বিশ্বস্ত দলিল। বাংলা উপন্যাসে তাঁর অবস্থান স্বতন্ত্র ও সুদূরসঞ্চারী।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আলোচিত উপন্যাসসমূহ

(প্রকাশকালের ক্রমানুসারে)

মূলগ্রন্থ

জননী (১৯৩৫)

দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫)

পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬)

পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)

জীবনের জটিলতা (১৯৩৬)

অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮)

শহরতলি (প্রথম খণ্ড-১৯৪০)

শহরতলি (দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৪১)

অহিংসা (১৯৪১)

ধরাবাঁধা জীবন (১৯৪১)

চতুষ্কোণ (১৯৪২)

প্রতিবিম্ব (১৯৪৩)

দর্পণ (১৯৪৫)

খুনি (১৯৪৩-৪৫)

শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬)

চিন্তামণি (১৯৪৬)

চিহ্ন (১৯৪৭)

আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭)

জীয়ন্ত (১৯৫০)

পেশা (১৯৫১)

ছন্দপতন (১৯৫১)

স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১)

সোনার চেয়ে দামি (প্রথম খণ্ড-১৯৫১)

Dhaka University Institutional Repository

সোনার চেয়ে দামি (দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৫২)

ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২)

সার্বজনীন (১৯৫২)

পাশাপাশি (১৯৫২)

নাগপাশ (১৯৫৩)

আরোগ্য (১৯৫৩)

চালচলন (১৯৫৩)

তেইশ বছর আগে পরে (১৯৫৩)

হরফ (১৯৫৪)

শুভাশুভ (১৯৫৪)

পরাধীন প্রেম (১৯৫৫)

হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)

মাশুল (১৯৫৬)

প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান (১৯৫৬)

মাটি-ঘেঁষা মানুষ (১৯৫৭)

শান্তিলতা (১৯৬০)

রচনাবলি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শ্রেষ্ঠ উপন্যাস : হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উত্তরকালের ছয় উপন্যাস : সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুময় পাল সম্পাদিত, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : মার্চ ২০১৮

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র (প্রথম খণ্ড) : সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) : সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড) : সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র (চতুর্থ খণ্ড) : সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র (পঞ্চম খণ্ড) : সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : উপন্যাসসমগ্র (ষষ্ঠ খণ্ড) : সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

সহায়ক গ্রন্থ

(বর্ণক্রম অনুসারে)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ*, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, নবম প্রকাশ : মাঘ-১৪০৯ বঙ্গাব্দ

অচ্যুত গোস্বামী : *বাংলা উপন্যাসের ধারা* (আবুল কাশেম ফজলুল হক, ভূমিকা ও সম্পাদনা), ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রকাশ কাল : ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

অমলেশ ত্রিপাঠী : *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, প্রকাশকাল : ১৯৯০

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের প্রতিমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৪

: *বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

অলোক রায় : *বাংলা উপন্যাস : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৭

অশ্রুকুমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল : ১৯৯৩

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ

আবদুল মান্নান সৈয়দ : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : অন্তর্বাস্তবতা বহির্বাস্তবতা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৩

আবু সয়ীদ আইয়ুব : *পথের শেষ কোথায়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : ১৯৯২

কামরুদ্দীন আহমদ : পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, স্টুডেন্টস্ পাবলিকেশন, ঢাকা, প্রকাশকাল: ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

ক্ষেত্রগুপ্ত : *ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

গিয়াস শামীম : *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৫

: *উপন্যাসে শিল্পস্বর*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৮

: *বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ*, অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭

: *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৯৯৮

গৌতম কুমার দাস : *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উপন্যাস : গ্রামীণ জীবন ও গ্রামীণ জনপদের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৯

দেবু গোস্বামী : *মনোময় জীবনের সন্ধানে : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ঘোষ পাবলিশিং কনসার্ন, হুগলি, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৯

দেবেশ রায় : *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯১

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৩

নারায়ণ চৌধুরী : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য মূল্যায়ন*, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৮৩

নাহিদ হক : *মানিক উপন্যাসে নারীরা*, শুদ্ধস্বর, শাহবাগ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১১

নিতাই বসু : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৯৯

ফরিদা সুলতানা : *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবনচেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৯

বিনয় ঘোষ : *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ : ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ চেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭

: *বাংলাদেশের কথাসাহিত্য পাঠ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০২

: *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল : বইমেলা ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধদেব বসু : *আমার যৌবন*, এমসি সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

বেগম আকতার কামাল : বিশ্বযুদ্ধ জীবন ও কথাশিল্প, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

ভবানী সেন : ভাঙ্গনের মুখে বাংলা, ২য় সংস্করণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৪৫

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

: *কথাশিল্পের কথামালা-শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, শুভময় মণ্ডল ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পুর্নমূদ্রণ : মার্চ ২০১৮

]মাহমুদ উল আলম : বাংলা কথাসাহিত্যে যুদ্ধ জীবন, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০০

মুহম্মদ আবদুর রহিম : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৭৬

মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী : *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৫

মুহম্মদ রেজাউল হক : *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৯

যুগান্তর চক্রবর্তী : *অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-ডায়েরি ও চিঠিপত্র*, (সম্পাদিত) পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ : মে ২০১১, কলকাতা

রণেশ দাশগুপ্ত : *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৭৬

রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭

: শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০

: কথাসাহিত্যের বিচিত্র বিষয় ও নন্দনতত্ত্ব, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

রমেশচন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, সরকার পাবলিশিং এন্ড কোং, কলকাতা, প্রকাশকাল : ২০০৬

রহমান হাবিব : *মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

শহীদ ইকবাল : বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য, অন্বেষা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০

শামসুল আলম সাঈদ : *মূল্যবোধ ও বাংলা উপন্যাস*, গ্লোব লাইব্রেরি প্রাঃ লিমিটেড, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০০০

শাহিদা আখতার : *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯২

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ পুনমুদ্রণ : ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

সজনীকান্ত দাস : *আত্মস্মৃতি*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশকাল : ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

সমরেশ মজুমদার : : *চরিত্রচিত্রণ-পুতুলনাচের ইতিকথা*, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০০৭

সরকার আবদুল মান্নান : *উপন্যাসে তমস্যাবৃত জীবন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৩

সরদার ফজলুল করিম : *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ*, *অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা : প্রকাশকাল : ১৯৯৩

: *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসে কালান্তর*, দে'জ পাবলিকেসন্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ: নভেম্বর ১৯৯৫

সরোজমোহন মিত্র : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০০৯

সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : কৈফিয়ত, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের পরিবারের পক্ষ থেকে, খুনি, সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০১৫

সুকুমার বিশ্বাস : বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা : ১৯৪৭-১৯৭১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৮

সুকুমার সেন : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ইস্টার্ন পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশকাল : ১৯৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সুতপা ভট্টাচার্য : *নারীমুক্তি আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, মেয়েলি পাঠ, পুস্তক বিপণি, কথকথা প্রথম প্রকাশ : ২০০০

সুপ্রকাশ রায় : *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, বুক ওয়ার্লড, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ : ২০০০

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় : *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, কে.পি. বাগচী এন্ড কোং, কলকাতা, প্রকাশকাল : ১৯৯১

সুমন মজুমদার : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও পুতুল নাচের ইতিকথা*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, প্রকাশকাল : ২৫ বৈশাখ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

সুমিতা চক্রবর্তী : *গাওদিয়া গ্রামের শশী ডাক্তার-উপন্যাসের বর্ণমালা*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৩

সৈয়দ আকরম হোসেন : *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৮৫

: *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১০

সৈয়দ আজিজুল হক : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৮

: *কথাশিল্পী মানিক*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

সৌরেন বিশ্বাস : *বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শতবর্ষের বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

হাসান আজিজুল হক : *বাংলা কথাশিল্পে কয়েকজন : মগ্ন অবলোকন ও সামান্য বিচার*, চারুলিপি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪১১

সহায়ক প্রবন্ধ

অনন্ত মাহফুজ : *হলুদ নদী সবুজ বন : শ্রেণী বিভাজন, শ্রেণী শত্রু বনাম শ্রেণী আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা*, সৈয়দ মোহাম্মাদ শাহেদ সম্পাদিত, *উত্তরাধিকার*, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮

অশ্রুকুমার সিকদার : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আদি উপন্যাস*, ভূঁইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১২

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাগী চোখের স্বপ্ন*, ঘনশ্যাম চৌধুরী সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়–সমগ্রতার সন্ধানে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফজল : *পুতুল নাচের ইতিকথা*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূঁইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১২

আবু হেনা মোস্তফা কামাল : *পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি*, ভূঁইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১২

কার্তিক লাহিড়ী : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস*, ভূঁইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১২

গিয়াস শামীম : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : কেতুপুরের মহাকাব্য*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবর্ষ স্মরণ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

চঞ্চল আশরাফ : চতুষ্কোণ : *পুনর্বিবেচনা*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, উত্তরাধিকার, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৮

চঞ্চল কুমার বোস : *মানিক-সাহিত্যে মাতাল চরিত্র*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

চিন্মোহন সেহানবিশ : *মানিক বন্দোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ*, *উত্তরাধিকার*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০৮, বাংলা একাডেমি

তপোবিজয় ঘোষ : *মানিক ও কল্লোল*, ঘনশ্যাম চৌধুরী সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সমগ্রতার সন্ধানে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

দেবদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায় : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: অন্তর্গত চেতনার দুরন্ত মন্থন*, জয়গোপাল মণ্ডল সম্পাদিত, *প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৯

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, *উত্তরাধিকার*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, ৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

নারায়ণ চৌধুরী : *মানিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য*, ঘনশ্যাম চৌধুরী সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সমগ্রতার সন্ধানে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্ন ও উত্তরণ*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, উত্তরাধিকার, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

প্রেমেন্দ্র মিত্র : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ*, উত্তরাধিকার, সম্পাদক-সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ॥ বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর-উপন্যাস*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, উত্তরাধিকার, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা*, বাংলা একাডেমী, ৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

বেগম আকতার কামাল : *দিবারাত্রির কাব্য : মানিক মানসের আলোছায়া*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *কালিন্দী : সামাজিক বিবতর্নের অনু ইতিহাস, বাংলা উপন্যাসে নদী-চর ও দ্বীপ জীবন*, সৈয়দ আকরম হোসেন ও সিরাজ সালেকীন সম্পাদিত, জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

: কথাশিল্পের কথামালা শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর, কালিন্দী : সামাজিক বিবর্তনের অনু ইতিহাস, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

: *তারাশঙ্করের উপন্যাসে বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষিত* তারাশঙ্কর জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রকাশকাল : ১৯৯৮

: *নিয়তির পক্ষ বিপক্ষ অথবা পুতুল ও মানুষের দ্বৈরথ*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

মজিদ মাহমুদ : *সহরবাসের ইতিকথা ও ইতিকথার পরের কথা : মানিকের কম পঠিত দুটি উপন্যাস*, উত্তরাধিকার, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ সংখ্যা*, বাংলা একাডেমি, ৩৬ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

মনসুর মুসা : *দিবারাত্রির কাব্য*, ভূঁইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১২

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : *আত্মহত্যার অধিকার, যাদবপুর জার্নাল অব কম্পারেটিভ লিটারেচার*, প্রকাশকাল : ১৯৬৬

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : *উপন্যাসের কথা*, শুভময় মণ্ডল ও সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০১৫

]মালিনী ভট্টাচার্য : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কথাসাহিত্যের বিবাদী চেতনা*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

মাহমুদ কামাল : *দ্বিতীয় পাঠের তিথিডোর*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, *উত্তরাধিকার*, বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ, ৩৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

মাহবুব সাদিক : *অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত*, *জীবনীগ্রন্থমালা*, *'বেদে'* উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ৩১ শে আশ্বিন, ৩৩৫, *কল্লোল*, প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৩৩৬, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫

যুগান্তর চক্রবর্তী : *দিবারাত্রির কাব্য : একটি উপন্যাসের জন্ম*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূঁইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ: ডিসেম্বর-২০১২

যুথিকা বসু : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ব্যক্তি ও কথাসাহিত্যিক*, জয়গোপাল মণ্ডল সম্পাদিত, *প্রসঙ্গ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৯

রণেশ দাশগুপ্ত : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ সংখ্যা*, উত্তরাধিকার, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, বাংলা একাডেমি, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

শাশ্বতী মজুমদার : *কলম পেশা মজুর*, ঘনশ্যাম চৌধুরী সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সমগ্রতার সন্ধানে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূইয়া ইকবাল সংকলিত ও সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদ্রার্স, তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১২

সন্তোষকুমার ঘোষ : *শীতের কাছে প্রার্থনা*, আনন্দ রায় সম্পাদিত, *বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গ*, কলকাতা, বর্ণালী, প্রকাশকাল : ১৯৭৮

সরোজমোহন মিত্র : *পদ্মানদীর জেলেজীবন ও ময়নাদ্বীপ*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

সেলিনা হোসেন : *ফিরে দেখা : নোরা ও কুসুম*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ*, *উত্তরাধিকার*, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : *পরিবারের পক্ষ থেকে কৈফিয়ত*, *খুনি*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৩

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী : *মানিক কন্দ্যোপাধ্যায় ও চল্লিশ দশকের মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচনা*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

সুমিতা চক্রবর্তী : *হোসেন মিয়া, ময়না দ্বীপ ও লেখকের ইঙ্গিত*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, *উত্তরাধিকার*, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ*, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সৈয়দ আকরম হোসেন : *বাংলাদেশ*, মনসুর মুসা সম্পাদিত, *বাঙলাদেশ*, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা

: *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য, পথের পাঁচালী-অপরাজিত : শৈলিবিচার*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১০,

: *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য, বাংলাদেশের উপন্যাস : আঙ্গিক বিবেচনা*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১০

সৈয়দ আজিজুল হক : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উপন্যাস*, ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর-২০১২

: চিহ্ন' এবং 'ঝড় ও ঝরাপাতা', *কথাশিল্পী মানিক*, কথাপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

সৌমিত্র শেখর : *উপন্যাসে বৈজ্ঞানিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

সৌভিক রেজা : *জীবনের জটিলতা : মানুষের হয়ে ওঠার কথন-ক্রিয়া*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত-*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবর্ষ স্মরণ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

হামীম কামরুল হক : *সমাজের আরোগ্য, ব্যক্তির সুস্থতা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ*, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *লেখকের কথা*, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পাদিত, উত্তরাধিকার, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, প্রকাশকাল : ২০০৮

হায়দার আকবর খান রনো : *উত্তরকালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শতবার্ষিক স্মরণ*, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থাবলি

১৯০৮-১৯৫৬

১৯০৮ জন্ম, ১৯ মে মঙ্গলবার। বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্মস্থান সাওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকা শহরে। পৈতৃক নিবাস ঢাকা, বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রাম।
পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। পিতা-মাতার পঞ্চম পুত্র–পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মানিক।
পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের গ্র্যাজুয়েট। সেটেল্‌মেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং শেষপর্যন্ত সাব-ডেপুটি কালেক্টর পদে পিতার চাকরি সূত্রে লেখকের বাল্য-কৈশোর ও স্কুলের শিক্ষাজীবন বিক্ষিপ্তভাবে অতিবাহিত হয় উড়িষ্যা, বিহার ও অখণ্ড বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে–প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম, সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ, কুমিল্লার অর্ন্তগত ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বারাসাত, কলকাতা, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে।

১৯২৪ ২৮ মে টাঙ্গাইলে মাতৃবিয়োগ।

১৯২৬ মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯২৮ বাঁকুড়ার ওয়েস্‌লিয়ান মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আ.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তর্ণ হয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি.এস.সি. ক্লাশে ভর্তি হন। এবছরেই কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসীমামী' রচনা করেন এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৫-এর পৌষ-সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় তা ছাপা হয়। 'অতসীমামী' লেখকের প্রথম রচিত গল্প হলেও প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ম্যাজিক'। 'অতসীমামী' প্রকাশের তিন মাস আগেই গল্পটি 'গল্পগুচ্ছ' মাসিকপত্রের আশ্বিন ১৩৩৫-এ (২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাঘ ১৩৩৫-এ (২য় বর্ষ ৫ সংখ্যা) প্রকাশিত হয় লেখকের তৃতীয় গল্প 'শেষ মুহূর্তে'। প্রথম গল্পের লেখক হিসেবে ডাকনাম 'মানিক' ব্যবহারের কাহিনি নিজেই পরবর্তীকালে 'গল্প লেখার গল্প'-নামক রচনায় বলেছেন। আকস্মিকভাবে প্রথম গল্প রচনার আগেই, কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন ষোলো বছর বয়সে।

১৯২৯ 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় চতুর্থ ও পঞ্চম গল্প 'নেকী' আষাড় ১৩৩৬) ও ব্যথার পূজা' (ভাদ্র ১৩৩৬)। প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি রচনা এই বছরেই শুরু হয়। ক্রমে সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ পারিবারিক মতবিরোধের কারণ হয়ে ওঠে–শেষ পর্যন্ত কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যকর্মেই আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকায় 'একটি দিন নামক বড়ো গল্পের আকারে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' শুরু হয়; ক্রমে 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি' এবং শেষপর্যন্ত 'দিবারাত্রির কাব্য' নামে ধারাবাহিক প্রকাশের পর পৌষ ১৩৪১-এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। একই বছরে 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় 'পদ্মানদীর মাঝি', কিন্তু পূর্ব্বাশা প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে হওয়ায় উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

১৯৩৫ পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর কিংবা বর্তমান কিংবা বর্তমান বছরের জানুয়ারি বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর পৌষ সংখ্যা থোকে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শুরু হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এই বছরেই গ্রন্থকার হিসাবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব। উপন্যাস 'জননী' গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত 'দিবারাত্রির কাব্য' এবং প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসীমামী' পরপর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মার্চ, জুলাই ও আগস্ট মাসে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বছরেই কোনো এক সময়ে লেখক মৃগীরোগে প্রথম আক্রান্ত হন–চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

১৯৩৬ একই বছরে প্রকাশিত হয় তিনটি কালজয়ী উপন্যাস–'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি' ও জীবনের জটিলতা'।

১৯৩৭ একমাত্র গ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক', লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড-এর পরিচালনাধীন মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বনশ্রী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান; বঙ্গশ্রী'র তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণ কুমার রায়। বর্তমান বছরের শেষভাবে টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু; পরবর্তী এগার বছর, পিতা ও অপর তিনভ্রাতার একান্নবর্তী সংসারে, উক্ত বাড়িতেই বাস করেন।

১৯৩৮ ১১ মে, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ময়মনসিংহ গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিক্রমপুর পঞ্চসার নিবাসী স্বর্গত সুরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে উপন্যাস 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনী'

১৯৩৯ ১ জানুয়ারি থেকে 'বঙ্গশ্রী-পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকুরিতে ইস্তফা। প্রায় একই সময়ে, পরবর্তী ভ্রাতা সুবোধকুমারের সহযোগিতায়, 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামে ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় স্থাপন। বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ মাঘ-সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'পরিচয়'-পত্রিকায় 'অহিংসা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু (সমাপ্তি পৌষ ১৩৪৭) আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ'।
বর্তমান বছরের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরতলী' প্রকাশিত হয়।

১৯৪০ বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে লেখকের নিজস্ব প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ'; সম্ভবত এর পরে প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়।
জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে 'সহরতলী' ১ম পর্ব। বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ কার্তিক সংখ্যা 'পরিচয়'-পত্রিকায় লেখক-সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪১ প্রকাশিত গ্রন্থ 'অহিংসা', 'সহরতলী' ২য় পর্ব–দুটি উপন্যাস।

১৯৪২ শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'সহরবাসের ইতিকথা' প্রকাশিত হয়। ১৫ মে তারিখে প্রকাশিত উপন্যাস 'চতুষ্কোণ' এবং আগস্ট মাসে অপর উপন্যাস 'ধরাবাঁধা জীবন'।

১৯৪৩ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকা থেকে পদত্যাগের পর লেখকের দ্বিতীয় এবং শেষ চাকরি-জীবন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে– তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার, বেঙ্গল-দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট-পদে তিনি যোগদান করেন এবং অন্তত বর্তমান বছরের শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা থেকে যুদ্ধ বিষয়ক প্রচার ও নানাবিধ বেতার অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ'।
বঙ্গাব্দ ১৩৫০ শারদীয় যুগান্তর পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব' নামক একটি ছোট উপন্যাস যা পরবর্তী বছর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ ১৫-১৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়। ক্রমে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বর্তমান বছরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সাহিত্য-ফ্রন্টে সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

২৫–২৭ আগস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সাধারণ অধিবেশনের অন্যতম সভাপতি।
জুলাই ও অক্টোবর মাসে যথাক্রমে প্রকাশিত উপন্যাস 'প্রতিবিম্ব' ও গল্পগ্রন্থ 'ভেজাল'।

১৯৪৫ ৩–৮ মার্চে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। বর্তমান সম্মেলনে পুনরায় সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে সংঘের বাংলা শাখার নাম হয় প্রগতি লেখক সংঘ' এবং এই সম্মেলন থেকে লেখক উক্ত সংঘের পরবর্তী বছরের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন।
১২ মে তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'গল্প লেখার গল্প'-পর্যায়ে ভাষণদান।
অক্টোবর–ডিসেম্বরের বিভিন্ন দিনে, আটারো-উনিশ শতকীয় বাঙালি সংগীতকার-বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক বেতার ভাষণ।
প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া' এবং উপন্যাস 'দর্পণ'।

১৯৪৬ পরপর প্রকাশিত হয় পাঁচখানি গ্রন্থ :
ফেব্রুয়ারি-মার্চ, সহরবাসের ইতিকথা', উপন্যাস।
এপ্রিল-মে, ভিটেমাটি' নাটক।
মে-জুন, আজ কাল পরশুর গল্প' গল্পগ্রন্থ।
জুলাই-আগস্ট, 'চিন্তামণি', উপন্যাস।
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 'পরিস্থিতি' গল্পগ্রন্থ।
১৬ আগস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে, জীবন বিপন্ন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রী প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯৪৭ প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি : উপন্যাস 'চিহ্ন' ও 'আদায়ের ইতিহাস' এবং গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান'। ডিসেম্বরের শেষভাগে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে গণসাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত।

১৯৪৮ দুটি গ্রন্থ প্রকাশ : গল্পগ্রন্থ 'ছোটবড়' ও 'মাটির মাশুল'।

১৯৪৯ ৫ ফেব্রুয়ারি, টালিগঞ্জ-দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়ি থেকে বরানগর, গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই বাস করেন।
৭ ফেব্রুয়ারি, লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়ি বিক্রয় করে দেন এবং ৪ ডিসেম্বর তারিখে স্থায়ীভাবে লেখকের কাছে চলে আসেন। আমৃত্যু তিনি লেখকের সঙ্গেই বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন–পুত্রের মৃত্যুর দু-বছর পর মুমূর্ষু পিতা মারা যান। এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি। সংঘের পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে লেখক এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন– 'প্রগতি সাহিত্য'-নামক প্রবন্ধরূপে এই রিপোর্ট লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তার একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (১৯৫৭) সংকলিত হয়। চলচ্চিত্রে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'–২৮ জুলাই মুক্তি পায়।
একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'ছোটবকুল পুরের যাত্রী' প্রকাশিত হয়।

১৯৫০ জুন থেকে আগস্টের মধ্যে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'জীয়ন্ত', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শ্রেষ্ঠগল্প' এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক প্রকাশিত হয় 'মানিক-গ্রন্থাবলী' ১ম ভাগ।

১৯৫১ বর্তমান বছরের প্রায় শুরু থেকেই দারিদ্র্য এবং অসুস্থতায় ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকেন। 'পেশা', 'সোনার চেয়ে দামী' (১ম খণ্ড। বেকার), স্বাধীনতার স্বাদ' ও 'ছন্দপতন'– চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ আর্থিক সংকট চরমে ওঠে–তিন মাসের মধ্যে 'অন্তত পাঁচশত টাকা' সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে সংসার-চালনার 'ত্রৈমাসিক প্লান' নেন মে–জুলাই মাসে, যদিও তা 'প্লান'ই থেকে যায়। ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় : 'সোনার চেয়ে দামী' (২য় খণ্ড। আপোস), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' ও 'সার্বজনীন'–চারখানি উপন্যাস এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক 'মানিক গ্রন্থাবলী ২য় ভাগ' প্রকাশিত হয়।

১৯৫৩ দারিদ্র্য এবং অসুস্থতার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।
১১-১৫ এপ্রিল, লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।
প্রকাশিত গ্রন্থ : 'নাগপাশ', 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে'–চারখানি উপন্যাস এবং দুটি গল্পগ্রন্থ 'ফেরিওলা' ও 'লাজুকলতা'।

১৯৫৪ দারিদ্র্য, অসুখ ও আসক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ আত্মরক্ষার সংগ্রাম–আত্মরক্ষা এবং আত্মহনন ক্রমেই একাকার হয়ে যায়।
বর্তমান বছরের একেবাওে গোড়া থেকেই লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরির লেখায় ঘুওে ফিওে দেখা দেয় অতিপ্রাকৃত আ অতিলৌকিক প্রসঙ্গ।
প্রকাশিত গ্রন্থ : দুটি উপন্যাস– 'হরফ' ও 'শুভাশুভ'।

১৯৫৫ স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্য এবং চিকিৎসাতীত ব্যাধির যুগপদ আক্রমণে অস্তিত্বসুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, স্থায়ী চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৭ মার্চ, চিকিৎসকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়ি চলে আসেন।
বিপর্যস্ত শরীর-মনের শেষ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয় লুম্বিনী পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে–২০ আগস্ট সেখানে ভর্তি হন এবং দু-মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২১ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন।
একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ : 'পরাধীন প্রেম' উপন্যাস।

১৯৫৬ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'হলুদ নদী সবুজ বন'। বর্তমান বছরের গোড়া থেকেই ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে একাধিকবার আক্রান্ত হন এবং ২৫ জুন তারিখে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। জুন মাসেই প্রকাশিত হয় জীবিতকালের শেষ গল্প সংকলন 'স্ব-নির্বাচিত গল্প'। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, লেখকের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস, 'মাশুল'।
২ ডিসেম্বর সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হন।
৩ ডিসেম্বর, (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, ১৭ অগ্রহায়ণ), সোমবার অতি প্রত্যুষে উক্ত হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।
নিমতলা শ্মশানঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

[যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত, অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ডায়েরি ও চিঠিপত্র থেকে গৃহিত। উৎস : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুময় পাল সম্পাদিত 'উত্তরকালের ছয় উপন্যাস' গ্রন্থ থেকে সংকলিত]